# পয়গামে মোহাম্মদী

আল্লামা সোলায়মান নদভী (রহ)

# পয়গামে মুহাম্মদী

## (ঐতিহাসিক ৮টি সীরাত সংকলন)

মূল

**সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী (রহ.)**

অনুবাদ

**মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম (এম.এম)**
বি.এ অনার্স, এম.এ (এম.ফিল)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
খতিব : বাইতুশ শরফ জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম
উপস্থাপক ও আলোচক : বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন

সম্পাদনা পর্ষদ মক্কা পাবলিকেশন্স

**মক্কা পাবলিকেশন্স**

www.nagorikpathagar.org

গয়গামে মুহাম্মদী
মুল ঃ সাইয়্যেদ সোলায়মান নদভী (রহ.)
অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম

প্রকাশনায়
মক্কা পাবলিকেশন
৩৮/৩ বাংলোবাজার, ঢাকা-১১০০
www.makkapublication.com
www.ahsan.com.bd.

অনলাইন পরিবেশক
www.ahsan.com.bd.

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার, কাটাবন, বাংলোবাজার, ঢাকা।

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী-২০২২ ইং

প্রচ্ছদ : মাসুদ রানা

মুদ্রণ : আল-আকাবা প্রিন্টার্স

মূল্য : ২০০.০০ (দুইশত টাকা মাত্র)

**Poygam-A-Mohammadi** by Mawlana Mohammad Bodeul Alam Published by Makka Publications, 38/3 (Books & Computer Complex) Bangla Bazar, Dhaka-1100. Price : 200.00 taka only. In foreign $ 8 Only.

www.nagorikpathagar.org

## প্রসঙ্গ কথা

আলোচ্য গ্রন্থটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশাল জীবন চরিতের সামান্যতম কয়েকটি অংশ নিয়ে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও ঐতিহাসিক আল্লামা সুলায়মান নদভী মুসলিম এডুকেশনাল এসোসিয়েশন অব সাউদান ইন্ডিয়ার আমন্ত্রণক্রমে ১৯২৫ সনে মাদ্রাজের লালী হলে যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন এরই অংশ বিশেষ। যা পরবর্তীতে উর্দু সাহিত্যে খুতুবাতে মাদ্রাজ নামে প্রকাশিত হয়।

এতে রয়েছে মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে দার্শনিক ও ঐতিহাসিক মূল্যবোধ সম্বলিত বিশ্লেষণ যা পাঠক পাঠকালেই এর মর্ম অনুধাবনে সামর্থ্য হবেন।

আমরা এর বাংলা অনুবাদ **পয়গামে মুহাম্মদী : ৮টি ভাষণ** শিরোণামে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছি। আশা করা যায় বর্তমানকালেও গ্রন্থটি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে ইনশাআল্লাহ।

–সম্পাদক

www.nagorikpathagar.org

# লেখকের কথা

৮টি বক্তৃতার সমন্বয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের ইসলামী শিক্ষা সংস্থার আবেদনে ১৯২৫ সনের নভেম্বর মাসে এ বক্তৃতাগুলো প্রদান করা হয়েছিল। মাদ্রাজে কয়েক বছর থেকে এক আমেরিকান খ্রিষ্টানের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে কোন না কোন বিশিষ্ট খ্রিষ্টান পণ্ডিত হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবন ও খ্রিষ্টানধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করে আসছেন। এ বক্তৃতাগুলো প্রতি বছর প্রদত্ত হচ্ছে এবং অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আগ্রহীরা শোনে আসছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাজের কতিপয় নিঃস্বার্থ মুসলিম শিক্ষানুরাগী মুসলমানদের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রচেষ্টা চালাবার প্রয়োজন অনুভব করেন অর্থাৎ, প্রতি বছর ইংরেজি শিক্ষার্থী ছাত্রদের রুচি ও আধুনিক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবন ও ইসলামের বিভিন্ন দিক আলোচনা করার জন্য বিশিষ্ট মুসলিম আলেমগণের সাহায্য গ্রহণে মুখাপেক্ষী হন।

সৌভাগ্যক্রমে মাদ্রাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি জনাব এম. জামাল মুহাম্মদ এ কাজের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে সম্মত হন। তিনি মাদ্রাজের বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষায়তনে বিপুল অর্থ সাহায্য করে আসছেন। তাঁর ইসলাম-প্রীতি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে এবং মাদ্রাজে 'ইসলামী বক্তৃতাবলী'র এ ধারাবাহিকতা ইউরোপের জনপ্রিয় বক্তৃতাবলীর ন্যায় উপকারী প্রমাণিত হবে এবং ব্যাপক সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হবে বলে আশাবাদী।

সর্বপ্রথম এ গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র কাজটির জন্য আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয়েছে, এজন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করি। এ বক্তৃতাগুলো মাদ্রাজের লালী হলে প্রদান করা হয়। প্রতি সপ্তাহে একটি এবং

www.nagorikpathagar.org

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সর্বমোট ৮টি বক্তৃতা প্রদান করা হয়। সংস্থার সম্পাদক শেঠ হামীদ হাসান এ বক্তৃতাগুলোকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার এবং এগুলোর ইংরেজি অনুবাদ করার কাজ সম্পাদন করেছেন বলে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। ধৈর্যসহকারে এ নিরস আলোচনাসমূহ শোনে মাদ্রাজের জনগণ আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়াও অমুসলিম বন্ধুগণ উর্দু ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করা সত্ত্বেও একমাত্র প্রকৃত সত্য, অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে এ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন, এজন্য আমি তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ।

প্রতি সপ্তাহে মাদ্রাজের উর্দু ও ইংরেজি পত্রিকাগুলো এ বক্তৃতাসমূহের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেও আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। এ সাথে হিন্দু ও ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকা দুটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা স্ব-স্ব পৃষ্ঠায় ইংরেজিতে বক্তৃতাবলীর সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করার ব্যাপারে অত্যন্ত উদারতার পরিচয় দিয়েছেন।

পরিশেষে এসব বক্তৃতাগুলোকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সৌভাগ্য লাভ করে আমি আল্লাহর কাছে সিজদানত হচ্ছি। তিনি যেন এ নগণ্য ভক্তিটুকু কবুল করে লেখকের হৃদয়দেশ আন্তরিকতা ও তৌফিকের অমূল্য সম্পদে পরিপূর্ণ করে দেন।

দাস্না, বিহার,
ডিসেম্বর, ১৯২৫ইং

করুণাপ্রার্থী
সাইয়েদ সুলায়মান নদভী

www.nagorikpathagar.org

# লেখক পরিচিতি

গ্রন্থকার আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহঃ) ছিলেন সমকালীন ইসলামী বিশ্বের এক অনন্য বহুমুখী প্রতিভাধর অধিকারী ব্যক্তিত্ব। ১৮৮৪ সনের ২২ নভেম্বর বিহারের দিস্না গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। বাড়িতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর ফুলওয়ারী শরীফ ও দারভাঙ্গায় তাঁর দীনী শিক্ষার পাঠ শুরু হয়। ১৯০১ সনে লাক্ষ্ণৌ-এর দারুল উলূম নদওয়ায় ভর্তি হন।

১৯০৪ সনে উর্দূর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান লেখক ও গবেষক মওলানা শিবলী নোমানী নাদওয়ায় যোগদান করেন। তাঁরই যোগ্যতম তত্ত্বাবধানে সাইয়েদ সাহেব গড়ে ওঠতে থাকেন। মওলানা শিবলীর কাছে মিসর ও সিরিয়া থেকে আরবী পত্রিকা আসে প্রচুর পরিমাণে। সাইয়েদ সাহেব নিয়মিত সেগুলো পড়তেন। এভাবেই আধুনিক আরবি সাহিত্যেও তাঁর দক্ষতা বেড়ে যেতে থাকে। ১৯০৪ সনে আন নাদওয়া নামে নাদওয়াতুল ওলামার পক্ষ থেকে উর্দুতে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সাইয়েদ সাহেব এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ১৯০৬ সনে ছাত্রদের দস্তারবন্দী মাহফিলে সাবলীল বিশুদ্ধ আরবীতে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা শুনে মাওলানা শিবলী আনন্দে অভিভূত হয়। আসন থেকে ওঠে নিজ মাথার পাগড়ী খুলে তাঁর মাথায় পরিয়ে দেন।

তিনি ১৯০৭ সনে আন নাদ্ওয়ার ডাইরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯০৮ সনে দারুল উলূম নাদওয়ায় কালামশাস্ত্র ও আধুনিক আরবি সাহিত্যের অধ্যাপনার দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯১২ সনে শিক্ষকতার সাথে সাথে আন নাদওয়ার প্রশাসনিক দায়িত্ব লাভ করেন। এ শিক্ষকতা সময়ে রচনা করেন 'দুরুসুল আদাব' নামে দু'খণ্ডের একটি আরবি গ্রন্থ। ১৯১২ সনে শিক্ষকতার সাথে সাথে আন নাদওয়ার প্রশাসনিক দায়িত্বও লাভ করেন। ১৯১২ সনে লুগাতুল জাদীদা নামে আরবি ভাষার আধুনিক শব্দ সম্বলিত একটি অভিধান প্রণয়ন করেন। ১৯১৩ সনের শেষভাগে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পূনার দাক্ষিণাত্য কলেজে প্রাচ্য ভাষাসমূহের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখানে শিক্ষকতার সাথে সাথে 'আরদুল কুরআন' নামে একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনার কাজেও হাত দেন। এতে কুরআনে উল্লেখিত দেশ ও স্থানগুলোর ভৌগোলিক বিবরণ আরব জাতির রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, বংশগত, সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয়, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণাধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। এতে একদিকে বাইবেলের বর্ণনার সাথে বিষয়গুলোর অসামাঞ্জস্য এবং অন্যদিকে কুরআনের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্য দেখানো হয়েছে।

১৯১৪ সনে তিনি পূনা ত্যাগ করে আযমগড়ে চলে আসেন এবং সেখানে শ্রেষ্ঠ লেখক, গবেষক ও ইসলামী শাস্ত্রসমূহে পারদর্শী পণ্ডিতগণের নিয়ে 'দারুল মুসান্নিফীন' (লেখক একাডেমী) প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে 'মাআরিফ' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও চালু

www.nagorikpathagar.org

করেন। এ প্রতিষ্ঠানের আলোকচ্ছটায় এখনো সমগ্র উপমহাদেশ আলোকিত রয়েছে। ১৯১৫ সনে তিনি দারুল উলূম নাদ্ওয়ার শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সন পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। উস্তাদ শিবলী নোমানীর ইন্তিকালের পর ১৯১৮ সনে তাঁর সীরাতুন্নবী সংক্রান্ত রচনাবলি গ্রন্থিত করে ১ম খণ্ডে প্রকাশ করেন। এরপর নিজেই অন্যান্য খণ্ডগুলো লিখতে ও প্রকাশ করতে থাকেন। ১৯৩৯ সনে এর সর্বশেষ এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশ করেন। সীরাতুন্নবী সংক্রান্ত এ অনন্য গবেষণামূলক বিশাল গ্রন্থটি তাঁকে বিশ্বজোড়া সুখ্যাতি অধিকারী করে রেখেছে।

১৯২৫ সনে অক্টোবর ও নভেম্বরে দক্ষিণ ভারতের মুসলিম এডুকেশন এসোসিয়েশনের দাওয়াতে সীরাতুন্নবীর ওপর ৮টি বক্তৃতা প্রদান করেন। এগুলো পরবর্তীকালে 'খুতবাত-ই-মাদরাস নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বাংলায় এ গ্রন্থটিরই নাম দেয়া হয়েছে 'পয়গামে মুহাম্মদী'। আজ পর্যন্ত বক্তৃতায় নবী চরিতকে এমন উত্তম পন্থায় আর কেউ উপস্থাপন করতে পারেননি। ১৯৩৩ সনে তাঁর প্রসিদ্ধ গবেষণামূলক রচনা 'খাইয়াম' প্রকাশিত হয়। খাইয়াম শুধুমাত্র একজন কবিই ছিলেন না বরং এ সাথে তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ।

সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী ১৯৪০ সনে লিখেন ছোটদের জন্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সীরাত 'রহমতে আলম।' এ বছরই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

ভূপালের নবাবের অনুরোধে ১৯৪৬ সনে তিনি তাঁর এস্টেটের প্রধান বিচারপতি এবং জামেয়া মাশারিকিয়্যা বা হায়দরাবাদের প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়'-এর আমীন বা রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন।

তিনি ১৯৫০ সনে পাকিস্তানে হিজরত করেন। সেখানে ধর্মীয়, জাতীয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে জামিয়াতুল উলামা ইসলাম'-এর সভাপতি এবং পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি কমিশন, আরবী মাদরাসাসমূহের কমিটি, ল কমিশন, করাচী ইউনিভারসিটির সিনেট ও পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল কনফারেন্সের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্র জীবন থেকেই ছিলেন রাজনীতি ও সমাজ সচেতন। মুসলিম মিল্লাতের যে কোন সমস্যায় তাঁকে প্রথম সারিতে দেখা যেত। তাই ১৯২১ সনে মীরাঠে অনুষ্ঠিত খিলাফত আন্দোলনের বাৎসরিক সভায় তাঁকে দেখা যায় সভাপতির আসনে।

১৯৫০ সনে পাকিস্তানে আগমনের পর পাকিস্তানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য তিনি তাঁর প্রচেষ্টা জোরদার করেন। তাঁর সভাপতিত্বে ১৯৫১ সনের জানুযারী মাসে করাচিতে শিয়া, সুন্নী, হানাফি, আহলে হাদীস নির্বিশেষে সকল মহলের ৩১ জন উলামা সর্বসম্মতভাবে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন করে। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের ভূমিকায় 'আদর্শ প্রস্তাব' নামে এ দফাগুলো সন্নিবেশিত হয় এবং এরই ভিত্তিতে পরবর্তীকালে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়। ১৯৫৩ সনের ২২ নভেম্বর ইসলামী দুনিয়ার বিশ শতকের এ শ্রেষ্ঠ মনীষীর ইন্তিকাল হয়।

**–প্রকাশক**

www.nagorikpathagar.org

# সূচিপত্র


১. নবী-রাসূলগণের জীবনচরিতই মানবতার পূর্ণতা সাধন..... ৯
২. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতই শাশ্বত ও বিশ্বজনীন দৃষ্টান্ত ..... ২৫
* ঐতিহাসিক ভিত্তি ও নির্ভরতা..... ২৭
* পূর্ণতা..... ৩২
* আদর্শিক ভিত্তির ব্যাপকতার সমন্বয় ..... ৩৭
* জীবনে কর্মক্ষেত্রের পরিধি ..... ৪১
৩. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতের ঐতিহাসিকতা ..... ৪৬
* রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে লেখা হাদীস ..... ৫৪
* ইসলামের শত্রুদের দৃষ্টিতে ..... ৭০
৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীভনচরিতে ..... ০০
ইসলামের মানবিক গুণাবলীর পূর্ণতা ..... ৭৪
* দুর্বল রেওয়ায়েত সংরক্ষণ কেন করা হয়েছে ..... ৭৫
* 'নিয়মিত কার্যধারা' অধ্যায়ে নিচের শিরোনামসমূহ সংযোজিত হয়েছে... ৮০
* 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিস..... ৮০
* 'ইবাদত' সংক্রান্ত শিরোনামসমূহ ..... ৮০
* 'নবীচরিত' অধ্যায়ের বিস্তারিত শিরোনামসমূহ ..... ৮০
৫. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতেই ইসলামের সর্বজনীনতা ..... ৯৭
৬. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতে ইসলামের বাস্তবতা ..... ১২৩
* ইহুদী নারী কর্তৃক খাদ্যে বিষপ্রয়োগ..... ১৪৬
৭. মুহাম্মদী পয়গাম ..... ১৫৪
৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতে ঈমান ও আমল..... ১৮১
* ইহকাল-পরকাল ও দুনিয়ার পৃথকীকরণ ..... ২০৪


www.nagorikpathagar.org

# ১. নবী-রাসূলগণের জীবনচরিতই মানবতার পূর্ণতা সাধন

আমাদের এ পৃথিবী অদ্ভুত বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ এবং বিচিত্র সৃষ্টির সমাবেশ। তাই প্রতিটি সৃষ্টি বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। লক্ষ্যণীয় জড় পদার্থ থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকের প্রতি ধীরে ধীরে এবং পর্যায়ক্রমে তাদের মাঝে অনুভূতি জ্ঞান ও ইচ্ছার উন্মেষ ও উন্নয়ন ঘটে এরই ফলে জড় পদার্থের প্রারম্ভিক স্তর-অণু বা ইথার সব রকমের অনুভূতি, জ্ঞান বা ইচ্ছাশক্তিশূন্য। তাছাড়া জড় পদার্থের অন্যান্য স্তরে জীবনের ক্ষীণতম প্রকাশ পাওয়া যায়। উদ্ভিদে একটি অবচেতন অনুভূতির বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রাণীদেহে অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে ইচ্ছাশক্তিকেও সক্রিয় দেখা যায়। আর মানবজাতির ক্ষেত্রে অনুভূতি, জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির পূর্ণতা উপলব্ধি করা যায়। আমাদের এ অনুভূতি জ্ঞান এবং ইচ্ছাই সকল দায়িত্বের প্রকৃত কারণ। যে শ্রেণির সৃষ্টির মাঝে এ বিষয়গুলোর পরিমাণ যত কম, সে শ্রেণি তত বেশি ঐচ্ছিক দায়িত্বের শৃঙ্খলমুক্ত। আর জড় পদার্থ সব রকমের দায়িত্বমুক্ত। উদ্ভিদে জীবন ও মৃত্যুর কিছু দায়িত্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে মাত্র। প্রাণীদের কর্তব্য আরো কিছুটা বেড়ে যায়। মানবজাতির প্রতি চিন্তা-ভাবনা করা হলে দেখা যাবে, দায়িত্ব ও কর্তব্যের শৃঙ্খলে তারা পুরোপুরি আবদ্ধ। আবার মানবসমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করা হলে দেখা যাবে, তাদের মধ্যে একদিকে যেমন উন্মাদ, অর্ধোন্মাদ, নির্বোধ ও শিশু রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে প্রজ্ঞামান, বয়স্ক, জ্ঞানী, চৌকস ও শিক্ষিত ব্যক্তির দলও রয়েছে। অনুভূতি, জ্ঞান ও ইচ্ছার তারতম্যে তাদের কেউ পুরোপুরি দায়িত্বমুক্ত, কারোর দায়িত্ব কম এবং কারোর দায়িত্ব বেশি পরিমাণে।

www.nagorikpathagar.org

আর অন্যদিক থেকে যদি বিচার করা যায় দেখা যাবে, যে সৃষ্টির মধ্যে অনুভূতি, জ্ঞান ও ইচ্ছার স্বল্পতা যত বেশি, আল্লাহ তার প্রতিপালন ও বিকাশ সাধনের দায়িত্ব তত পরিমাণেই নিজের ওপর রেখে দিয়েছেন এবং যে হারে সৃষ্টি চক্ষু উন্মীলন করতে থাকে, সে হারেই আল্লাহ তার অনুভূতি, জ্ঞান ও ইচ্ছার পরিমাণ মাফিক প্রত্যেক শ্রেণির ওপর দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন। পাহাড়ে স্বর্ন ও রূপা ও মণি-মাণিক্যের লালন করে কে? সমুদ্রে মাছকে কে প্রতিপালন করে? বনের পশুপাখীর আহার যোগায় কে? জীব-জন্তুর দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে কে? এমনকি শীতপ্রধান বা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের প্রাণী এবং পাহাড়, বন ও মরুভূমিতে বসবাসকারী জীব-জন্তু একই শ্রেণিভুক্ত হওয়ার পরও জল-বায়ুর বিভিন্নতার কারণে এদের বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ইউরোপের কুকুর ও আফ্রিকার কুকুরের জীবনধারণের ব্যাপারে মওসুম ও জলবায়ুর বিভিন্নতার কারণে যে পার্থক্য দেখা যায়, সে অনুসারে তাদের প্রয়োজন পূরণ করার ব্যবস্থাও প্রকৃতি নিজের পক্ষ থেকেই করে। আর এ জন্যই যেসব দেশের ঋতু ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, সেসব দেশের একই শ্রেণির পশুর নখ, চল, লোম, চামড়া বা ত্বকের রং ও অন্যান্য বিষয়ে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়।

এসব হল সুযোগ-সুবিধা অর্জনের বিভিন্ন উপায় উপকরণ। এ থেকে জানা যায়, যেখানে যে পরিমাণ অনুভূতি, জ্ঞান ও ইচ্ছার অভাব থাকে, সেখানে প্রকৃতি নিজেই তা পরিমাণ অনুযায়ী পূরণ করার ব্যবস্থা করে। আর আল্লাহর সৃষ্টিকুল যেমনি পর্যায়ক্রমে সুযোগ-সুবিধা অর্জনের উপায়-উপকরণসমূহ সৃষ্টির নিজস্ব শক্তি-সামর্থ্যের কাছে ন্যস্ত করে দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হতে থাকে। জীবিকার ব্যবস্থা মানুষের নিজেকেই করতে হয়। সে কৃষিকাজ, বৃক্ষ রোপণ ও ফল উৎপাদন করার জন্য পরিশ্রম করে। সে জন্মগতভাবে শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার উপযোগী চামড়া, লোম ও পশম লাভ করেনি। বিভিন্ন ধরনের পোশাকের আকারে এর ব্যবস্থা তার নিজেকেই করতে হয়। রোগ-ব্যাধি ও আঘাত ইত্যাদি প্রতিরোধে তার নিজেকেই প্রচেষ্টা চালাতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

তাছাড়া যেখানে অনুভূতি ও ইচ্ছা দুর্বল, সেখানে প্রকৃতি সৃষ্টিকে শত্রু থেকে রক্ষা ও তার জীবন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজেই বহন করেছে। আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন পশুকে বিভিন্ন উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। তীক্ষ্ণ নখর, সাঁড়াশী দন্ত, শিং, উড্ডয়ন ক্ষমতা, সাঁতার, অতি দ্রুতগামিতা, দংশন করার উপযোগী হুল, বিষদাঁত ইত্যাদি বিভিন্ন অস্ত্রে প্রকৃতি নিজেই তাদেরকে সুসজ্জিত করেছে। কিন্তু মানুষের অবস্থা লক্ষ্য করুন, আত্মরক্ষার জন্য তার কাছে না হাতীর মতো, বৃহদাকার শুঁড় ও দাঁত আছে, না বাঘের মতো তীক্ষ্ণ নখর ও সাঁড়াশী দাঁত আছে, না ষাঁড়ের মতো শিং আছে, না কুকুর ও সাপের মতো বিষ আছে; আর না আছে বিছা ও বোলতার মতো হুল। মোটকথা, তাকে বাহ্যত পুরোপুরি অসহায় ও অস্ত্রহীন করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এসবের পরিবর্তে তাকে অনুভূতি, বুদ্ধি, জ্ঞান ও কামনা-বাসনার নিপুণ শক্তি প্রদান করা হয়েছে এবং এ অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলো তার বাইরের সকল দুর্বলতার প্রতিষেধক ও পরিপূরক। সে তার এ অভ্যন্তরীণ শক্তির সাহায্যে বৃহৎ দাঁত ও শুঁড়ধারী হাতিকে ভূপাতিত করে, লালাযুক্ত দীর্ঘ রসনা ও তীক্ষ্ণ নখরধারী বাঘকে হত্যা করে, ভয়াবহ বিষাক্ত সাপকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখে, শূন্যে বিচরণকারী পাখিকে খাঁচায় আবদ্ধ করে, জলচর প্রাণীদেরকেও শিকার করে এবং আত্মরক্ষার জন্য অসংখ্য অস্ত্র নির্মাণ করে নানামুখী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে।

বন্ধুগণ! আপনারা যে-কোন ধর্মের ও যে-কোন দর্শনের অনুসারী হোন না কেন, আপনাদেরকে একথা স্বীকার করতে হবে যে, আপনাদের মানবিক দায়িত্বের প্রকৃত কারণ হচ্ছে আপনাদের অনুভূতি, জ্ঞান, বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি। ইসলামী শরীয়তে এ দায়িত্বগুলোর নাম দেয়া হয়েছে 'তাকলীফ' বা দায়িত্বের বোঝা। এ দায়িত্বের বোঝা আপনাদের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী আপনাদের ওপর প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ ইসলামের এ মূলনীতি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا۔

"আল্লাহ্ কারোর ওপর তার শক্তি-সামর্থ্যের অধিক দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত-২৮৬)

www.nagorikpathagar.org

কুরআনের অন্য স্থানে এ 'তাকলীফ' -এর দায়িত্ব ও কর্তব্যকে 'আমানত' শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। এ আমানতের বোঝা জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণী, এমন কি, বিরাট বিরাট পাহাড় ও সুউচ্চ আকাশের সামনেও পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের একজনও তা বহন করতে সম্মত হয়নি।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.

'বহুবচনের ব্যবহার আমরা আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড়সমূহের সামনে এ আমানত উপস্থাপন করেছি। তারা (স্বাভাবিক অযোগ্যতার কারণে প্রকৃতিগত হাবভাবের দ্বারা) একে বহন করতে অস্বীকার করে। এরপর মানুষ একে বহন করে। অবশ্য সে ছিল যালিম ও দায়িত্ব জ্ঞানহীন অজ্ঞ।' (সূরা আহযাব ; আয়াত-৭২)

কবি বলেছেন–

اسمان بار امانت نتوان است کشید ✡ قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند

'আসমান পারেনি বহিতে এ মহা আমানত-ভার
ভাগ্যের লটারীতে আসিল নাম আমার
প্রেমের দিওয়ানা তাই মম শিরে আশ্রয় তার।'

'যালিম' এবং 'অজ্ঞ' এ 'প্রেমের দিওয়ানা'র ভিন্নতর শাব্দিক প্রকাশ। 'যালিম' অর্থ– নিজের নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনকারী। এ গুণটি মানুষের কর্মক্ষমতা, অজ্ঞতা এবং তার জ্ঞান ও বুদ্ধিশক্তির ভারসাম্যহীনতার নাম। যুলুমের বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'ইনসাফ' ও 'আদল' এবং 'অজ্ঞতা'র বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'জ্ঞান'। 'ইনসাফ' ও 'জ্ঞান' জন্মগতভাবে মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। সেগুলো অর্জনের জন্য তার কর্মক্ষমতার মাঝে ভারসাম্যের এবং মানসিক শক্তির মাঝে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন। কুরআনের পরিভাষায় ইনসাফ ও আদলের অপর নাম 'সৎকাজ' এবং জ্ঞানের অন্য নাম 'ঈমান'।

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ.

'সময়ের শপথ, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে লিপ্ত, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা ব্যতীত।' (সূরা আল আসর, আয়াত-১, ৩)

www.nagorikpathagar.org

কর্মের ক্ষেত্রে এ ক্ষতি হচ্ছে যুলুম এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা। আর এ ক্ষতিপূরণের পথ হচ্ছে 'ঈমান' অর্থাৎ, যথার্থ জ্ঞান অর্জন এবং আদল ও ইনসাফ, অর্থাৎ সৎকর্মমূলক অনুষ্ঠান। মানুষ যে পর্যন্ত ঈমান ও সৎকর্ম করার সুযোগ পায় না সে পর্যন্ত সে ক্ষতির মধ্যেই অবস্থান করে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ সময়কে সাক্ষী হিসেবে উত্থাপন করেছেন। সময়ের গতিপ্রবাহের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যেসব ঘটনা, দুর্ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে, এর সমষ্টিকেই সময় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এ আয়াতে।

কার্লাইলের ভাষায়, 'ইতিহাস নিছক মহান ব্যক্তিগণের জীবনীগ্রন্থের নাম।' ইতিহাস সাক্ষী দেয়, যে সব জাতি ও ব্যক্তি ঈমান ও সৎকাজ থেকে বঞ্চিত ছিল, তারা প্রতিনিয়ত ক্ষতির মধ্যেই অবস্থান করেছে।

জগতের সব আসমানি কিতাব, সমস্ত ধর্মগ্রন্থ, নীতিমূলক কাহিনী ও মানুষের উত্থান-পতনের সমস্ত ঘটনা, যুলুম ও মূর্খতা এবং ঈমান ও সৎকাজের বিচিত্র সংমিশ্রণে পরিপূর্ণ। একদিকে যুলুম, মূর্খতা, দুষ্কৃতি ও অন্ধকার, আর অন্যদিকে 'আদল-ইনসাফ, সৎকাজ ও সুকীর্তির আলোকোজ্জ্বল কাহিনী ও ইতিহাস। তাছাড়া যেসব লোক সে মানবিক দায়িত্বসমূহ গ্রহণ করেছে, তাদের প্রশংসা এবং যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাদের নিন্দাবাদের কাহিনী বলা হয়েছে গ্রীক ইলিয়ড, ইতালীয় পার্লালোজ, ইরানী শাহনামা, ভারতীয় রামায়ণ-মহাভারত ও গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ কী? এগুলো প্রত্যেক জাতির জন্য তার মহান ব্যক্তি ও মনীষীগণের জীবনী থেকে জ্ঞান ও মূর্খতা, যুলুম ও ইনসাফ, ভাল ও মন্দ এবং ঈমান ও কুফরের সংঘাতের শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক জাতিকে যুলুম, দুষ্কৃতি ও কুফরীর ধ্বংসকর পরিণতি থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করে ইনসাফ, সুকীর্তি ও ঈমানের উদাহরণগুলোর দ্বারা উপকার অর্জন করার সুযোগ দানই এ সবের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও কুরআনে অধিকাংশ বিষয়বস্তু কী? এগুলো হচ্ছে যালিম, দুষ্কৃতিকারী ও কাফের জাতি ও ব্যক্তিবর্গের ধ্বংস এবং ন্যায়পরায়ণ, সৎ ও মু'মিন জাতি ও ব্যক্তিবর্গের সৎকর্মশীলতা, সৌভাগ্য ও সাফল্যের দৃষ্টান্ত। যে এসব জানার ফলে যালিম ইনসাফ পরায়ণ,

www.nagorikpathagar.org

দুষ্কৃতিকারী সৎকর্মশীল এবং কাফের মু'মিনে পরিণত হতে পারে। এ জন্য শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে প্রতিটি যুগে প্রত্যেকটি দেশে আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণের আগমন হয়েছিল, তাদের নিজেদের জাতির সামনে নিজেদের জীবনকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য। যেন এ আদর্শ অনুসরণ করে তাঁদের জাতি বা জাতির সৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ কল্যাণ ও সাফল্য লাভে সক্ষম হয়। এরপর সবশেষে আল্লাহ সমস্ত জগতের সামনে চিরন্তন জীবনাদর্শ উত্থাপন করার জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'সারাজগতের প্রতি রহমত' হিসেবে প্রেরণ করেছেন। কুরআনে ঘোষণা করেছে :

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

'(হে কুরাইশরা!) (এর পূর্বে নবুয়তের দাবির আগে) আমি তোমাদের মাঝে জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছি, তোমরা কি বুঝতে পার না'?

(সূরা ইউনুস, আয়াত : ১৬)

আল্লাহ মূলত এ আয়াতে তাঁর নবীর জীবন ও চরিত্রকে তাঁর নবুয়তের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে উত্থাপন করেছেন।

প্রিয় ভাইয়েরা, ইতিহাসে এমন হাজার হাজার-লাখ লাখ ব্যক্তির উল্লেখ আছে, যারা পরবর্তীগণের জন্য তাদের জীবনকে আদর্শ হিসেবে উত্থাপন করেছেন। রাজা-বাদশাহর শাহী দরবারের চাকচিক্য, জগদ্বিখ্যাত সেনাপতিগণের যুদ্ধ- কৌশল, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকবৃন্দের চিন্তাশীল দল, বিশ্ববিজয়ী বীরগণের গৌরবময় চেহারা, কবিবৃন্দের বিচিত্র মাহফিল, ধন-সম্পদশালীগণের সুকোমল শয্যা ও মুদ্রা-ঝংকারে পূর্ণ ধনাগার-এসব বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রা প্রত্যেকটি আদম সন্তানকে তাদের নিজেদের দিকে আকর্ষণ করেছে।

কার্থেজের হেবল, ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজান্ডার, রোমের জুলিয়াস সীজার, ইরানের দারা, ফ্রান্সের নেপোলিয়ান প্রত্যেকের জীবনেরই আলাদা একটি আকর্ষণ আছে। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল ও গ্রীসের অন্যান্য

www.nagorikpathagar.org

জগদ্বিখ্যাত দার্শনিকগণ ও বৈজ্ঞানিকদের জীবন একটি বিশেষ ধারায় ধাবমান। নমরূদ ও ফিরাউন এবং আবু জাহল ও আবু লাহাবের জীবনযাত্রা অন্য একটি ধারা প্রকাশ করেছে। কারুনের জীবন আর একটি পৃথক দৃষ্টান্ত। মোটকথা, পার্থিব জীবনে হাজারো প্রকারের জীবনাদর্শ বিরাজমান। আদম সন্তানের বাস্তব জীবনে তাদের আদর্শে আদর্শবান হওয়ার জন্য এরা নিজদেরকে পেশ করেই রেখেছে। কিন্তু বলুন, এসব বিভিন্ন প্রকারের মানুষের মধ্যে কার জীবনধারা মানবজাতির কল্যাণ, উন্নতি ও মুক্তিপথের নিশ্চয়তা দানকারী এবং বাস্তব জীবনে অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে কি?

তাদের মাঝে রয়েছেন অনেক জগদ্বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী সেনাপতি। যাঁরা তরবারির আঘাতে পৃথিবীর রূপ পালটে দিয়েছেন। কিন্তু মানবজাতির মুক্তি, কল্যাণ ও হিদায়াতের জন্য তাঁরা কি কোন আদর্শ রেখে গিয়েছেন? তাঁদের তরবারি কি যুদ্ধক্ষেত্রে বাইরে মানবসমাজের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত চিন্তার বাঁধন কাটতে সক্ষম হয়েছে? মানবজাতির পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতিবন্ধক কোন একটা সমস্যারও সমাধান করতে তাঁরা কি সক্ষম হয়েছেন? তাঁরা মানুষের সমাজ-জীবনের কোন নকশা উত্থাপন করতে পেরেছেন কি? আমাদের আধ্যাত্মিক নৈরাশ্য ও হতাশার কোন প্রতিকার তাঁদের দ্বারা কি সম্ভব হয়েছে? তাঁদের দ্বারা আমাদের কর্মপ্রণালী ও নৈতিকতার কোন কাঠামো তৈরি করা কি সম্ভব হয়েছিল?

জগতে অনেক খ্যাতিমান কবির জন্ম হয়েছে। কিন্তু কল্পনা-জগতের এসব সম্রাট বাস্তব জগতে সম্পূর্ণ অকেজো ও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছেন। তাই প্লেটোর বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় দর্শনে তাদের কোনো স্থান নেই। আজ পর্যন্ত হোমার থেকে শুরু করে যত কবি জন্মেছেন, তাঁরা সাময়িক উত্তেজনা এবং কাল্পনিক আশা-আনন্দের ধুম্রজাল ও হাঙ্গামা সৃষ্টি করা ব্যতীত মানবজাতির জীবন সমস্যা সমাধানের জন্য কোন যথার্থ পরামর্শ দানে সক্ষম হননি। কেননা তাঁদের সুমিষ্ট বাণীর পেছনে সততার কোন সুদৃশ্য আদর্শ ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

তাই কুরআন ঘোষণা করেছে :

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ۔ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ۔ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ۔

'আর কবিদের অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরা। তোমরা কি দেখছ না তারা প্রত্যেক উপত্যকায় দিকভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়ায় এবং মুখে যা বলে তা কাজে পরিণত করে না। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও (কথা অনুসারে) সৎকাজ সম্পাদন করেছে (তারা এ দলে অন্তর্ভুক্ত নয়)।

(সূরা আশ শোয়ারা, আয়াত : ২২৪-২২৭)

কুরআনে তাদের সুমিষ্ট বাণী প্রভাবহীন হবার কারণ স্বরূপ বলেছে যে, তারা দিকভ্রান্তের ন্যায় কল্পনার উপত্যকায় বিচরণ করে এবং তারা ঈমান ও সৎকাজ থেকে বিমুখ। কিন্তু যদি তারা দুটি সম্পদ অর্জন করতে পারেন, তাহলে তাদের বাণী অবশ্য প্রভাবশালী হবে। তাছাড়া তারা হিদায়াত ও সংস্কার সাধনের গুরুদায়িত্ব বহনে সক্ষম হবে না। এর জ্বলন্ত প্রমাণ জগতের ইতিহাসই ।

বহুবার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ তাদের বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে বিশ্ব-ব্যবস্থাপনায় অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করেছেন ও বিশ্ব রহস্যের তেলেসমাতি কারখানা থেকে সংগৃহীত অদ্ভুত অদ্ভুত মতবাদ উপস্থাপন করে জগতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। তারাও মানবজাতির হিদায়াতে কোন কার্যকর রূপরেখা পেশ করতে পারেননি এবং মানবিক কর্তব্যের রূপরেখা ও গতিপথ নিরূপণে কোন সক্রিয় সাহায্য করেননি। কারণ তাদের সুক্ষ্মতর আলোচনা ও উচ্চ চিন্তার পেছনে সৎকাজের কোন বাস্তব নমুনা ছিল না। এরিস্টটলের ন্যায়-শাস্ত্রের ওপর উন্নতমানের বক্তৃতা প্রদান করা হয় এবং নৈতিক বিষয়াবলী সম্পর্কে গভীর চিন্তার প্রশংসা করা হয়। কিন্তু সত্যি করে বলুন, এ দর্শন পড়ে বা শুনে ক'জন লোক সৎপথের অনুসারী হয়েছে? আজ জগতের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্রের অসংখ্য বড় বড় ও যোগ্যতম অধ্যাপক রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের নীতিশাস্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ব, নীতি-কথার প্রভাব তাদের শিক্ষায়তনগুলোর চৌহাদ্দি টপকে কখনো

www.nagorikpathagar.org

বাইরের জগতে আসতে পারেনি-আসতে পারেও না। কারণ শিক্ষায়তনের প্রকোষ্ঠ ছেড়ে যখন তাঁরা বাইরে আসেন, তখন দেখা যায় তাঁদের জীবন সাধারণ মানুষের জীবনের তুলনায় এক ইঞ্চিও উন্নত নয়। মানুষ শুধু কান দিয়ে শুনেই নয়– শিক্ষা গ্রহণ করে চোখ দিয়ে দেখেও।

পৃথিবীর এ রঙ্গমঞ্চে বড় বড় বাদশাহ ও শাসকের আবির্ভাব হয়েছে। অনেক সময় তাঁরা জগতের বিশাল এলাকায় শাসন কর্তৃত্ব চালিয়ে বিভিন্ন জাতির ধন-প্রাণের মালিক হয়েছেন। একটি দেশ ধ্বংস করেছেন ও অন্য একটি দেশ গড়ে তুলেছেন। একটি জাতিকে অধপতিত করে ও অন্য একটি জাতিকে উন্নত করে তুলেছেন। একজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্যজনকে দান করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে তাদের নীতি একই ধরনের ছিল এবং আছে।

এ সম্পর্কে কুরআনে 'সাব'র রাণীর মুখ দিয়ে বলা হয়েছে :

إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً۔

রাজা-বাদশারা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে এবং তার সম্মানী ব্যক্তিদেরকে লাঞ্ছিত করে।'

(সূরা আন নমল, আয়াত-৩৪)

এসব প্রতাপশালী শাসকদের তলোয়ার জনপদ ও জনসমাজে বসবাসকারী দুস্কৃতকারীদের আত্মগোপন করতে অবশ্য বাধ্য করে, কিন্তু তারা নির্জন ও নিঃসঙ্গ পরিবেশে গুপ্ত অপরাধীদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। তারা শহর ও রাজপথে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেছে, কিন্তু মানুষের অন্তরের রাজ্যে সুখ ও শান্তি প্রদান করতে পারেনি। তারা দেহের রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে সত্য, কিন্তু রূহের জগতে আইন ও শৃঙ্খলা তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি; বরং আধ্যাত্মিক ধ্বংসের সকল উপাদান তাদেরই দরবার থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের জন্য আলেকজাণ্ডার ও জুলিয়াস সীজারের ন্যায় মহাপরাক্রান্ত বাদশাহগণও কি কিছু রেখে গিয়েছেন?



www.nagorikpathagar.org

আজ পর্যন্ত সুলান থেকে শুরু করে অনেক বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন আইনবিদ জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাদের আইনের জীবনকাল স্থায়িত্ব লাভ করেনি এবং সে আইন মান্যকারীরা মানসিক পবিত্রতার রহস্যের সন্ধান লাভ করেনি। পরবর্তীকালের বিচারকগণ ও বিচারালয়গুলো সেসব আইনকে ভ্রান্ত মনে করে বাতিল করেছেন। তারা মানবজাতির সংস্কারের জন্য না হলেও শুধু নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী সেখানে অন্য আইন জারি করেছেন। আজও এ অবস্থা পরিবর্তিত হয়নি। আজকের সুসভ্য যুগেও বিভিন্ন দেশে এমন সব আইন পরিষদ গঠিত হয়েছে যে, তার আজকের বৈঠকে যে আইন পাস হয়, কাল তা বাতিল হয়ে যায়। আর এসব পরিবর্তন করা হয়ে থাকে জনগণের স্বার্থে নয়; বরং সরকার ও রাষ্ট্রপরিচালকদের স্বার্থেই।

প্রিয় বন্ধুগণ! যে সর্বোচ্চ শ্রেণির মানব-সন্তানদের দ্বারা মানবজাতির কল্যাণ ও সংশোধনের আশা করা যায়, তাদের প্রত্যেকের অবস্থা আপনারা পর্যালোচনা করেছেন। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন। বর্তমানে দুনিয়ার যেখানেই সুকৃতির আলোক ও সততার কিরণ দীপ্তিমান, যেখানেই আন্ত রিকতা ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের শিক্ষা প্রোজ্জ্বল, সেখানেই তা শুধুমাত্র সেসব মহামনীষীর শিক্ষা ও হিদায়াতের ফলশ্রুতি নয় কি, যাদেরকে আপনারা নবী বলে জানেন? পর্বতের গুহায়, বনের বীথিকায়, নগরে ও জনপদে যেখানেই দয়া, করুণা, ইনসাফ, দরিদ্রের সাহায্য, ইয়াতিমের প্রতিপালন ও সুকৃতির সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানেই তা অবশ্য এ মহান দলটির কোন-না-কোন ব্যক্তির দাওয়াত ও শিক্ষার স্থায়ী প্রভাবের ফল এবং কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী।

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرًا۔

'এমন কোন জাতি নেই যার মধ্যে কোন সতর্ককারীর আবির্ভাব ঘটেনি' এবং وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ 'প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছেন একজন করে পথ প্রদর্শক।'

www.nagorikpathagar.org

আজ প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতির মধ্যে শুধুমাত্র তাঁদেরই কথা ও কাজের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে এবং দিকে দিকে তাঁদের বাণীর প্রতিধ্বনিই শোনা যাচ্ছে। সভ্যতার আলোক-বঞ্চিত আফ্রিকার আদিম অধিবাসী হোক বা ইউরোপের সুসভ্য মানুষ, প্রত্যেকের হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা নবীগণের পবিত্র উৎসধারায় অবগাহনেরই ফল। ইতোপূর্বে আমি যেসকল মহান ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণির নাম উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ শ্রেণিটি রাজা-বাদশাহের ন্যায় দেহের ওপর নয় বরং হৃদয়ের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। যদিও সেনাপতির ধারালো তরবারি তাঁদের হাতে নেই, তবুও তাঁরা গুনাহর স্তূপ ও অসৎ কাজের সারি মুহূর্তে উলটিয়ে দেন। তাঁরা কল্পনা রাজ্যে বিচরণকারী কবি না হলেও আজও মানুষের কান তাঁদের সুমিষ্ট ভাষণের স্বাদ গ্রহণ করেছে। যদিও তাঁরা বাহ্যত আইন পরিষদের সিনেটর ছিলেন না, তবুও হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর পর আজও তাঁদেরই আইন পূর্ববত জীবিত আছে এবং তা শাসক ও আদালত উভয়ের ওপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে। তাঁদেরই আইন সমানভাবে বাদশাহ-ফকীর ও রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সবার ওপর প্রযোজ্য রয়েছে।

এখানে ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, বরং প্রশ্ন হচ্ছে প্রকৃত ইতিহাসের, বাস্তবে এর অস্তিত্ব আছে কি? পাটলিপুত্রের রাজা অশোকের নির্দেশাবলী শুধু পাথরের গায়ে খোদাই করা আছে। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের নির্দেশাবলী হৃদয়পটে উৎকীর্ণ আছে। উজ্জয়িনী, হস্তিনাপুর (দিল্লী) ও কনৌজের রাজাদের নির্দেশ ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু মনুর ধর্মশাস্ত্র আজও প্রচলিত আছে। ব্যাবিলনের সর্বপ্রথম আইন প্রণেতা রাজা হামুরাবীর আইন-পুস্তক বহুকাল পূর্বে পৃথিবীর মাটিতে মিশে গিয়েছে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর শিক্ষা আজও জীবিত। ফিরাউনের اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ খোদা'-এর যুগের কোন চিহ্ন বিদ্যমান আছে কি? অথচ হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর শক্তি আজও পৃথিবীতে স্বীকৃত। সুলান প্রণীত আইন স্থায়িত্ব লাভ করতে পেরেছে কি? অথচ আজও তাওরাতের প্রত্যাদিষ্ট আইন মানুষের মধ্যে ইনসাফের তুলাদণ্ডরূপে স্বীকৃত। যে রোমান ল' হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আদালতে পাপী প্রমাণিত করেছিল, শত শত বছর পূর্বে তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছে। কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা ও

www.nagorikpathagar.org

হিদায়াত আজও পাপীদেরকে পুণ্যবান ও অপরাধীদেরকে নিরাপরাধ ও সচ্চরিত্র করার দায়িত্ব পূর্বের মতই পালন করে যাচ্ছে। মক্কার আবূ জাহল, ইরানের কিসরা ও রোমের কায়সারের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব বিলীন হয়েছে, কিন্তু মদীনার শাসকের শাসন এখনও পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত রয়েছে।

বন্ধুগণ! আমার ইতোপূর্বেকার আলোচনা যদি আপনাদের কাছে সন্তোষজনক মনে হয়ে থাকে, তাহলে তা নিছক আকিদা-বিশ্বাসের কারণে নয়; বরং যুক্তি, প্রমাণ ও পৃথিবীর ইতিহাসের বাস্তব ঘটনাবলী আপনাদের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করেছে যে, মানবজাতির সত্যিকার উপকার, সৎকাজ, উন্নত নৈতিক বৃত্তি, হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা এবং মানবিক শক্তি-সামর্থের ভারসাম্য সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে মানবজাতির কোন দল যদি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে, তাহলে তা হচ্ছে নবীগণের দল। তাঁরা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে এ জগতে এসেছিলেন এবং জগদ্বাসীকে সৎশিক্ষা ও হিদায়াত দান করে তাঁদের পরেও মানুষের জন্য চলার পথ নির্ধারণ করে গিয়েছেন। তাঁদের শিক্ষা ও কাজের প্রস্রবণে রাজা-প্রজা, আমীর-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জ্ঞানী-মূর্খ সবাই সমভাবে উপকৃত হচ্ছে।

وَ تِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۔ وَ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَ نُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْسُفَ وَ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۔ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيٰى وَ عِيْسٰى وَ اِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۔ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُوْنُسَ وَ لُوْطًا ؕ وَ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۔ وَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ اِخْوَانِهِمْ ۚ وَ اجْتَبَيْنٰهُمْ وَ هَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۔ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ لَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ ۔

www.nagorikpathagar.org

'আর আমি ইবরাহীমকে তার জাতির ওপর (নিজের যুক্তি উপস্থাপন করার জন্য) এ দলীল প্রদান করেছি। আমি যাকে চাই তার মর্যাদা বৃদ্ধি করি। অবশ্য তোমার প্রতিপালক বিজ্ঞ ও জ্ঞানী। আর আমি তাকে (ইবরাহীমকে) ইসহাক ও ইয়া'কুব দান করেছি। তাদের প্রত্যেককে হিদায়াত দান করেছি। এবং (ইব্‌রাহীমের) পূর্বে আমি নূহকে হিদায়াত দান করেছি এবং তার (ইবরাহীমের) বংশ থেকে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে (হিদায়াত) দান করেছি। সৎকর্মশীলদেরকে আমি এভাবেই প্রতিদান প্রদান করে থাকি। আমি যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, 'ঈসা ও ইলইয়াসকে (হিদায়াত) দান করেছি। তাদের প্রত্যেকে ছিল সৎব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। আমি ইসমাঈল, ইয়াসায়া, ইউনুস ও লুতকে হিদায়াত দান করেছি এবং তাদের প্রত্যেককে দুনিয়ায় (তাদের সমকালীন ব্যক্তিবর্গের ওপর) শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি এবং তাদের প্রপিতাদের মধ্য থেকে, তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে আর তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তাদেরকে নির্বাচন করেছি ও সরল পথের দিকে হিদায়াত করেছি। এটিই আল্লাহ্‌র হিদায়াত। নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁকে এ হিদায়াত দান করেন। যদি তারা শির্‌ক করত, তাহলে তাদের সমস্ত কাজ ধ্বংস হয়ে যেত। এ লোকদেরকে আমি কিতাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা ও নবুয়ত দান করেছি। কাজেই এসব লোক (বর্তমানে তাদের তথাকথিত অনুসারীরা) সেসব নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কারণে সেগুলো আমি এমন লোকদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) কাছে ন্যস্ত করেছি, যারা সেগুলোর অমর্যাদা করে না। এদেরকেই আল্লাহ্‌ হিদায়াত দান করেছেন। কাজেই তুমি ও এদের হিদায়াতের অনুসরণ কর।'

(সূরা আনআম, আয়াত : ৮৩-৯০)

মানবজাতির হিদায়ত ও পথ প্রদর্শনের জন্য এ পবিত্র আয়াতসমূহে একটি বিশেষ মানবশ্রেণির অন্তর্গত বহু ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের আনুগত্য ও অনুসৃতি আমাদের আত্মিক ব্যাধি ও নৈতিক দুর্বলতার প্রতিষেধক। এ পবিত্র দলটি আল্লাহর সৃষ্ট লোকালয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যুগে যুগে তাঁদের শিক্ষা ও হিদায়াতের প্রদীপ উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন। আজ মানুষের জীবনে কল্যাণ, সৌভাগ্য, নৈতিকতা, সৎ কাজ ও উন্নত জীবনের যা কিছু প্রভাব ও চিহ্ন বর্তমান তার সবকিছু এসব মনীষীরই

www.nagorikpathagar.org

বদৌলতে সম্ভব হয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে তাঁদের পদচিহ্ন রেখে গিয়েছেন। জগতে কমবেশী তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করেই চেষ্টা যত্নে সাফল্যের অনুসন্ধান করছে।

নূহের প্রচার উদ্দীপনা, ইবরাহীমের তাওহীদী প্রেরণা, ইসহাকের পৈতৃক উত্তরাধিকার, ইসমাঈলের কুরবানি, মূসার অবিরাম প্রচেষ্টা ও সাধনা, হারূনের সত্যপ্রীতি, ইয়াকুবের আনুগত্য, সত্যের করুণ অবস্থার প্রতি দাউদের মাতম, সুলায়মানের জ্ঞান, যাকারিয়ার ইবাদত, ইয়াহইয়ার পবিত্রতা, ঈসার আল্লাহভীতি, ইউনুসের ভুল স্বীকার, লূতের অক্লান্ত পরিশ্রম, আইউবের ধৈর্য এগুলোই আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের মনোরম ও সুসজ্জিত প্রাসাদের প্রকৃত কারুকার্য। এ উন্নত গুণাবলীর অস্তিত্ব পৃথিবীর যেখানেই পরিদৃষ্ট হয়, সেখানেই তা সে মহামনীষীগণের আদর্শ ও জীবনের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। মানুষের উত্তম সমাজ, যথার্থ সভ্যতা-সংস্কৃতি, উন্নতমানের সুখানভূতির পূর্ণতা এবং বিশ্বজাহানে তাকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা দানের ব্যাপারে অবশ্য মানবজাতির সমস্ত কর্মী ভূমিকা স্বীকার্য। জ্যোতির্বিদগণ নক্ষত্রের গতি বর্ণনা করেছেন, বৈজ্ঞানিকগণ বস্তুর মৌলিক বিশেষত্ব নির্ণয় করেছেন, ডাক্তারগণ রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছেন, ইঞ্জিনিয়ারগণ বিরাট বিরাট প্রাসাদ নির্মাণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, শিল্পীগণ হাজার হাজার শিল্প সৃষ্টি করেছেন। তাদের সবার প্রচেষ্টা ও সাধনায় জগতে পূর্ণতা এসেছে। তাই আমরা এদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা তাঁদের প্রতি সর্বাধিক কৃতজ্ঞ, যাঁরা আমাদের অভ্যন্তরীণ জগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন, আমাদের লোভ ও লালসাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, আমাদের আত্মিক রোগের প্রতিষেধক নির্ণয় করেছেন, আমাদের আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা ও সংকল্পের সংস্কার সাধন করেছেন, আমাদের আত্মা ও হৃদয়ের উন্নতি ও অধগতির পন্থা বলে দিয়েছেন। এসবের মাধ্যমে জগতে মানবসমাজে সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্ণতা লাভ করেছে, চরিত্র ও নৈতিক বৃত্তি মানবতার প্রাণশক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে; সততা ও সৎবৃত্তি কর্মক্ষেত্রের আলোকবর্তিকা বিবেচিত হয়েছে। আল্লাহ ও বান্দার পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত হয়েছে এবং সৃষ্টির প্রথম দিনের কৃত সে বিস্মৃত ওয়াদা পুনর্বার আমাদের স্মৃতিপটে জাগরুক হয়েছে। যদি আমরা মানব-প্রকৃতির এসব রহস্য এবং

www.nagorikpathagar.org

সৎবৃত্তি ও সততা সম্পর্কিত নবী-রাসূলগণের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতাম, তাহলে এ দুনিয়া কি কখনো পূর্ণতার সীমায় পৌছতে সক্ষম হত? তাই আমাদের ওপর মানবজাতির শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম এ শ্রেণিটির দান অগণিত এবং এ জন্য সকল শ্রেণির মানুষের তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা অত্যন্ত প্রয়েজনীয় বিষয়। ইসলামের ভাষায় এরই নাম 'সালাত' ও 'সালাম'। নবীগণের পবিত্র নামের সাথে আমরা সব সময়ই এ কথাগুলো উচ্চারণ করি–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ وَسَلِّمْ۔

হে আল্লাহ! তুমি তাঁদের প্রতি শান্তি বর্ষণ কর!

বন্ধুগণ! এসব পবিত্র ব্যক্তিগণ তাঁদের নির্ধারিত সময়ে জগতে এসেছেন এবং আবার যথাসময়ে এখান থেকে বিদায় নিয়েছেন। এ ধ্বংসশীল বিশ্বের কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তাঁদের জীবন যতই পবিত্র ও নিষ্কলুষ হোক না কেন, চিরস্থায়ী হবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। তাই মানবজাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য যা পথপ্রদর্শক হতে পারে তা হচ্ছে লিখিত ও মৌখিক বর্ণনা মারফত প্রাপ্ত তাঁদের জীবনপ্রণালী। আমাদের কাছে এ অমূল্য সম্পদ সংরক্ষণের অন্য কোন পন্থা বা পদ্ধতি নেই। মানবজীবনের এসব লিখিত ও বর্ণিত রূপরেখা ও প্রতিচ্ছবির নামই ইতিহাস ও জীবনচরিত। সম্ভবত আমাদের জীবনের অন্যান্য অংশের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের কোননা কোন শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কিন্তু আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পরিশুদ্ধি ও পূর্ণতার জন্য একমাত্র নবীগণ ও তাঁদের পদাংক অনুসরণকারীগণের ইতিহাস ও জীবনচরিতই কার্যকরী ও উপকারী হতে পারে, এতদিন পর্যন্ত মানুষ একমাত্র তাঁদের কাছে থেকেই উপকৃত হতে পারে। তাই মানুষের নিজের আত্মিক পরিশুদ্ধি ও পূর্ণতার জন্য এসব পবিত্র ও পুণ্যবান ব্যক্তিগণের জীবনচরিত সংরক্ষণ সর্বাপেক্ষা বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে গণ্য হয়।

দর্শন, শিক্ষা ও হিদায়াত যতই উন্নত ও উত্তম হোক না কেন, যদি এর পেছনে একে ধারণ ও বাস্তবায়িত করার এমন উপযোগী ব্যক্তিত্ব না থাকে যিনি আমাদের মনোযোগ, মহব্বত ও মর্যাদার মধ্যমণি হিসেবে বিবেচিত হবেন, তাহলে তা কোনদিনই সত্যিকারের জীবন লাভ ও সাফল্য অর্জনে

www.nagorikpathagar.org

সক্ষম হবে না। ১৯২৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে ক্রুকোডিয়া নামক জাহাজযোগে হেজাজ ও মিসর সফর শেষে ফিরে আসার সময় ঘটনাক্রমে বিশ্ববিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একই জাহাজযোগে আমেরিকা সফর শেষে দেশে ফিরছিলেন। এক যাত্রীবন্ধু তাঁকে প্রশ্ন করেন, "ব্রাহ্মণসমাজের ব্যর্থতার কারণ কী? অথচ তার নীতি ছিল বড়ই ন্যায়নিষ্ঠ সংস্কারবাদী। ব্রাহ্মণসমাজের শিক্ষা ছিল– সকল ধর্ম সত্য এবং সকল ধর্মের প্রবর্তকগণ সৎ ও মহান ব্যক্তি ছিলেন। এ সমাজের মধ্যে বুদ্ধি ও যুক্তিবিরোধী কোন কথাই ছিল না, বর্তমান জগতের সভ্যতা সংস্কৃতি, দর্শন ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই তার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। তবুও এ মতবাদ কেন সাফল্য লাভ করতে পারেনি?"

দার্শনিক কবি এর জবাব কি চমৎকারভাবেই না দিয়েছেন। তিনি বললেন, ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে, এর পেছনে এমন কোন ব্যক্তির জীবন ও তাঁর বাস্তব চরিত্র ছিল না, যিনি আমাদের দৃষ্টির মধ্যমণি হতে পারতেন এবং আমাদের জন্য সততা ও সৎকর্মশীলতার জলজ্যান্ত নমুনায় পরিণত হতেন।" এ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম তার নবীর চরিত্র ও বাস্তব জীবনধারা ছাড়া ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য হবে।

মোটকথা, আমাদের হিদায়াত ও পথনির্দেশের জন্য আমরা নিষ্কলুষ মানুষ, নিষ্পাপ সত্তা ও সকল দিক দিয়ে পরিপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী মনীষীগণের মুখাপেক্ষী। আর তাঁরা হচ্ছেন আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূল।

صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ۔

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের সবার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

www.nagorikpathagar.org

# ২. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতই শাশ্বত ও বিশ্বজনীন আদর্শ

প্রিয় বন্ধুগণ! আজ আমাদের মাহফিলের দ্বিতীয় দিন। যা ইতোপূর্বে কিছু বলেছি, তা নিশ্চয় আপনাদের স্মরণ আছে। তাই এখন আরেকটু সামনে এগিয়ে আসাই সঙ্গত। আমার পূর্ব ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল, মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত্যের চিন্তা-চেতনা দূর করার জন্য অপরিহার্য এক বিষয় অতীত দীপ শিখা থেকে আলো গ্রহণ করা । এ বিষয়ে মানবশ্রেণীর মধ্য থেকে যারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা আমাদের পথ-নির্দেশক ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আবার তাঁদের মধ্যেও আমাদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিমাণে দয়া করেছেন আল্লাহ্‌র নবী রাসূলগণ। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুগে নিজেদের কওমের সামনে সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী উন্নত নৈতিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ মানবিক গুণাবলীর দিকসমূহ কোন না কোন উন্নত অলৌকিক নিদর্শনে উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের কেউ ধৈর্য, কেউ ত্যাগ, কেউ কুরবানী, কেউ তওহীদের আবেগ, কেউ হকের প্রেরণা, কেউ আনুগত্য, কেউ নিষ্কলুষ মনোবৃত্তি, কেউ আল্লাহ্‌ভীতি ইত্যাদি দিকগুলোর মাধ্যমে উন্নত আদর্শ স্থাপন করে বিশ্বে মানুষের জটিল জীবনপথে এক একটি সুউচ্চ মিনার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেন মানুষ তা দেখে সোজা ও সরল পথের সন্ধান লাভ করে সক্ষম ও সফল হতে পারে। কিন্তু এরপরও প্রয়োজন ছিল এমন একজন পথপ্রদর্শক নেতার যিনি নিজের হিদায়াত ও বাস্তব কার্যাবলীর মাধ্যমে সমগ্র পথের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করতে পারেন অর্থাৎ আমাদের হাতে তিনি যেন হিদায়াতের একটি পরিপূর্ণ পথ-নির্দেশনা প্রদান করেন। আর তা নিয়ে প্রত্যেকটি মুসাফির অনায়াসে যেন গন্তব্যস্থানের সন্ধান লাভে সক্ষম হতে পারেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করে জগদ্বাসীর সামনে উপস্থাপন করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে :

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا۔ وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا۔

'হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষীদানকারী, (সৎকর্মশীলদেরকে) সুসংবাদদানকারী (গাফিলদেরকে) সতর্ককারী এবং আল্লাহর নির্দেশে তাঁর দিকে আহবানকারী ও একটি উজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপ পাঠিয়েছি।'

(সূরা আল আহযাব, আয়াত : ৪৫-৪৬)

তিনি এ পৃথিবীতে আল্লাহর শিক্ষা ও হিদায়াতের সাক্ষীদানকারী সৎ-কর্মশীলদের কল্যাণ ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ প্রদানকারী। আর এখনো যারা সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ বা অবহিত নয়, তাদেরকে সতর্ক ও সাবধানকারী, ভীতি প্রদর্শক, পথভ্রষ্টদেরকে আল্লাহর দিকে আহবানকারী এবং তিনি নিজে সাক্ষাত আলোক ও প্রদীপ স্বরূপ। অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জীবনাদর্শ আমাদের পথের অন্ধকার দূরীভূতকারী উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা স্বরূপ। আর এমনি সকল নবীগণই আল্লাহর বাণীর সাক্ষীদানকারী, এর প্রতি আহ্বানকারী, সুসংবাদদানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী ইত্যাদি গুণের প্রতীক হিসেবে এ পৃথিবীতে এসেছেন। কিন্তু তাঁদের এসব গুণাবলী সকলের জীবনে কার্যত সমভাবে বিকাশ লাভ করেনি। এমন অনেক নবী ছিলেন, যাঁরা বিশেষভাবে সাক্ষীদানের দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন, হযরত ইয়াকুব, হযরত ইসহাক, হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম প্রমুখ নবীগণ। সুসংবাদদানকারীর দায়িত্ব অনেক নবী পালন করেছেন। যেমন, হযরত ইবরাহীম, হযরত ঈসা প্রমুখ নবীগণ। অনেক নবীর ভীতি প্রদর্শন ছিল বিশেষ গুণ– যেমন হযরত নূহ, হযরত মূসা, হযরত হূদ ও হযরত শুআইব প্রমুখ নবীগণ। আবার অনেক নবীর বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যের দিক নির্দেশনা দান। যেমন, হযরত ইউসুফ, হযরত ইউনুস প্রমুখ নবীগণ। আর যিনি একই সাথে সাক্ষীদানকারী, সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী, সত্যের পথের আহবায়ক ও উজ্জ্বল প্রদীপ ছিলেন এবং যাঁর জীবনপ্রবাহে এসব গুণ সুস্পষ্ট আকারে বিদ্যামান ছিল, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ তাঁকে সর্বশেষ নবী-রাসূল হিসেবে জগতে প্রেরণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত প্রদান করা হয়েছিল। তাই আল্লাহ্‌র বিধানকে পূর্ণতাদানের জন্য কোন নবী আসার আর প্রয়োজনই ছিল না।

কেননা তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা চিরন্তন স্থায়িত্বের প্রতীক। অর্থাৎ তা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। তাই যাবতীয় দিক থেকে তাঁর পবিত্র সত্তাকে পূর্ণতা প্রদান করে অক্ষয় ভূষণে বিভূষিত করা হয়েছিল।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমি যা কিছু বলেছি এগুলো শুধু আমার ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাস ভিত্তিক কোন দাবি নয় তাই বলা চলে যুক্তি-প্রমাণের সৌধ নির্মাণে এর ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মানুষের জন্য যে চরিত্র বা জীবনাদর্শ একটি আদর্শ জীবনের কাজ করে, তাকে মেনে নেয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত থাকে। এর সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর নির্ভরতা বা আস্থা।

## ঐতিহাসিক ভিত্তি ও নির্ভরতা

ঐতিহাসিক ভিত্তি বা নির্ভরতার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে একজন আদর্শ মানুষের জীবনচরিত সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করা হবে, তা ইতিহাস ও বর্ণনাসূত্রের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য হতে হবে। এক্ষেত্রে নিছক কিস্‌সা-কাহিনীর অবতারণা করা হলে চলবে না। আর বাস্তব অভিজ্ঞতায় বলা যায়, কোন জীবনচরিত কাল্পনিক ও সন্দিহান বলে জানতে পারে তাহলে মানুষের মনে এ সংক্রান্ত একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং এরপর তা যতই আবেগী ভাষায় ও হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হোক না কেন, মানুষ তা থেকে কোন স্থায়ী বা সুদূরপ্রসারী ফল গ্রহণে সক্ষম হবে না। অতএব সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ জীবনচরিতের জন্য তার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশের ঐতিহাসিক ভিত্তির ক্ষেত্রে বিশ্বাস স্থাপন হবে অপরিহার্য বিষয়। কেননা ইতিবৃত্ত মানব-প্রকৃতির ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক প্রভাব বিস্তার করে, কাল্পনিক গল্প-কাহিনীর দ্বারা তা কোন অবস্থাতেই সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ঐতিহাসিক ভিত্তির অপরিহার্যতা এটাই যে, আপনি নিছক কৌতূহল নিবৃত্তি অথবা অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে এ আদর্শ

www.nagorikpathagar.org

চরিতের রূপরেখা পর্যালোচনা করেন না; বরং এ আদর্শ মোতাবেক নিজ জীবনকে গড়ে তোলা এবং তার অনুসরণ করার জন্যই এরূপ করেন থাকেন। কিন্তু যদি ইতিহাস ও বাস্তব ঘটনাবলীর ভিত্তিতে এ চরিত্রই প্রমাণিত না হয়, তখন আপনি তার কার্যকারিতা ও কল্যাণকারিতা সম্পর্কে কি করে জোর দিতে পারেন? তখন এগুলোকে এ অবস্থায় যে কোন লোক কাল্পনিক ও পৌরাণিক কথা কাহিনী আখ্যা দিয়ে– এগুলোর ওপর বাস্তব জীবনের ভিত্তি স্থাপন সম্ভব নয় বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। তাই প্রভাব বিস্তারকারী, বাস্তবে কার্যকর ও অনুসরণযোগ্য হবার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সে পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ মানুষটির জীবনচরিত ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমরা সব নবীকেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করি এবং তাঁদের নবুয়তের সত্যতায়ও বিশ্বাসী। কিন্তু সাথে সাথে–

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ۔

আমি 'এসব নবীর মধ্যে কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি'- আল্লাহর একথাও স্বীকার করি। বস্তুত নবুয়তের আদর্শের স্থায়িত্ব, সমাপ্তি এবং সর্বশেষে পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ মানবচরিত হবার কারণে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিশেষত্বের মর্যাদা লাভ করেছেন অন্য কোন নবী তা লাভে সক্ষম হননি। কেননা, অন্য নবীগণকে স্থায়ী, শেষ ও খতমে নবুয়তের অর্থাৎ নবুয়তের মোহরের মর্যাদা প্রদান করা হয়নি। তাঁদের জীবনচরিতের উদ্দেশ্য ছিল কোন একটি বিশেষ জাতির কাছে একটি বিশেষ যুগ পর্যন্ত আদর্শ উপস্থাপন করা। তাই সে যুগের পর দুনিয়া থেকে তাঁদের সে আদর্শ ক্রমান্বয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আজ আর সেসব অবশিষ্ট নেই।

তাই এবার ভেবে দেখুন! প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতির মধ্যে, প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক ভাষায় কত লাখ লাখ মানুষ আল্লাহর বাণী নিয়ে এসেছেন। আমরা আজ তাঁদের ক'জনের নাম জানি? আমরা আর যাঁদের নাম জানি কিন্তু তাঁদের পূর্ণ বিবরণও কি জানি? হিন্দু সম্প্রদায়ের দাবি তারা জগতের সর্বাধিক প্রাচীন জাতি। প্রকৃত ব্যাপার যদিও তা নয়, তবুও গভীরভাবে

www.nagorikpathagar.org

লক্ষ্য করুন, তাদের ধর্মে শত শত মনীষীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এসব মনীষীর একজনের জীবনও ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণে প্রমাণিত নয়। শুধু তাঁদের অনেকের নামটি ছাড়া আর কিছুরই উল্লেখ পাওয়া যায় না আর পৌরাণিকতার সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশাধিকারও নেই। তাঁদের সর্বাপেক্ষা বেশি জ্ঞাত চরিত হচ্ছে রামায়ণ এবং মহাভারতের দেব-দেবী। কিন্তু তাদের জীবন চরিত সম্পর্কে যা অবগত হওয়া যায় এর মধ্যে কোনটিকে ঐতিহাসিক বলবেন? এটাও জানা অসম্ভব যে, এসব ঘটনাবলী কোনকালের কোন শতাব্দীর ও কোন বর্ষের। বর্তমানে কিছু ইউরোপের পণ্ডিত নানান কল্পনা ও অনুমানে কতক সময় নির্ধারণ করেছেন এবং আমাদের শিক্ষিত হিন্দু সমাজ সেগুলোকেই তাঁদের জ্ঞান ও বিদ্যার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অধিকাংশই এমন, যারা এগুলোকে ইতিহাসের পর্যায়ে বিবেচনা করেন না; বরং এসব ঘটনা কোনদিন বাস্তবে সংঘটিত হয়েছিল বলেও অস্বীকার করেন।

আজও ইরানের প্রাচীন পার্শী ধর্মের প্রবর্তক যরথুষ্ট্র লাখ লাখ মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বও প্রাচীনতার অন্ধকারে বিলীন। তাঁর নিজের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কেও এমন অনেক ইউরোপীয় ও আমেরিকান গবেষক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রাচ্যবিদগণের মধ্যে যাঁরা তাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্বের স্বীকৃতি দান করেন, তাঁরা বহু ধারণা ও অনুমান নির্ভর তথ্য দ্বারা তাঁর জীবনচরিতের কিছু কিছু বিষয় নির্ধারণ করেন। কিন্তু তাও বিভিন্ন গবেষকের পরস্পরবিরোধী মতামতের সংঘর্ষে এতই সন্দেহপূর্ণ যে, কোন ব্যক্তি এর ওপর নির্ভর করে নিজ কর্মজীবনের ভিত্তি স্থাপনে সক্ষম হতে পারে না। যরথুষ্ট্রের জন্মস্থান, জন্মবর্ষ, জাতীয়তা, বংশ, ধর্ম, ধর্মপ্রচার, ধর্মীয় পুস্তিকার যথার্থতা, ভাষা, মৃত্যুবর্ষ, মৃত্যুস্থান ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে বহু মতভেদ রয়েছে এবং এক্ষেত্রে নির্ভুল বর্ণনা এতই প্রকট যে, আন্দাজ-অনুমান ছাড়া এ প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যায়। আজকাল পার্শীগণ এসব কারণে সরাসরি নিজেদের বর্ণনার মাধ্যমে সন্দেহযুক্ত এ

www.nagorikpathagar.org

অনুমানগুলোর জ্ঞান রাখেন না; বরং ইউরোপীয় ও আমেরিকান পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত থেকে তারা এগুলো বুঝে নেয়ার চেষ্টা করছেন। আর তাদের নিজস্ব জ্ঞানের মাধ্যমে ফেরদৌসীর শাহনামা ডিঙ্গানো সম্ভব হয়নি। সেসব গ্রীক দুশমনেরা নিশ্চিহ্ন করেছে– এ আপত্তি নিতান্তই অগ্রহণযোগ্য। আমরা এখানে শুধু এতটুকু উল্লেখ করব যে, নিশ্চিহ্ন বা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কীভাবে তা হয়েছে, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। প্রমাণ শুধু এটুকু থেকেই হয় যে, ওটা স্থায়ী ও দীর্ঘকালীন জীবন লাভে সক্ষম হয়নি। এ জন্যই কেন (Kern) ও ডার মিটিটার (Der Meteter)-এর ন্যায় গবেষক ও পণ্ডিতগণ যরথুষ্ট্রের ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিক ভিত্তি অস্বীকার করেছেন।

প্রাচীন এশিয়ায় সর্বাধিক ব্যাপক প্রচারিত ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম। এ ধর্ম এক সময় ভারতবর্ষ, চীন, সমগ্র মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, তুর্কীস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আর আজও বার্মা, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, চীন, জাপান ও তিব্বতে এ ধর্ম চালু রয়েছে। অবশ্য একথা বলা সহজ যে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরা একে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এবং মধ্য এশিয়ায় ইসলামের আগমনে এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু সমগ্র দূরপ্রাচ্যে তার রাষ্ট্র, সভ্যতা ও ধর্ম অস্ত্রবলে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং তা এখনো অজেয়। কিন্তু তার এসবের পরও কি বুদ্ধের জীবনচরিতকে ইতিহাসের আলোকে স্থায়িত্ব প্রদানে সক্ষম হয়েছে? এবং কোন ঐতিহাসিক কি সে জীবনচরিতের সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাবদানের ক্ষমতা অর্জন করেছেন? বুদ্ধের আবির্ভাবকাল নির্ধারণ করা হয় মগধ দেশের রাজাদের বিবরণ মোতাবেক। অর্থাৎ এটা নিরূপণের অন্য প্রমাণ নেই। গ্রীকদের সাথে তৎকালীন মগধ-দেশীয় রাজাদের ঘটনাক্রমে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল। এ জন্যই আজ সম্ভব হয়েছে তাদের শাসনকাল নির্ধারণ।

জৈনধর্ম প্রবর্তকের জীবনচরিত আরো অধিক অনিশ্চিত। আমরা অনুরূপ চীনের কন্‌ফুসিয়াস সম্পর্কে বুদ্ধের চেয়েও অনেক কম তথ্য জানি। অথচ তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা কোটি কোটি।

www.nagorikpathagar.org

শত শত নবী এসেছেন সেমেটিক জাতির মধ্যে। কিন্তু তাঁদের শুধু নাম ছাড়া ইতিহাসে আর কোন চিহ্নই বর্তমান নেই। হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত হূদ, হযরত সালেহ, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত যাকারিয়া এবং হযরত ইয়াহ্ইয়ার জীবনচরিতের এক একটি বিশেষ অংশ ব্যতীত আর কিছুই কি কেউ আমাদের জানাতে সক্ষম হয়েছে? ইতিহাসের পাঠ থেকে তাঁদের জীবনের অনেক অংশ বিলুপ্ত হয়েছে। এ অবস্থায় তাঁদের পবিত্র জীবনের অবলুপ্ত ও অসংলগ্ন অংশ কি কোন পূর্ণাঙ্গ মানবজীবনের জন্য অনুসরণযোগ্য বলা যেতে পারে? যদি কুরআনকে বাদ দেয়া যায় ইহুদীদের যেসব কিতাবে তাঁদের জীবনপ্রবাহের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ আছে, তার মধ্যে প্রত্যেকের সম্পর্কে ধর্মীয় পণ্ডিতগণ বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ করেছেন। যদি এ সন্দিগ্ধ বিষয়গুলো বাদ দেয়া যায় যা অবশিষ্ট থাকে, তা তাঁদের জীবন সম্পর্কে এক অসম্পূর্ণ চিত্রই আমাদের কাছে উত্থাপিত হয়।

আমরা তাওরাত থেকে হযরত মূসার অবস্থা জানতে পারি। কিন্তু আজ যে তাওরাত আমাদের কাছে আছে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধানকারীদের অভিমত এটাই যে, হযরত মূসার শত শত বছর পর তা রচিত। একথা 'এন্সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা'র লেখকগণও স্বীকার করেছেন। বর্তমান সময়ে অনুসন্ধানে জার্মান পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করেছেন যে, বর্তমান তাওরাতে প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কে পাশাপাশি দু'টো করে সূরা বা বর্ণনা লিখা হয়েছে এবং সেগুলো অনেক স্থানে পরস্পরবিরোধী। এজন্যই আমরা তাওরাতে বর্ণিত জীবনকথা ও ঘটনাবলীতে প্রতি পদে পদে বিপরীতমুখী বর্ণনার মুখোমুখি হই। সর্বশেষ এ থিওরী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 'এন্সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা'র সংস্করণের 'বাইবেল' প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থায় হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল নবীর জীবনচরিতের ঐতিহাসিক ভিত্তি কতটুকু মজবুত রয়েছে বলা যায়?

ইঞ্জিলসমূহে হযরত ঈসার জীবনের ঘটনাবলী লিখা রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে লিখা অসংখ্য ইঞ্জিলের মধ্যে বর্তমান খ্রিষ্টান জগতের বিরাট অংশ মাত্র চারটি ইঞ্জিলকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। অবশিষ্ট

www.nagorikpathagar.org

ইঞ্জিলগুলো অনির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত রয়েছে। নিজ চোখে সে চারটি ইঞ্জিলের কোন একটির লেখকও হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-কে দেখেননি। এসব ঘটনা তাঁরা কার মুখ থেকে শুনে লিখেছেন এ কথাও অজানা; বরং সে চারটি কিতাবকে যে চার ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত করা হয়, তাঁদের সাথে এ কিতাবগুলোর সম্পর্ক সঠিক কিনা, এ বিষয়েও বর্তমানে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। কোন যুগে সে কিতাবগুলো কোন ভাষায় লিখা হয়েছিল, তাও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ হয়নি। পরবর্তীকালে ঈসায়ী ৬৭ সন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে ইঞ্জিল ব্যাখ্যাকার উল্লিখিত কিতাবগুলোর রচনাকাল উল্লেখ করেছেন! বর্তমানে হযরত ঈসার জন্ম, মৃত্যু ও ত্রিত্ববাদের শিক্ষাকে কিছু আমেরিকান সমালোচক ও যুক্তিবাদী (Rationalist) বলেছেন যে, হযরত ঈসার অস্তিত্ব নিছক কাল্পনিক এবং তাঁর জন্ম ও ত্রিত্ববাদের বর্ণনায় গ্রীকদের ধর্মীয় কাহিনীগুলোই অনুসরণ করা হয়েছে। কেননা পূর্ব থেকেই গ্রীক জাতির বিভিন্ন দেবতা ও বীরদের সম্পর্কে এ জাতীয় ধারণা বিদ্যমান ছিল। শিকাগোর বিখ্যাত পত্রিকা 'রূপন কোট'-এ হযরত ঈসার অস্তিত্বকে কাল্পনিক চিহ্নিত করে মাসের পর মাস আলোচনা হয়েছে। এসব আলোচনা থেকে জানা যায় যে, যেসব খ্রিষ্টানদের বর্ণনা থেকে হযরত ঈসার জীবন সংক্রান্ত যে বিবরণ পাওয়া যায়, এর ভিত্তি কোনক্রমেই সবল নয়।

## পূর্ণতা

একমাত্র তখনই কোন মানবচরিত্র কর্মজীবনের জন্য চিরস্থায়ী আদর্শরূপে বিবেচিত হতে পারে, যখন তার জীবনীগ্রন্থের প্রত্যেকটি পাতা আমাদের চোখের সামনে থাকে এবং তার জীবনের কোন একটি ঘটনা ও রহস্যও অজানার অন্ধকারে পতিত না হয়; বরং মানুষের সামনে তার সমগ্র জীবনচরিত ও অবস্থা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট থাকে। অনুরূপ হলেই এ জীবন মানবসমাজের জন্য একটি আদর্শরূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য কিনা, তা যাচাই করা যেতে পারে। যদি এ মানদণ্ডে বিভিন্ন ধর্মপ্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতাগণের জীবনচরিতের যাচাই করা করা যায় তখন দেখা যাবে যে, একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কেউ এ মানদণ্ডে পরিগণিত হতে পারেন না। এ থেকেই জানা যায় যে, শেষ নবী হিসেবেই

www.nagorikpathagar.org

তিনি জগতে আবির্ভাব হয়েছিলেন। আমি আগেই বলেছি যে, অসংখ্য নবীর মধ্য থেকে মাত্র তিন চারজনের জীবনচরিতকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। এরপরও তারা পূর্ণতার দিক দিয়ে যথেষ্ট বিবেচিত হল না। চিন্তা করুন, জনসংখ্যার বিচারে পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ বুদ্ধের অনুসারী। এরপরও ঐতিহাসিক মানদণ্ডে বুদ্ধের জীবন মাত্র নানান কল্পিত কিস্‌সা-কাহিনীর সমাহার ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই নয়। কিন্তু সে কিস্‌সা-কাহিনীগুলোকে যদি আমরা ঐতিহাসিক মর্যাদা দান করে তার জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশের অনুসন্ধান করি, তাহলে ব্যর্থতার পর্যবসিত হওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় থাকে না। এসব কিস্‌সা-কাহিনী থেকে আমরা শুধু এতটুকু অবগত হতে পারি যে, নেপালের 'তরাই' অঞ্চলে কোন এক যুগে শুদ্ধোদন নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর পুত্রের নাম ছিল গৌতম। তিনি স্বভাবত ছিলেন চিন্তাশীল। যৌবনে পদার্পণ করে এক সন্তানের পিতা হবার পর একদিন ঘটনাক্রমে কিছু দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পতিত হয়। তাকে এ ঘটনা অত্যধিক প্রভাবিত করে। এরপর স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ছেড়ে রাতের অন্ধকারে সংসার ত্যাগী হয়ে বারানসী (কাশী) পৌঁছেন। এরপর পাটলীপুত্র (পাটনা) ও রাজগীরের (বিহার) নগরে বন-জঙ্গল পাহাড়ে ঘুরতে থাকেন আর এভাবে কতদিন কাটালেন এবং গয়ার একটি গাছের নীচে কখন কীভাবে সত্যের সন্ধান লাভ করেন, কতকাল বারানসী থেকে বিহার পর্যন্ত সর্বত্র নিজ ধর্ম প্রচার করে এরপর এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তা অজানাই থেকে যায়। বুদ্ধ সম্পর্কে আমরা যা জানি, এর সংক্ষিপ্ত-সার হচ্ছে এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।

একটি ধর্মের প্রবর্তক যরথুষ্ট্রও। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, আমরা কিছু ধারণা ও অনুমান ব্যতীত তার জীবনচরিত সম্পর্কে আর কিছুই জানতে পারিনি। এ ধারণা থেকে যা কিছু জানা যায়, তা আমার নিজের ভাষায় না বলে বিংশ শতকের নির্ভরযোগ্য জ্ঞান-সূত্র 'এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা' থেকে 'যরথুষ্ট্র' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

আমরা কবিতায় লোকগাঁথার সংশ্লিষ্ট যরথুষ্ট্রের যে ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়েছি, তা জিন্দাবেস্তার যরথুষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বরং বিপরীতধর্মী।



www.nagorikpathagar.org

এ কাহিনীর অলৌকিক ব্যক্তিটির মাধ্যমে এরপর লোকগাথার কিছু কবিতা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এতে আমরা যরথুষ্ট্রের সত্যিকার অবস্থা জানার আশা করতে পারি না। আমাদের পক্ষে আর তা থেকে যরথুষ্ট্রের জীবনের কোন ঐতিহাসিক তথ্যও সংগ্রহ করা যায়নি। যা কিছু পাওয়া যায়, এসব কোনক্রমেই সুস্পষ্ট নয় অথবা অর্থহীন।[১]

সূচনায় বর্তমানকালের যরথুষ্ট্র সম্পর্কিত রচনাবলীর একই প্রবন্ধকার লিখেছেন : ঐতিহাসিক ও গবেষকগণের মতে 'তাঁর জন্মস্থান নির্ধারণের বিবরণসমূহ পরস্পর বিরোধী বলে চিহ্নিত।'

যরথুষ্ট্রের আবির্ভাবকাল নির্ধারণ সম্পর্কিত গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বিবরণ এবং আধুনিক গবেষকগণের অনুমান পরস্পর বিরোধী। তাই এক প্রবন্ধকার লিখেছেন :

আমরা 'যরথুষ্ট্রের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে কিছুই অবগত হতে পারি না।'

মোটামুটি তবুও আমরা যা জানি তা হলো এই : তিনি আজারবাইজানের কাছে কোন একস্থানে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বল্‌খ প্রভৃতি এলাকায় ধর্ম প্রচার করেন এবং রাজা গাশতাসপ তাঁর ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিছু অলৌকিক কাজও তিনি সম্পাদন করেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং সন্তান সন্ততির জনক ছিলেন। পরবর্তীতে কোন একস্থানে মৃত্যুবরণ করেছেন। এ অবস্থায় বলা যেতে পারে এমন অজ্ঞাত ব্যক্তি সম্পর্কে কোন 'পরিপূর্ণতার' ধারণাও বা কেমন করে করা যেতে পারে আর তাঁর জীবনইবা কি করে মানুষকে সুপথের সন্ধান দিতে সক্ষম হতে পারে?

পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে হযরত মূসা (আ)-এর জীবনই সর্বাধিক সুপরিচিত। বর্তমান তাওরাত নির্ভরযোগ্য কি অনির্ভরযোগ্য আপাতত এ প্রসঙ্গে না থেকে আমরা সে কিতাবের বর্ণনাগুলোকে পুরোপুরি নির্ভুল বলে স্বীকার করে নিচ্ছি। আমরা এরপরও তাওরাতের পাঁচটি গ্রন্থ থেকে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর জীবন সম্পর্কে কতটুকুইবা জানতে পারি? তবুও যতটুকু জানা যায়, তা হচ্ছে এই :

---

১. এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা, একাদশ সংস্করণ।

www.nagorikpathagar.org

"ফিরাউনের প্রাসাদে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করার পর লালিত-পালিত হতে থাকেন। পূর্ণ বয়স্ক হয়ে ফিরাউনদের যুলুম অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দু-একবার বনী ইসরাঈলদের সাহায্য করেন। এরপর মিসর থেকে মাদায়েনে পালিয়ে চলে যান। সেখানে বিয়ে করে বেশ কিছুকাল বসবাসের পর পুনরায় মিসর ফিরে আসেন। ফেরার পথে নবুয়তপ্রাপ্ত হন এবং ফিরাউনের কাছে পৌঁছেন। তিনি সেখানে ফিরাউনের সামনে অলৌকিক নিদর্শন পেশ করেন, আর বনী ইসরাঈলদেরকে মিসর থেকে নিয়ে যাবার অনুমতি চান। কিন্তু অনুমতি দেয়া হল না। বাধ্য হয়ে একদিন ফিরাউনের দৃষ্টির আড়ালে নিজ জাতিকে নিয়ে বের হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় আল্লাহর আদেশে সমুদ্রের বুকে তাঁর জন্য পথ তৈরি হলে সে পথ দিয়ে তিনি তাঁর জাতিকে নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে আরব ও সিরিয়ায় প্রবেশ করেন। এ খবর পেয়ে পেছনে অনুসরণকারী ফিরাউন তার সেনাদলসহ ছুটে চলে এবং সমুদ্রে আল্লাহর আদেশে নিমজ্জিত হয়। পরবর্তীতে তিনি কাফের জাতিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। এভাবে জীবন অতিবাহিত করে বৃদ্ধ বয়সে এক পাহাড়ে ইন্তিকাল করেন। তাওরাতের দ্বিতীয় বিবরণের শেষ কয়েকটি বাক্যে এরূপ বলা হয়েছে :

তখন সদাপ্রভুর দাস মোশি (মূসা) সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে মরিলেন আর তিনি মোয়াব দেশে বৈৎ পিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাঁহাকে কবর দিলেন। কিন্তু তাঁহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না। মরণকালে মোশির বয়স একশত বিংশতি বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার চক্ষু ক্ষীণ হয় নাই, ও তাঁহার তেজের হ্রাস হয় নাই।.... মোশির তূল্য কোনো ভাববাদী ইস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নাই। (৩৪ : ৫-১০)

১. তাওরাতের এগুলো হচ্ছে পঞ্চম গ্রন্থের বর্ণনা। এগুলো দাবি করা হয় হযরত মূসার রচনা বলে। তাই এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আপনাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত যে, এ সম্পূর্ণ গ্রন্থটি বা এর শেষাংশ কখনো হযরত মূসার রচনা নয়। আর সমস্ত জগতে হযরত মূসার এ জীবনী লেখক সম্পর্কেও কেউ অবগত থাকার কথা নয়।

www.nagorikpathagar.org

২. এ গ্রন্থটির উল্লিখিত 'তাঁহার কবরস্থান আজ পর্যন্ত কেহই জানে না।' এবং 'মোশির বা মূসা তূল্য কোন ভাববাদী বা নবী ইস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নাই।' অতএব এ শব্দগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসার জীবনীগ্রন্থের এ সর্বশেষ অংশটি হযরত মূসার মৃত্যুর এত দীর্ঘকাল পরে লিখা হয়েছে যে, সে সময়ের মধ্যে একটি বহু পরিচিত স্মৃতিচিহ্নকেও মানুষ ভুলে যেতে পারে এবং একজন নতুন নবীর আসার চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে।

৩. হযরত মূসা একশো বিশ বছর জীবিত ছিলেন। এবার কিন্তু চিন্তা করে দেখুন তাঁর এ সুদীর্ঘ একশো বিশ বছরের ক'টি ঘটনাই বা আমরা জানতে পেরেছি? আমাদের হাতে তাঁর জীবনের প্রয়োজনীয় ক'টি অংশ আছে? আমরা তাঁর জন্ম, যৌবনকালে হিজরত, বিবাহ ও নবুয়তের ঘটনাবলী জানি। এরপর কয়েকটি যুদ্ধের পর বৃদ্ধাবস্থায় ১২০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। এ বিষয়গুলোকে বাদও দেয়া যেতে পারে। কেননা, এগুলো তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এসব ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। অতএব মানব-সমাজের বাস্তব আদর্শের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে চরিত্র, স্বভাব ও জীবন পদ্ধতি। আর এ অবস্থাগুলো হযরত মূসার জীবনীতে অনুপস্থিত। তাছাড়া সাধারণ বিষয়াদি অর্থাৎ মানুষের নাম, বংশ, স্থানের পরিচয়, জনসংখ্যার পরিমাণ এবং আইনগত বিভিন্ন বিষয় তাওরাতের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে। এসব বিবরণ ভূগোল, বংশপরিচয় ও আইন জানার ক্ষেত্রে হয়ত কোন পর্যায়ে দরকার হতে পারে। কিন্তু বাস্তব জীবনে এর কোন কার্যকারিতা থাকার কথা নয় এবং এগুলো জীবনচরিতকে পূর্ণতা দানের যোগ্যতা থেকেও বঞ্চিত রেখেছে।

হযরত ঈসা (আ) ইসলামের সর্বাধিক নিকটতম যুগের নবী। বর্তমানে ইউরোপীয় হিসেব মোতাবেক তাঁর অনুসারীরা বিশ্বে সংখ্যাগরিষ্ট। অতএব আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন, সর্বসাধারণের কাছে এ ধর্মের নবীগণের জীবনচরিত অন্যান্য পরিচিত ধর্মসমূহের প্রবর্তক ও নবীগণের জীবনচরিতের তুলনায় সর্বাপেক্ষা কম প্রকাশিত। খ্রিষ্টীয় ইউরোপের ঐতিহাসিক বিবরণ লক্ষ্য করা যেতে পারে। তারা ব্যাবিলন, আসিরীয়া,

www.nagorikpathagar.org

আরব, সিরিয়া, মিসর, আফ্রিকা; ভারতবর্ষ ও তুর্কিস্তানের হাজার হাজার বছর পূর্বের ঘটনাপ্রবাহ প্রাচীন গ্রন্থ ও লিপিকা পাঠ করে, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, পাহাড় ও ভূগর্ভ খনন করে জনসমক্ষে উপস্থাপন করেছে এবং বিশ্ব-ইতিহাসের ছিন্নপত্রসমূহ পুনর্বার মেরামত করেছে। কিন্তু হযরত ঈসার জীবনচরিত তাদের এ অদ্ভুত পুনরুজ্জীবন ক্ষমতা কোনক্রমেই উদ্ধারে সক্ষম হয়নি। হযরত ঈসা ইঞ্জিলের বর্ণনায় ৩৩ বছর বেঁচেছিলেন। বর্তমান যুগে বিদ্যমান ইঞ্জিলসমূহের বর্ণনা প্রথম অবিশ্বাস্য ও অনির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং সেখানে শুধুমাত্র তাঁর জীবনের শেষ তিন বছরের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা তাঁর ঐতিহাসিক জীবনের শুধু এতটুকুই অবগত হতে পারি যে, তিনি জন্মগ্রহণ করেন, জন্মের পর তাঁকে মিসরে আনা হয় এবং শৈশবে দু-একটি অলৌকিক কাজ সম্পাদন করেন। পরবর্তীতে তাঁর আর সাক্ষাৎ নেই। এরপর একান্ত হঠাৎ ত্রিশ বছর বয়সে তাঁকে ধর্মপ্রচার করতে দেখা যায়। পাহাড় ও নদীর ধারে মৎস্যজীবীদের মধ্যে বক্তৃতা করে বেড়ান। তাতে শিষ্য জুটে যায়। আর ইহুদীদের সাথে কিছু বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। ইহুদীরা তাঁকে পাকড়াও করে রাজ দরবারে নিয়ে আসে। সেখানে তাঁকে রূমীয় গভর্নরের আদালতে বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হল। কিন্তু মৃত্যুর তৃতীয় দিনে কবরে তার লাশ পাওয়া যায়নি। ভাবনার বিষয় ত্রিশ বছর এবং কমপক্ষে পঁচিশ বছর তিনি কোথায় এবং কীভাবে জীবনযাপন করেছেন, এ খবর জগদ্বাসী জানে না এবং কোনদিন জানারও কথা নয়। এ শেষ তিন বছরের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেওবা কি ছিল? কিছু অলৌকিক কাজ, বক্তৃতা ও সর্বশেষে মৃত্যুদণ্ড প্রদান ইত্যাদি বিষয়।

## আদর্শিক ভিত্তির ব্যাপকতার সমন্বয়

আদর্শ জীবনচরিত হিসেবে বিবেচিত হবার জন্য তৃতীয় কোন বাস্তব আদর্শ হিসেবে প্রয়োজনীয় শর্ত হল এর ব্যাপকতা। ব্যাপকতার অর্থ হচ্ছে, বিভিন্ন মানবশ্রেণীর পথ-নির্দেশ ও আলোকবর্তিকা লাভের জন্য যেসব আদর্শের দরকার বা প্রত্যেক ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায় করার জন্য যেসব দৃষ্টান্ত প্রয়োজন, এর সম্পূর্ণই এ আদর্শ

www.nagorikpathagar.org

জীবনের ক্ষেত্রে মওজুদ থাকা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে দেখা যাবে যে, আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউই সে পূর্ণতায় পৌঁছুতে সক্ষম হননি। ধর্ম কী? আল্লাহ ও বান্দার হক এবং বান্দাদের পরস্পরের ওপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ও নির্দেশনা রয়েছে সেগুলো মেনে নেয়া ও সম্পাদন করা, অথবা এভাবেও বলা যায় যে, আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করার নামই হচ্ছে ধর্ম। এজন্য প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের কর্তব্য হল, নিজেদের নবীর ধর্মপ্রবর্তকগণের জীবন থেকে সেসব অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করে সে অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা। উভয় দিক দিয়ে আল্লাহর হক ও বান্দার হক বিস্তারিত বিষয় অনুসন্ধান করতে হলে একমাত্র ইসলামের নবী ব্যতীত আর সকল পর্যায়ে আপনাকে নিরাশায় পতিত হতে হবে। মোটকথা তাদের দিকসমূহের কোন দিক কূল-কিনারাই পাওয়া যাবে না।

ধর্ম দুই প্রকার। এক প্রকার ধর্মে আল্লাহকে অস্বীকার করা, যেমন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। তাই এ ধর্মগুলোতে আল্লাহ, তাঁর সত্তা, তাঁর গুণাবলী ও তাঁর বিভিন্ন অধিকারের কোন প্রশ্নই আসে না। এজন্য তাদের প্রবর্তকগণের মধ্যে আল্লাহপ্রেম, আন্তরিকতা, তাওহীদ ইত্যাদির অনুসন্ধান একেবারেই অর্থহীন। দ্বিতীয় প্রকার ধর্মে আল্লাহকে কোন না কোন পর্যায়ে স্বীকার করা হয়েছে। এ ধর্মগুলোর প্রবর্তক নবীগণের জীবনেও আল্লাহর আনুগত্য সম্পর্কিত ঘটনাপ্রবাহ অনুপস্থিত। আমাদের আল্লাহ্ সম্পর্কে বিশ্বাসের স্বরূপ কী হওয়া উচিত এবং তাদের বিশ্বাসের প্রকৃত স্বরূপ কী ছিল? তাছাড়া তাঁরা সে বিশ্বাসের ওপর কতটুকু সুদৃঢ় ছিলেন? তাঁদের জীবন চরিতে এ সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই! সমস্ত তাওরাত পাঠেও দেখা যাবে যে, আল্লাহর তাওহীদ ও তার নির্দেশাবলী এবং কুরবানির শর্তসমূহ ব্যতীত তাওরাতের পাঁচটি গ্রন্থে এমন একটি কথাও নেই, যা থেকে জানা যেতে পারে যে, আল্লাহর সাথে হযরত মূসার আন্তরিক সম্পর্ক, আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগী আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা ও বিশ্বাস এবং আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী ও আল্লাহর শক্তির বিকাশ তাঁর হৃদয়ে কোন পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল। অথচ মূসার ধর্ম যদি চিরস্থায়ী ও সর্বশেষ ধর্ম হিসেবে এসে থাকে,

www.nagorikpathagar.org

তখন এসব প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ লিখে রাখা তাঁর অনুসারীদেরই আবশ্যিক কর্তব্য ছিল। কিন্তু এরূপ আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল না। এজন্য তারা এসব কাজে সক্ষম হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল।

ইঞ্জিল হচ্ছে হযরত ঈসার জীবন-মুকুর। এ একটি মাত্র বিষয় 'আল্লাহ' হযরত ঈসার পিতা– ব্যতীত ইঞ্জিলে আমরা এমন আর কিছুই জানতে পারি না, যার মাধ্যমে এ পবিত্র পিতা ও পুত্রের মধ্যস্থিত সম্পর্কের ধরন চিহ্নিত করা যায়। বুঝা যায় যে, পুত্রের স্বীকারোক্তি থেকে পিতা পুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কিন্তু পুত্র পিতাকে কতটুকু ভালবাসতেন, তা অজানাই থেকে যায়। আর একথাও জানা যায় না যে, তিনি পিতার আনুগত্য ও নির্দেশ পালনে কতটুকু বাধ্যগত ও তৎপর ছিলেন, দিন-রাতে কোন সময় তাঁর সামনে নত হতেন কিনা, 'আজকের খাদ্য রুটি' ব্যতীত আর কখনো কোন বস্তু তার কাছে চেয়েছিলেন কিনা এবং যে রাতে পাকড়াও হন, তার পূর্বে কোন একটি রাতেও পিতার কাছে তিনি কোন প্রার্থনা করেছিলেন কিনা। এমতাবস্থায় আমরা এ ধরনের জীবনচরিত থেকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কি পরিমাণ লাভবান হতে পারি? যদি হযরত ঈসার জীবনে আল্লাহ্ ও বান্দার সম্পর্ক সুস্পষ্ট উল্লেখ হত, তাহলে সাড়ে তিনশো বছর পর প্রথম খ্রিষ্টান রাজাকে নিজ শহরে তিনশো খ্রিষ্টান পণ্ডিতের মজলিস গঠন করে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন হত না এবং আজও বিষয়টি একটি অজানা রহস্যে ঢাকা থাকত না। বান্দার হক সম্পর্কে এবার আলোচনায় করা যাক। তাতে দেখা যাবে, এ ক্ষেত্রেও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্যসব নবীর জীবনই প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। বুদ্ধদেব তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে ত্যাগ করে বন-জঙ্গলের পথ ধরেছেন।

এরপর তিনি তার প্রিয় স্ত্রীকে যে অত্যন্ত ভালবাসতেন, তার এবং একমাত্র পুত্রের সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখেননি এবং বন্ধুদের সাহচর্যও তিনি পরিত্যাগ করেন। আর দেশ শাসন ও প্রজা পালনের দায়-দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি লাভ করে মুক্তি লাভ করাকেই মানবজীবনের সর্বশেষ লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ জগতের মানব-সমাজে এমতাবস্থায় যেখানে

www.nagorikpathagar.org

রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, প্রভু-ভৃত্য, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন এবং বন্ধু-বান্ধব সবাই আছে– সেখানে বুদ্ধের জীবনাদর্শ মানুষের কোন কাজে আসে বলে কি কেউ ভাবতে পারে? এমন কোন ব্যাপকতা বুদ্ধের জীবনে রয়েছে, যার ফলে তা সংসারত্যাগী ভিক্ষুর সাথে সাথে সংসারবাসী গৃহীর জন্যও সমানভাবে অনুকরণযোগ্য হতে পারে? এজন্য তাঁর জীবন তাঁর ধর্মানুসারী ব্যবসায়ীদের জন্য অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনে কোন দিকই কখনো অনুসরণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। যদি এমনই হত, তাহলে চীন, জাপান, থাইল্যাণ্ড, ইন্দো-চীন, তিব্বত ও বর্মায় সকল প্রকার শিল্প, রাজনীতি এবং যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য একদিনেই বন্ধ হয়ে যেত এবং কোলাহল মুখরিত জনপদের পরিবর্তে গড়ে ওঠত বিপুল তরুশ্রেণী শোভিত নির্জন বনানী পথ-প্রান্তর ইত্যাদি। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর জীবনের একটি দিক অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং তা হল তাঁর যুদ্ধ ও সৈন্য পরিচালনা। এছাড়া তাঁর আদর্শ অনুসারীদের জন্য জাগতিক বা রাষ্ট্রীয় অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে তাঁর জীবন চরিতে কোন পথ-নির্দেশের উপস্থাপনা নেই। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর রীতিনীতি কেমন ছিল, সন্ধি ও চুক্তির দায়িত্ব তিনি কিভাবে সম্পাদন করেছেন, তিনি কোন কোন কল্যাণকর কাজে নিজের ধন-সম্পদ নিয়োগ করেছিলেন, পীড়িত, ইয়াতীম-মুসাফির ও দরিদ্রদের সাথে তাঁর আচরণ কীরূপ ছিল, এসব তথ্য অনুপস্থিত থাকার কারণে হযরত মূসার অনুসারীরা তাঁর জীবনচরিত থেকে কি কোন প্রকার ফায়দা হাসিলে সক্ষম হতে পারে? হযরত মূসার স্ত্রী ছিল, সন্তান ছিল, ভাই ছিল এবং অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনও ছিল। এক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে এটাই যে, তাঁদের সবার ক্ষেত্রে তাঁর নবীসুলভ ব্যবহার সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত ছিল। কিন্তু এসব বিষয়ে তাঁর বর্তমান জীবনী গ্রন্থগুলোতে অনুসরণযোগ্য কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

ইঞ্জিলের বর্ণনা অনুসারে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর মা ছিলেন এবং ভাই-বোনও ছিল এবং রক্ত-মাংসের পিতাও ছিল। কিন্তু তাঁর

www.nagorikpathagar.org

জীবনের ঘটনাপ্রবাহ থেকে সেসব আত্মীয়-পরিজনের সাথে তাঁর সম্পর্ক ও ব্যবহারের ধরন প্রকাশ পায় না, অথচ চিরকাল জগতে সেসব সম্পর্কের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়েছে আর ভবিষ্যতেও হবে।

অতএব ধর্মের সেসব বিরাট অংশ দায়িত্ব পালনের ওপরই নির্ভরশীল। এছাড়া হযরত ঈসা শাসিতের জীবন-যাপন করেছিলেন, তাই তাঁর জীবনচরিত, শাসকসুলভ দায়িত্ব পালনের দৃষ্টান্ত একেবারেই শূন্য। তিনি বিয়ে করেননি, তাই তাওরাতের প্রথম অধ্যায়ে যে দু'টি দম্পতির মধ্যে মাতাপিতার চেয়েও অধিক শক্তিশালী সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে, শুধুমাত্র এর মাধ্যমে হযরত ঈসার জীবন পারিবারিক দিক থেকে অনুসরণযোগ্য হতে পারে না। আর সেজন্য জগতের প্রায় সকল লোকই বিবাহিত এবং তারা সংসার জীবন-যাপন করে, এজন্য জগতের অধিকাংশ অধিবাসী হযরত ঈসার জীবন থেকে পারিবারিক জীবনের কোন পথ-নির্দেশ লাভে সক্ষম হয় না। যে কখনো ঘর-সংসার, পুত্র-পরিজন, ধন-সম্পদ, যুদ্ধ-সন্ধি ও বন্ধু-শত্রুর মধ্যকার সম্পর্কের সাথে কোন সংস্রবের মোকাবিলা করেননি, তিনি সেসব বিষয়ে সারাজগতের জন্য কীভাবে আদর্শ হতে পারেন? আজ যদি বিশ্বজগৎ তাঁর জীবনাদর্শ গ্রহণ করে তাহলে কালই সমস্ত পৃথিবীতে কবরের নির্জনতা নেমে আসবে, সমস্ত উন্নতি ও প্রগতির তৎপরতা সহসাই স্তব্ধ হয়ে যাবে আর খ্রিষ্টীয় ইউরোপ সম্ভবত এক মুহূর্তও টিকে থাকা সম্ভব হবে না। আর তখন সে আদর্শের অনুসরণের এ অবস্থা হবে এটা নিশ্চিতই চিহ্নিত করা যায়।

## জীবনে কর্মক্ষেত্রের পরিধি

জগতে আদর্শ জীবনের সর্বশেষ মানদণ্ড হল কর্মক্ষেত্র। দ্বীনের পথনির্দেশক ও ধর্মপ্রবর্তক যে শিক্ষা দান করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত ও কর্মজীবনে এ শিক্ষারই বাস্তবায়ন ও প্রতিফলনের নমুনা দেখা যাবে এবং তাঁর নিজ কর্মজীবনই তাঁর শিক্ষাকে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত করবে।

www.nagorikpathagar.org

মনোমুগ্ধকর দর্শনতত্ত্ব, চমৎকার আদর্শ ও হৃদয় বিমোহিত বাণী যে-কোন ব্যক্তি যে কোন সময় উপস্থাপন করে যেতে পারে। কিন্তু যে বস্তুটি প্রত্যেক ব্যক্তি সকল মুহূর্তে উত্থাপন করতে পারে না, তা হচ্ছে বাস্তব কাজকর্ম। মানব চরিত্রের উন্নত মান ও পূর্ণতার প্রমাণ তার উত্তম, নিষ্কলুষ কথা, চিন্তা-চেতনা এবং নৈতিক ও দার্শনিক আদর্শ নয়; বরং বাস্তব কর্মজীবনে তার পদক্ষেপ। যদি এ মানদণ্ড জগতে প্রতিষ্ঠিত করা না যায়, তাহলে ভালমন্দের পার্থক্য মুছে যাবে এবং জগতে শুধু সেসব লোকের আবাসভূমিতে পরিণত হবে, যারা শুধু ফাঁকা বুলি আওড়াতে তৎপর। এজন্য আবারো আমি জিজ্ঞেস করতে পারি কি যে, অসংখ্য নবী ও ধর্মপ্রবর্তকের মধ্যে কে নিজ কর্মজীবনকে এ তুলাদণ্ডে পরিমাপ করার জন্য উত্থাপন করতে সক্ষম হবেন?

'তোমার আল্লাহকে নিজ মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাস। তোমার দুশমনকেও ভালবাস। যে তোমার ডান গালে চড় মারে, তার দিকে নিজ বাম গালটিও ফিরিয়ে দাও। যে তোমাকে বিনা পারিশ্রমিকে এক মাইল নিয়ে যায়, তার সাথে তুমি দু' মাইল অগ্রসর হও। যে তোমার কোটটি চায় তাকে তোমার জামাটিও দিয়ে দাও। তোমার সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে দান করে দাও, তোমার ভাইকে সত্তরবার ক্ষমা কর। কেননা আসমানী বাদশাহর রাজ্যে ধনীর প্রবেশ কঠিন হবে।'

এগুলো এবং এ ধরনের আরো বহু উপদেশ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু বাস্তবে যদি এগুলোকে সত্যে পরিণত করা না হয়, তাহলে এগুলো জীবনচরিতে গণ্য হয় না, বরং এগুলো নিছক উচ্চারণে শিষ্ট কথার সমষ্টিতে পরিণত হয়। শত্রুকে যে পরাজিত করতে পারেনি সে কেমন করে ক্ষমার দৃষ্টান্ত উত্থাপন করতে পারে? যার নিজের কাছে কিছুই নেই, সে কি করে গরীব-মিসকীন ও ইয়াতিমদের দান করতে পারে? যার আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র নেই, সে কেমন করে এদের সম্পর্কে সমগ্র জগতের জন্য আদর্শ স্থাপন করবে? যে কোনদিন পীড়িতের সেবা ও দেখাশুনা করেনি, সে কি করে সে সম্পর্কে উপদেশ দান করবে? যে নিজে কখনো অন্যকে ক্ষমা করার সুযোগ হয়নি, তার জীবন আমাদের মধ্যকার বদমেজাজী ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য কি করে আদর্শে পরিণত হওয়া সম্ভব হবে?

www.nagorikpathagar.org

ভেবে দেখুন। সৎকাজ দুই প্রকারের : ইতিবাচক ও নেতিবাচক। যেমন আপনি কোন পর্বত গুহায় গিয়ে সারা জীবন সেখানে বসে থাকেন। তখন মাত্র এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলাই সঠিক হবে যে, আপনি শুধু অসৎকাজ ও অসৎবৃত্তি থেকে নিজকে রক্ষা করেছেন। অর্থাৎ আপনি এমন কোন কাজ করেননি যা আপনার জন্য দূষণীয়। কিন্তু এটি শুধু নেতিবাচক কাজ হিসেবে বিবেচ্য হয়। আপনার কাজের ইতিবাচক দিকটি কি? গরীবকে আপনি কি সাহায্য করেছেন? যালিমের ক্ষেত্রে সত্য প্রদর্শনে সচেষ্ট হয়েছেন? ক্ষমা, করুণা, দান, মেহমানদারী, সত্য বলা, সত্যের সাহায্যের জন্য আগ্রহ, প্রচেষ্টা, সাধনা, কর্তব্য সম্পাদন, দায়িত্ব পালন বা কর্মজীবনের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় নৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন না করে শুধু হাত গুটিয়ে বসে থাকলেই সেগুলো সৎকাজে পরিণত হয় না। সৎকাজে শুধু নেতিবাচক দিক নেই; বরং বহুলাংশে ইতিবাচক ও বাস্তব কাজের ওপর তা নির্ভরশীল থাকে। বন্ধুগণ! এ আলোচনা থেকে একটি কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বাস্তব কর্ম জীবন সর্বসমক্ষে প্রকাশিত না হলে কোন জীবনকে কখনো 'আদর্শ জীবন' ও অনুসরণযোগ্য আখ্যা প্রদান করা যায় না। কেননা মানুষ এ জীবনে কিসের অনুসরণ করবে? তার কোন আদর্শ আজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে? আমাদের তো যুদ্ধ-সন্ধি, দারিদ্র্য-ঐশ্বর্য, বিবাহিত-অবিবাহিত, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক, বান্দার সাথে সম্পর্ক, শাসক-শাসিত, শান্তি-বিপর্যয়, কোলাহল-নির্জনতা অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রয়োজন রয়েছে। শুধু কথায় নয়, কাজের দৃষ্টান্ত। কিন্তু একথা বলা হলে মোটেই বাগ্মিতা বা কবিত্ব করা হবে না যে, এ মানদণ্ডেও একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর অন্য কারোর জীবনচরিত টিকবে না।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমি আজ যা কিছু বলেছি, তা চিন্তা-চেতনার আলোকে পুরোপুরি বুঝে নিন। আমি একথাই বলতে চেয়েছি যে, আদর্শ জীবন হিসেবে যে মানুষের জীবনকে গ্রহণ করা হবে, এবং যে মানবচরিত্রকে অন্য মানুষের জন্য অনুসরণীয় বলে নির্বাচিত করা হবে, তার জীবনচরিতে চারটি বিষয় উপস্থিত থাকা একান্তই আবশ্যক। এ চারটি বিষয় হল, ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা, জীবনচরিতের ব্যাপকতা, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতা এবং সামঞ্জস্যশীল কর্মজীবন।

www.nagorikpathagar.org

আমি যা বলছি এর অর্থ এ নয় যে, অন্যান্য নবীগণের জীবন তাঁদের যামানায় এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল না; বরং আমার বলার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে, পরবর্তীকালে তাঁদের যে জীবনচরিত রচিত হয়েছে বা আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসেবে নয়। মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ একেবারেই সীমিত। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে ভুল করে বা ভুল পথে পরিচালিত হয়– তখন প্রয়োজন হয় সংশোধনের। হয়ত কিছু কিছু ভুল ব্যক্তি নিজেই সংশোধন করতে পারে নিজ অভিজ্ঞতায় কিন্তু এর পরিধিও সীমিত। তাই প্রয়োজন এক্ষেত্রে অপরের দিক-নির্দেশনায় বা অপরকে আদর্শ হিসেবে অনুকরণ ও অনুসরণ করা। আর এ অবস্থাও ছিল আল্লাহরই ইচ্ছাধীন। এ থেকে একথাই প্রমাণ হবে যে, সেসব নবী বিশেষ যামানা ও বিশেষ জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাই তাঁদের চরিত্র ও জীবনাদর্শ পরবর্তীকালের মানুষের জন্য সংরক্ষিত থাকার মোটেও প্রয়োজন ছিল না। মানুষের জন্য একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই কিয়ামত পর্যন্ত এবং সমগ্র জগতের অনুসরণযোগ্য ও আদর্শ স্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন। এজন্য সবদিক দিয়ে তাঁর চরিত্র ও জীবনের ঘটনাবলী পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী হিসেবে সংরক্ষিত থাকার প্রয়োজন ছিল এবং এটিই নবীগণের আগমন পরম্পরা শেষ হবার শ্রেষ্ঠতম, চূড়ান্ত ও সর্বাপেক্ষা কার্যকর প্রমাণিত উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তের উজ্জ্বল প্রতীক।

কেননা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে যুগ প্রেরিত হয়েছিলেন সে সময়ের সমাজ সম্পর্কে জানতে হলে এ কথাই বলা যায় তা ছিল অজ্ঞতার যুগ। তখন মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে ঘটেছিল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি, সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতা, সামান্য কিছু চতুর লোক মানবতা নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় মত্ত হয়েছিল। এ সমাজ সদস্যদের সংশোধন করা কোন সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রিসালাতের যেসব দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল এর মধ্যে উল্লেখযোগ দিক ছিল পরিশুদ্ধিকরণ ও সংশোধন। মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ۔

www.nagorikpathagar.org

"তিনি সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মাঝে এমন এক রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করবেন, তাদের পরিশুদ্ধি করবেন, (সেই) কিতাব এবং হিকমত (প্রজ্ঞা ও কৌশল এবং প্রজ্ঞরীতি) শিক্ষা দেবেন। ইতোপূর্বে তারা ছিল পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। (সূরা জুমআ, আয়াত : ২)

অতএব প্রাসঙ্গিক পর্যায়টি ব্যাপকার্থক। ব্যক্তির দেহ-মন, আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, সমাজ সংস্কৃতি, রীতিনীতি সব কিছুই সংশোধনকর্মের আওতাধীন। পরিশোধন ও সংশোধন আল্লাহ্‌র সুন্নাত। তিনি এমনকি নিজ নবীগণের জন্যই তা করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : আমার প্রতিপালক আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন আর তা উত্তমরূপেই তা সম্পন্ন করেছেন।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ـ

"অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার প্রভুর নির্দেশের অপেক্ষায়। আপনি মৎস সহচর (ইউনুছ)-এর ন্যায় অধৈর্য হবেন না।

(সূরা কালাম : আয়াত-৪৮)

অতএব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বের অনেক নবীর ক্ষেত্রেই দাওয়াতী দিক ছিল উপেক্ষিত। কেননা তাঁদের এসব অবস্থাও অবলম্বন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

# ৩. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতের ঐতিহাসিকতা

আমরা এ চারটি মানদণ্ডে এবার ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিতের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করব। এর সর্বপ্রথম মানদণ্ডটি হচ্ছে ঐতিহাসিক ভিত্তি। এ বিষয়ে সমগ্র বিশ্ব ঐক্যমত পোষণ করে যে, ইসলাম তার নবীর এবং একমাত্র নবীরই নয়; বরং তাঁর পবিত্র জীবনের সাথে সামান্যতম সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেকটি বস্তু ও ব্যক্তির পরিচয় ও বৃত্তান্ত এমন সুচারুভাবে সংরক্ষণ করেছে যে, আজও তা সমগ্র পৃথিবীর জন্য একটি বিস্ময়ে পরিণত হয়ে রয়েছে। যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ এবং জীবন সম্পর্কিত নানা বিষয়ের বিবরণ লেখা ও সংকলনের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, তাঁদেরকে হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী বা মুহাদ্দিস ও 'আরবাবে সিয়ার' অর্থাৎ জীবনীকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ গোষ্ঠীতে সাহাবা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, তাবে'ঈন (রহ.) এবং পরবর্তী চতুর্থ হিজরীর ব্যক্তিগণ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। সকল হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহ বিধিবদ্ধ হবার পর সেসব বর্ণনাকারীর নাম, পরিচয়, ইতিহাস, জীবনচরিত এবং আচার-আচরণও রয়েছে। আর তাঁদের সংখ্যা প্রায় এক লাখ। তাঁদের সম্পর্কে লিখা সে বৃত্তান্তের নাম 'আসমাউর রিজাল'। প্রখ্যাত জার্মান গবেষক ডক্টর স্প্রেণগার ১৮৫৪ সনে এবং এর পরবর্তীকালেও ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারিও। তাঁর সময়কালে তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সনে ওয়াসক্রীমারের সম্পদনায় মুসলিম ঐতিহাসিক ওয়াকেদীর 'মাগাযী' গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয় এবং সাহাবাচরিত সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজারের 'ইসাবা ফী আহওয়ালিস সাহাবা' মুদ্রিত হয়। ড. স্প্রেণগারের দাবি অনুযায়ী[১] তিনিই সর্বপ্রথম

---

[১]. On the origin and progress of writing down historic facts among Musalmans.

www.nagorikpathagar.org

ইউরোপিয়ান গবেষক ও লেখক যিনি মূল আরবি গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে 'লাইফ অফ মুহাম্মদ' রচনা করেছেন[২] এবং তা বিরোধিতা করেই লিখেছেন। তিনিই কলকাতায় ১৮৫৩-৬৪ সনে মুদ্রিত 'ইসাবা'র ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন :

"আজও জগতে এমন কোন জাতি দেখা যায়নি এবং নেই, যারা মুসলমানদের মত 'আসমাউর রিজালে'র বিরাট তথ্যভাণ্ডার আবিষ্কার করেছে। অতএব এর মাধ্যমেই লেখা পাঁচ লাখ লোকের বিবরণ জানা যায়।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের অন্তিম বছর বিদায় হজ্বের সময় উপস্থিত। সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ছিল প্রায় লাখের কাছাকাছি। আজ তাঁদের মধ্য থেকে এগার হাজার ব্যক্তির নাম ও পরিচয় লিখিত আকারে ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান। এগুলো এজন্য লেখা হয়েছে যে, তাঁদের প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও জীবনচরিতের কিছু না কিছু অংশ বিশেষ করে অন্যের কাছে পৌঁছিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা রেওয়ায়েত বা বর্ণনার দায়-দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করেছেন। এ কারণেই তাঁদের জীবন ঐতিহাসিক ভিত্তিতে যাচাই করার পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন এবং প্রায় ৪০ হিজরী পর্যন্ত তখনও প্রবীণ নেতৃস্থানীয় সাহাবাগণ জীবিত ছিলেন। যে সকল সাহাবা অল্পবয়স্ক ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ৬০ হিজরীতেও তাঁরা বিপুল সংখ্যায় জীবিত ছিলেন এবং এ শতক সমাপ্তির পর নবুয়তের চেরাগ থেকে সরাসরি আলোকপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি প্রদীপ প্রায় নিভে গিয়েছিল।

মোটামুটিভাবে বিভিন্ন শহরে সর্বশেষ ইন্তিকালকারী সাহাবাগণের নাম ও মৃত্যু বছর এরূপ :

| ক্রমিক | নাম | বর্ণিত হাদীস সংখ্যা | মৃত্যু সন |
|---|---|---|---|
| ১ | আবূ ইমামা বাহেলী (রা) | ৫৩৭৪ | ৮৬ হিজরী |

[২]. ১৮৫৪ সনে লিখেছেন এবং এলাহাবাদ থেকে প্রকাশ হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২ | আবদুল্লাহ্ ইবনে হারেস ইবনে জুয্আ (রা) | ২৬৬০ | ৮৬ হিজরী |
| ৩ | আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা (রা) | ২২১০ | ৮৭ হিজরী |
| ৪ | সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) | ১৬৩০ | ৯১ হিজরী |
| ৫ | আনাস ইবনে মালিক (রা) | ১৫৬০ | ৯৩ হিজরী |

এ তালিকায় সর্বশেষে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুর নাম এসেছে। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ খাদেম। তিনি দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন এবং ৯৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

প্রথম হিজরী থেকে তাবেঈন অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের ছাত্রগণের যুগ শুরু হয়। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর দর্শন থেকে বঞ্চিত ছিলেন বা তাঁদের বয়স এত সামান্যই ছিল যে, তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাণী শোনার সুযোগই তাঁদের হয়ে ওঠেনি। যেমন জন্মগ্রহণ করেন 'আবদুর রহমান ইবনে হারিস রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ৩ হিজরীতে, কয়েস ইবনে আবি হাযেম রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ৪ হিজরীতে, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব ১৪ হিজরীতে। মুসলিম বিশ্বের চারদিকে সাহাবায়ে কিরামের পর তাবেঈগণ দলে দলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনবৃত্তান্ত, হাল-অবস্থা, নির্দেশাবলী ও বিচার-ফয়সালা সম্পর্কিত বিষয়গুলোর শিক্ষাদান ও প্রচারের কাজ অব্যাহত রাখেন। তাঁদের মোট সংখ্যা কত ছিল? এর জবাবে আমি ইবনে সাআদের বরাত দিয়ে শুধুমাত্র মদীনার তাবেঈগণের সংখ্যা উল্লেখ করছি। প্রথম কাতারের তাবেঈন অর্থাৎ যাঁরা নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণকে দেখেছেন আর তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল এবং ঘটনাবলী শুনেছেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল ১৩৯ জন। দ্বিতীয় কাতারের তাবেঈন অর্থাৎ যারা মদীনায় সাধারণ সাহাবীগণকে দেখেছেন এবং তাঁর কাছে হাদীস শুনেছেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল ৮৭৩। এভাবে এসে তাবেঈগণের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫৫ জন। এ

www.nagorikpathagar.org

পরিসংখ্যান শুধুমাত্র একটি শহরেরই। অতএব তা থেকেই মক্কা তায়েফ, বসরা, কুফা, দামেশক, ইয়ামন ও মিসর প্রভৃতি এলাকার তাবেঈগণের সংখ্যা অনুমান করা যেতে পারে। তাঁরা নিজেদের শহরে সাহাবাগণের শিষ্যত্ববরণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজের প্রচার ও প্রসারই ছিল তাঁদের দৈনন্দিনের কর্মসূচী। এ সুব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা হলে দেখা যায়। প্রায় প্রত্যেক সাহাবী যা কিছু রেওয়ায়েত করেছেন, তার প্রত্যেকটি রক্ষা ও গণনা করা হয়েছে। এ ধারা মোতাবেক ধারণা করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতের অবস্থা এবং বাণীসমূহ সংগ্রহে কত উন্নত সুব্যবস্থা করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের ক্ষেত্রে নিচে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের রেওয়ায়েত পরিমাণে সর্বাধিক।

| ক্রমিক | নাম | হাদীসের সংখ্যা | মৃত্যু সন |
|---|---|---|---|
| ১ | হযরত আবূ হোরায়রা (রা) | ৫৩৭৪ | ৫৯ হিজরী |
| ২ | হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) | ২৬৬০ | ৬৮ হিজরী |
| ৩ | হযরত আয়েশা সিদ্দীকা আনহা | ২২১০ | ৫৮ হিজরী |
| ৪ | হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) | ১৬৩০ | ৭৩ হিজরী |
| ৫ | হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) | ১৫৬০ | ৭৮ হিজরী |
| ৬ | হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) | ১২৮৬ | ৯৩ হিজরী |
| ৭ | হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) | ১১৭০ | ৭৪ হিজরী |

উল্লিখিত সাহাবীগণের রেওয়ায়েতই আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতের বৃহত্তম অংশ হিসেবে চিহ্নিত ও পরিগণিত। তাঁদের মৃত্যুর 'সময়কালের' প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা যায় বোঝা যাবে যে, তাঁরা এত শেষ পর্যায়ে ইন্তিকাল করেছেন, যার কারণে তাঁদের কাছ থেকে উপকৃত হবার এবং তাঁদের রেওয়ায়েতসমূহ কণ্ঠস্থ ও লেখার মত লোকের সংখ্যা অসংখ্য ছিল। তখনকার যুগে এ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করার নামই ছিল 'ইল্‌ম' এবং তাই ছিল দীন-দুনিয়া উভয় পর্যায়ের সম্মান অর্জনের মাধ্যম। তাই অসংখ্য সাহাবী যা কিছু দেখেছিলেন ও জেনেছিলেন,



www.nagorikpathagar.org

তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ... بَلِّغُوْا عَنِّيْ 'আমার কাছে থেকে যা কিছু শোন বা দেখ তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও'...!) অথবা فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (যে আমাকে দেখেছে ও আমার কাছে থেকে শুনেছে, সে যেন তা তাঁদের কাছে পৌঁছে দেয়, যারা এ থেকে বঞ্চিত) অনুযায়ী নিজেদের সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত জনদেরকে শোনানোর ও জানানোর কাজে সদাসর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। বলা যায় এটিই ছিল তাঁদের প্রতিদিনের জীবনের অন্যতম প্রধান কাজ। তাই সাহাবীগণের পরবর্তীতে সাথে সাথেই নতুন যুবদল এসব তথ্যসমূহ সংরক্ষণের খিদমতে আঞ্জাম দেয়ার কাজে নিয়োজিত হন। তাঁদের প্রত্যেককেই প্রতিটি ঘটনার কথা হুবহু স্মরণ রাখার জন্য মুখস্থ করতে হত এবং সেগুলো বারবার আওড়াতে হত। প্রতিটি বাক্য এবং প্রতিটি শব্দ সংরক্ষণ করতে হত। কেননা যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কথা এবং কাজের প্রচারের ওপর জোর দিয়েছেন, সেখানে এ ভীতিও প্রদর্শন করেছেন যে, 'যে আমার সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত কোন ভুল বা মিথ্যা বলবে, তার স্থান হবে জাহান্নামে।' এ সতর্কতার কারণে নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণও কোন হাদীস বর্ণনা করার সময় অত্যন্ত সচেতন এবং ভয়ে কম্পিত হতেন। একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন একটি কথা উল্লেখ করেন। তখন তাঁর চোহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভয়ে তিনি কেঁপে ওঠে এরপর বলেন : 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই বলেলেন বা প্রায় অনুরূপ এ ধরনের কথাই।'

পৃথিবীর ইতিহাসে স্বভাবতই আরবদের স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর হিসেবে গণ্য। তাঁরা একাধিক্রমে শত শত কবিতা আওড়াতে পারতেন। তাছাড়া প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে এটাই যে, মানুষ যে শক্তিকে যত বেশি কাজে ব্যবহার করে, সেটি তত বেশি উন্নতি ও প্রসার লাভ করে। তাই বলা যায় সাহাবী এবং তাবে'ঈগণ স্মৃতিশক্তিকে উন্নতির শেষ শিখরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা এমনভাবে এক একটি হাদীস ও এক একটি ঘটনাকে মুখে মুখে শুনে

www.nagorikpathagar.org

স্মরণ করে রেখেছেন, যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্তমানে মুসলমানরা যেভাবে কুরআন মুখস্থ করেন। মুখে মুখে শুনে এক একজন মুহাদ্দিস কয়েক হাজার এবং কয়েক লাখ হাদীস মুখস্থ করেছেন এবং স্মরণ রেখেছেন, এরপরও স্থায়ীভাবে মনে রাখার জন্য পরে লিখে রেখেছেন। কিন্তু যতক্ষণ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে তাঁরা মুখে মুখে আওড়াতে সক্ষম না হতেন, ততক্ষণ বিজ্ঞ সমাজে নির্ভরযোগ্য বিবেচনা হতেন না তাঁরা। এ জন্যই তাঁরা নিজেদের লিখা নোটগুলোকে নিন্দনীয় বিষয়ের মত গোপন করে রেখেছেন, যেন কেউ তাঁদের স্মরণশক্তিকে দুর্বল বলে ভাবতে না পারে।

প্রিয় বন্ধুগণ! কিছু প্রাচ্যবিদ (মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির লক্ষ্যে) পণ্ডিত ও শিক্ষিত মিশনারী– যাদের মধ্যে উইলিয়াম মূর ও গোলডজার সবেচেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসগুলোর সংগ্রহ ও লিখে রাখার কাজ তার ইন্তিকালের ৯০ বছর পর শুরু হয়েছে বলে ইতিহাস এগুলোর ত্রুটিহীনতা ও প্রামাণ্যতায় সন্দেহ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

এজন্য আমি এ সম্পর্কে আপনাদের সামনে বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করব এবং সাহাবায়ে কিরাম কীভাবে বিভিন্ন ঘটনা স্মরণ রেখেছেন, কী পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, কীভাবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাজে এ আমানত সোপর্দ করেছেন এর সবই বলব। আপনারা এ বর্ণনা থেকে নিজেরাই ধারণা করতে পারবেন, এ রেওয়ায়েতসমূহ অনেক পরে সংগৃহীত ও লিখা হলেও এগুলোর ত্রুটিহীনতা ও প্রামাণ্যতার ক্ষেত্রে কোনরূপ সন্দেহ করা যেতে পারে না।

সাহাবীগণ সাধারণভাবে তিনটি কারণে হাদীস লিখে রাখা সঙ্গত মনে করেননি।

১. প্রাথমিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখে রাখতে নিষেধ করে বলেছেন, 'আমার কাছে থেকে কুরআন ব্যতীত আর কিছুই লিখবে না'।

www.nagorikpathagar.org

لَا تَكْتُبُوا عَنِّيْ غَيْرَ الْقُرْاٰنَ۔

এর প্রকৃত কারণ এটাই ছিল যে, সাধারণ লোদের কাছে কুরআন ও অকুরআন মিশে যাবার অত্যাধিক আশঙ্কা। কাজেই কুরআন যখন মুসলমানদের কাছে পুরোপুরি সংরক্ষিত হয়ে যায়, তখন শেষ দিকে তিনি নিজেই কোন কোন সাহাবীকে হাদীস লিখে রাখার অনুমতি প্রদান করেন। এরপরও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অধিকাংশ সাহাবা এগুলো লিখে রাখার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে সতর্ক ছিলেন।

২. তারা আশঙ্কা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ লেখার পর জনগণ আর সেগুলোর প্রতি তেমন আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা অবলম্বন করবে না এবং লিখা সংকলনের সেগুলো মুখস্থ করার ও স্মরণ রাখার জন্য পরিশ্রমে উদ্যোগী হবে না। শেষ পর্যন্ত এ আশঙ্কা নির্ভুল প্রমাণিত হয়। যতই বইয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে ক্রমান্বয়ে বক্ষ-সংরক্ষিত জ্ঞান ততই হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে তাঁদের ধারণা এটাও ছিল যে, যোগ্য-অযোগ্য সংকলন হাতে নিয়ে জ্ঞানী হবার দাবি করবে। এটাও সত্যে প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তীকালে ।

৩. আর তৃতীয় কারণ ছিল এটাই যে, তখন পর্যন্ত আরবে কোন বিষয় লিখে নিয়ে এরপর মুখস্থ করাকে দোষণীয় কাজ বলে গণ্য করা হত। ওপরোল্লিখিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে লোকেরা এ কাজকে তাদের দুর্বল স্মরণশক্তির ঘোষণা মনে করেছে। যদিও কোন কথা লিখে রাখা হলেও তারা তা লুকাতে বাধ্য হত! মুহাদ্দিসগণ মনে করতেন, লিখে মনে রাখার চেয়ে মুখস্থ করা অধিক পরিমাণে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা। লিখা স্মারককে অন্যের হস্তক্ষেপ থেকে সংরক্ষণ করা অসম্ভব। কেননা কেউ এর মধ্যে কোন প্রকার যোগ-বিয়োগ করতে পারে, এ আশঙ্কা সব সময়ই থাকে। কিন্তু যে কথা অন্তরে অন্তস্থলে অঙ্কিত হয়ে যায়, এর মধ্যে কোন রদবদল অসম্ভব।

প্রথমবার আপনাদের আজ মজলিসে এবং সর্বপ্রথম আপনাদেরই মজলিসে একথা উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, শত বছর অথবা নব্বই বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কার্যাবলীকে মৌখিক

www.nagorikpathagar.org

বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল এ তথ্য সম্পূর্ণভাবেই ভুল। আর এ ভুলের আসল কারণ হচ্ছে এটাই যে, ইমাম মালিক (র)-এর মুয়াত্তাকে হাদীসগ্রন্থ প্রথম এবং ইবনে ইসহাকের 'আল-মাগাযী' কে যুদ্ধবিগ্রহ ও নবীচরিত সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ হিসেবে মনে করা হয়। এ দু'জন সমসাময়িক ছিলেন। তাঁরা যথাক্রমে ১৫১ ও ১৭৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। এজন্য হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধেই হাদীস এবং জীবনচরিত সংকলনের সূচনা যুগ মনে করা হয়। ১০১ হিজরীতে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) ইন্তিকাল করেন। তিনি নিজেও ছিলেন একজন বড় আলেম ও মদীনার গভর্নর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৯৯ হিজরীতে খিলাফত লাভ করেন। এরপরই তিনি মদীনা মুনাওয়ারার কাজী ও হাদীসশাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযমকে এ প্রসঙ্গে নির্দেশ প্রদান করেন : 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও হাদীস সংকলন এবং লিখার কাজে উদ্যোগী হতে। কেননা আমার অত্যন্ত আশঙ্কা হচ্ছে যে, 'ইল্‌ম ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।' এ ঘটনাটি 'তা'লীমাতে বুখারী' 'মুয়াত্তা' এবং 'মুসনাদে দারামী' ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। খলীফার এ নির্দেশটি যথাযতভাবে প্রতিপালিত হয় এবং রাসূলুললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও সুন্নাতসমূহ লিখে রাজধানীতে প্রেরণ করা হয়। (তথ্য : 'মুখতাসার জামে-বায়ানুল ইল্‌ম লি-ইবনে আবদুলবার,' ৩৮ পৃষ্ঠা মিসরে মুদ্রিত) এ মহিমান্বিত কাজের জন্য আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযমকে নির্বাচন করার কারণ হচ্ছে এটাই যে, তিনি নিজে ইমাম এবং মদীনার কাজী ছিলেন। কিন্তু তা ছাড়াও এ নির্বাচনের উপযুক্ততর কারণ ছিল এটাই যে, তাঁর খালা হযরত আম্মারা (রা) হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহার প্রধানতম শিষ্য ছিলেন। হযরত আয়েশা (র)-র কাছে থেকে তিনি যে সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছিলেন, তা সমস্তই আবূ বকর ইবনে হাযমের কাছে পূর্ব থেকেই সংগৃহীত ছিল। তাই হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) তাঁকে বিশেষ করে হযরত আম্মারা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুর রেওয়ায়েতগুলো লিখার জন্য নির্দেশ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

# রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে লেখা হাদীসসমূহ

আরও অগ্রসর হয়ে আমি দাবি করছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই হাদীস ও সুন্নাত এবং তাঁর নির্দেশাবলী ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সংগ্রহের কাজের সূচনা হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি যে ভাষণ দেন তা বুখারীতে উল্লেখ আছে যে, আবূ শাহ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু নামের এক ইয়ামনী সাহাবীর আবেদনে তিনি ভাষণটি লিখে তাঁকে সোপর্দ করার নির্দেশ প্রদান করেন। (বাবু কিতাবাতিল ইল্‌ম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন দেশের শাসকবর্গের নামে যেসব পত্র প্রেরণ করেন, তা ছিল লিখিত আকারে। মিসরের বাদশাহ মুকাওকাসের নামে তিনি পত্র প্রেরণ করেন, দশ বার বছর পূর্বে মিসরের একটি ঈসায়ী গির্জায় সংরক্ষিত একটি পুরাতন কিতাবের মলাটের সাথে তা পাওয়া যায়। এতে অনুমান করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পত্রটি লিখিয়েছিলেন এটা সে মূল পত্র। এর আলোকচিত্র বর্তমানে অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। এটি লিখিত ছিল প্রাচীন আরবি বর্ণমালায় এবং হাদীসগ্রন্থসমূহে যেসব শব্দ সহকারে এ পত্রটি উল্লেখ হয়েছে, এ পত্রের মোহরে নামের অক্ষর ও শব্দগুলো হুবহু সেরূপই দেখা যায়। এতে তা ইসলামী রেওয়ায়েতের নির্ভুলতার জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ছাড়া কারোর আমার চেয়ে বেশি সংখ্যক হাদীস স্মরণ নেই। আমার চেয়ে তাঁর কাছে অধিক পরিমাণ হাদীস সংরক্ষিত থাকার কারণ হচ্ছে এটাই যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা শুনেছেন সবই লিখে রেখেছেন। কিন্তু আমি লিখে রাখিনি।' (বুখারী, বাবু-কিতাবাতিল ইল্‌ম)

আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলে উল্লেখ রয়েছে যে, অনেক সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুকে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো রাগান্বিত অবস্থায় আবার কখনও প্রফুল্ল অবস্থায় থাকেন, অথচ তুমি সকল অবস্থায়ই

www.nagorikpathagar.org

সবকিছু লিখে রেখেছ। এ কথার পর আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু লিখা বন্ধ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মুখের দিকে ইশারা করে বললেন, 'তুমি লিখতে থাক, এ স্থান থেকে অর্থাৎ মুখ থেকে যা বের হয় তা সত্য হয়ে থাকে।' (আবূ দাউদ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা)

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু তাঁর এ সংকলনের নাম রাখেন 'সাদেকা'। (ইবনে সা'আদ, দ্বিতীয় খণ্ড : ২য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১২৫)

তিনি বলতেন : আমি 'মাত্র দুটি জিনিসের জন্য জীবিত থাকার আকাঙ্ক্ষা করেছি। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এটাই 'সাদেকা'। আব সাদেকা এমন একটি কিতাব যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে শুনে শুনে আমি লিখে রেখেছি। (দারামী : ৬৯ পৃষ্ঠা)

মুজাহিদ বলেন : আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুর কাছে কিতাব সংরক্ষিত দেখেছি। তখন জিজ্ঞেস করেছি, এটি কি কিতাব? তিনি বললেন, সাদেকা। এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে শুনে শুনে আমি লিখেছি। এ কিতাবে আমার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝখানে ছিল না। (ইবনে সা'আদ : ২-২-১২৫)

বুখারীতে উল্লেখ আছে যে, মদীনায় হিযরতের কিছুকাল পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের আদমশুমারি করে তাদের নামের তালিকা প্রণয়ন করেন। এ তালিকায় ছিল এক হাজার পাঁচশত নাম। (বাবুল জিহাদ)

বর্তমান বুখারীর দুপৃষ্ঠা ব্যাপী যাকাত সম্পর্কিত যেসব নির্দেশ, বিভিন্ন বস্তুর ওপর দেয়া যাকাত এবং এর হার সম্পর্কে যে আলোচনা আছে, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই লিখা আকারে দায়িত্বশীল কর্মচারীদের কাছে প্রেরণ করেন। হযরত আবূ বকর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-এর কাছে আবূ বকর ইবনে অমর ইবনে হাযমের খান্দানে এবং আরও কিছু সংখ্যক লোকের কাছেও এ নির্দেশিকা সংরক্ষিত ছিল।

(দারে-কুত্নী, কিতাবুয যাকাত : ২০১ পৃষ্ঠা)

www.nagorikpathagar.org

যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম থেকে এ সম্পর্কিত আবশ্যকীয় নির্দেশাবলীও লিখা ছিল। (দারে-কুত্‌নী : ২০৪ পৃষ্ঠা)

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সম্বলিত একখানা পুস্তিকা ছিল। এটাকে তিনি তাঁর তলোয়ারের খাপে রেখে হিফাযত করতেন। এর মধ্যে কিছু হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিকা লিখিত ছিল। কিছু সংখ্যক লোক এটা দেখার ইচ্ছা পোষণ করায় তিনি তলোয়ারের খাপ থেকে তা বের করে সকলকে দেখান। (বুখারী, দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ১০৮৪, ১০৩০)

হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের মাঝে যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়, তা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু লিখেছিলেন। এর এক কপি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাছে রেখেছিলেন। (ইবনে সাআদ, মাগাযী ৭১ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনে হাযম রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুকে ইয়ামনের গবর্নর নিযুক্ত করে পাঠাবার সময় একটি লিখিত নির্দেশিকা তাঁকে দিয়েছিলেন। তাতে ফরযসমূহ, সাদকা, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি নানা বিষয় সম্পর্কে অনেক নির্দেশনা ছিল।

(কানযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে পত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে হাকীম রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুর কাছে পৌঁছে ছিল, এতে মৃতপ্রাণী সম্পর্কে লেখা হিদায়াত ছিল। (মু'জামে সাগীর, তাবারানী, ২১৭)

ওয়ায়েল ইবনে হাজার রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে বিদায় নিয়ে স্বদেশ হাদারামাউত রওয়ানা করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিশেষভাবে একটি নির্দেশিকা প্রেরণ করেন। তাতে নামায, রোযা, সুদ, শরাব ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর নির্দেশ ছিল।

(তাবারানী, সাগীর, ২৪২ পৃষ্ঠা)

www.nagorikpathagar.org

কোন এক সময় হযরত ওমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু এক জনসমাবেশে জিজ্ঞেস করেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীর 'দীয়াত' (ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য অর্থ-সম্পদ) থেকে স্ত্রীকে কী পরিমাণ দান করেছেন তা কি কারোর জানা আছে কি? তখন দিহাক ইবনে সুফিয়ান দাঁড়িয়ে বললেন : 'আমি জানি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এটি লিখিয়ে পাঠিয়েছিলেন।'

(দারে কুতনী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৮৫ পৃষ্ঠা)

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র) তাঁর খিলাফতকালে (৯৯ হিজরী–১০১ হিজরী) সদকা বিষয়ক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান অনুসন্ধান করার জন্য মদীনাবাসীদের কাছে দূত পাঠালে আমর ইবনে হাযমের বংশীয় লোকদের কাছে তা পাওয়া যায়।

(দারে-কুতনী, ৪৫ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামনবাসীদের কাছে যে লিখিত নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছিল যে, শুধুমাত্র পাক-পবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করবে, গোলাম কেনার পূর্বে তাকে আযাদ করা যেতে পারে না এবং বিবাহের পূর্বে তালাক দেয়া যায় না। (দারামী, ২০৩ পৃষ্ঠা)

হযরত মুআয রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু সম্ভবত ইয়ামন থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে লেখা পত্র মারফত শাক-সব্জির যাকাত আছে কিনা জানতে চান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখা আকারেই জবাব দেন; 'শাক-সব্জির যাকাত নেই।'

(দারে-কুতনী, ৪৫ পৃষ্ঠা)

মারওয়ান খুতবায় বর্ণনা করেন যে মক্কা হারেমের মধ্যে অন্তর্গত। তখন রাফে ইবনে খাদীজ সাহাবি রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু চিৎকার করে বলেন : 'এবং মদীনাও হারেমের। বিষয়টি আমার কাছে লিখিত আকারে বিদ্যমান আছে। তুমি যদি ইচ্ছা কর আমি তা পড়ে শোনাব।'

(মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)

www.nagorikpathagar.org

দিহাক ইবনে কায়েস নোমান ইবনে বশীর সাহাবীকে লিখেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর নামাযে সূরা জুমআ ছাড়া আর কোন সূরা পড়তেন? তিনি জবাবে লিখেন : وَهَلْ اَتَاكَ পড়তেন। (মুসলিম, ৩২৩)

হযরত ওমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু উত্‌বা ইবনে ফারকাদকে পত্রে লিখেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশম পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব নির্দেশ বিভিন্ন লোককে লিখিয়ে দেন বা তাদের কাছে পাঠান। আমাদের কাছে এমন সব দলীল-প্রমাণ রয়েছে, যা থেকে প্রমাণ হয় যে, নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ও সুন্নাতসমূহকে পুস্তকাকারে সংকলন করেন বা সংকলন করার চেষ্টা করেন। হযরত আবূ বকর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু তাঁর খিলাফতকালে হাদীসের একটি সংকলন প্রস্তুত করান, এরপর তা পছন্দ না হওয়ায় নষ্ট করে দেন। (তথ্য : তাযকিরাতুল হুক্কাম) হযরত ওমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু এ বিষয়টির তাঁর খিলাফতকালে প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিবেচনা করে এ ব্যাপারে নানা চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। এরপর তিনি আর অগ্রসর হতে সাহস করেননি। এই মাত্র আপনারা শুনেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু নিজে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে একটি পুস্তক রচনা করেন। তাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ লেখা ছিল। অনেকেই এ পুস্তকটি দেখতে আসে এবং তিনি তা লোকদেরকে দেখাতেন। (তিরমিযী, ৫৮৬ পৃষ্ঠা)

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুর ফতওয়াসমূহের অধিকাংশই লিখিত আকারে হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু -এর খিদমতে হাযির করা হয়। (তথ্য : মুসলিম ভূমিকা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রেওয়ায়েতসমূহের বিভিন্ন লিখিত সংকলন ছিল। কিছু তায়েফবাসী তাঁর এমনি একটি সংকলন তাঁকে পড়ে শুনাবার জন্য হাজির করেন। (কিতাবুল ইলাল, তিরিমিযী, ৬৯১ পৃষ্ঠা)

www.nagorikpathagar.org

সাঈদ ইবনে জুবাইর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু তাঁর রেওয়ায়েতসমূহ লিখে রেখেছেন। (দারামী, ৬৯ পৃষ্ঠা)

'আবদুল্লাহ্ বিন আমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-এর পুস্তক 'সাদেকা' তাঁর প্রপুত্র আমর ইবনে শোআইবের কাছে সংরক্ষিত ছিল এবং তিনি তাঁর দাদার কিতাব দেখে রেওয়ায়েত করতেন বলে তাঁকে দুর্বল ভাবা হত। তিনি নিজে হাফেজ ছিলেন না। (তাহযীব, ৮-৪৯)

ওহাব তাবেঈ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুর রেওয়ায়েতসমূহ সংকলন করেন। এটি ইসমাঈল ইবনে আবদুল করীমের কাছে রক্ষিত ছিল এবং তাকে এজন্য দুর্বল মনে করা হত।

(তাহযীব, ১ম খণ্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুর রেওয়ায়েতসমূহের দ্বিতীয় সংকলন প্রণয়ন করেন সুলায়মান ইবনে কায়েস ইয়াশকারী এবং হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ও তাবেঈগণের অন্তর্ভুক্ত আবুয যুবাইর। আবূ সুফিয়ান ও শা'বী হযরত জাবের রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-এর পুস্তকটি তাঁর নিজ মুখেই শোনেছেন। (তাহযীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২১১ পৃষ্ঠা)

সুমরা ইবনে জুনদুব রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-এর কাছে থেকে তাঁর পুত্র সুলায়মান একটি হাদীস পুস্তক রেওয়ায়েত করেন এবং তাঁর কাছে থেকে রেওয়ায়েত করেন তাঁর পুত্র হাবীব। (তাহযীবুত তাহযীব, ৪-১৯৮)

হযরত আবু হোরায়রা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-যাঁর চেয়ে বেশি সংখ্যক হাদীস সাহাবীগণের মধ্যে আর কেউ মুখস্থ করেননি– তাঁর কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েত হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ সংকলন করেন। হাদীস শাস্ত্রে 'সহীফায়ে হাম্মাম' নামে পরিচিত এ সংকলনটি বিপুল সুখ্যাতি অর্জন করেছে। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে ৩১২ থেকে ৩১৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তা উদ্ধৃত করেছেন। বশীর ইবনে তাহীক হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-এর কাছে তাঁর রেওয়ায়েতসমূহ শুনে সংকলন করেন। এরপর তা অন্যের কাছে শুনাবার জন্য তাঁর অনুমতি চান। (কিতাবুল ইলাল, তিরমিযী, ৬৯১ পৃষ্ঠা ও দারামী, ৬৮ পৃষ্ঠা)

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু একবার এক ব্যক্তিকে তাঁর ঘরে আহবান করে বিভিন্ন হাদীস দেখানোর পর বলেন, আমি এসব লিখিত হাদীসগুলো রেওয়ায়েত করেছি। বর্ণনাকারী বলেন যে, সেগুলো তাঁর হাতের নয় বরং অন্যের হাতে লিখা ছিল।

(ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, ১৮৪-১৮৫ পৃষ্ঠা)

বেশি হাদীস বর্ণনাকারীগণের মধ্যে হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুও অন্যতম। তিনি নিজ পুত্রদের বলতেন, 'হে আমার সন্তানগণ! ইল্‌মকে লিখিত আকারে সংরক্ষণ কর।' (দারামী, ৬৮ পৃষ্ঠা)

তাঁর ছাত্র আব্বান তাঁর সামনে বসে তাঁর রেওয়ায়েতসমূহ লিখেন।

(দারামী, ৬৮)

সালমা নামে এক মহিলা বলেন যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম আবু রাফে রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু -এর কাছে থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যাবলী লিখতে দেখেছেন।

(ইবনে সা'আদ ২য় খণ্ড, ২য় অধ্যায়, ১২৩ পৃষ্ঠা)

ওয়াকেদী প্রথম যুগের নবীচরিত রচয়িতাগণের মধ্য থেকে একজনের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আম্মান প্রধান মানযার ইবনে শাবীর নামে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পত্র পাঠান, তা তিনি ইবনে আব্বাসের কিতাবের সাথে দেখেছেন। (যাদুল মা'আদ, ২-৫৭)

ইবনে যুবাইর বদর যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা লিখে খলীফা আবদুল মালিকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। (তাবারী, ১২২৫)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ খাদেম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তাঁর ছিল অবাধ যাতায়াত। তাঁর অভিযোগ ছিল : লোকেরা আমার কাছে এসে শুনে যায়– এরপর তা লিখে রাখে, অথচ আমি কুরআন ব্যতীত অন্য কোন জিনিস লেখা জায়েয মনে করি না। (দারামী, ৬৭)

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু একবার এক ব্যক্তিকে তাঁর ঘরে আহবান করে বিভিন্ন হাদীস দেখানোর পর বলেন, আমি এসব লিখিত হাদীসগুলো রেওয়ায়েত করেছি। বর্ণনাকারী বলেন যে, সেগুলো তাঁর হাতের নয় বরং অন্যের হাতে লিখা ছিল।

(ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, ১৮৪-১৮৫ পৃষ্ঠা)

বেশি হাদীস বর্ণনাকারীগণের মধ্যে হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুও অন্যতম। তিনি নিজ পুত্রদের বলতেন, 'হে আমার সন্তানগণ! ইল্‌মকে লিখিত আকারে সংরক্ষণ কর।' (দারামী, ৬৮ পৃষ্ঠা)

তাঁর ছাত্র আব্বান তাঁর সামনে বসে তাঁর রেওয়ায়েতসমূহ লিখেন।

(দারামী, ৬৮)

সালমা নামে এক মহিলা বলেন যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম আবু রাফে রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু -এর কাছে থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যাবলী লিখতে দেখেছেন।

(ইবনে সা'আদ ২য় খণ্ড, ২য় অধ্যায়, ১২৩ পৃষ্ঠা)

ওয়াকেদী প্রথম যুগের নবীচরিত রচয়িতাগণের মধ্য থেকে একজনের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আম্মান প্রধান মানযার ইবনে শাবীর নামে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পত্র পাঠান, তা তিনি ইবনে আব্বাসের কিতাবের সাথে দেখেছেন। (যাদুল মা'আদ, ২-৫৭)

ইবনে যুবাইর বদর যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা লিখে খলীফা আবদুল মালিকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। (তাবারী, ১২২৫)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ খাদেম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তাঁর ছিল অবাধ যাতায়াত। তাঁর অভিযোগ ছিল : লোকেরা আমার কাছে এসে শুনে যায়– এরপর তা লিখে রাখে, অথচ আমি কুরআন ব্যতীত অন্য কোন জিনিস লেখা জায়েয মনে করি না। (দারামী, ৬৭)

www.nagorikpathagar.org

সা'ঈদ ইবনে জুবাইর তাবে'ঈ বলেন : আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে রাতে রেওয়ায়েত শুনে মোটা চাদরের গায়ে তা লিখে রাখি। সকালে আবার তা পরিষ্কার করে লিখেছি। (দারামী, ৬৯ পৃষ্ঠা)

হযরত বারাআ ইবনে আযেব রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-এর কাছে বসে লোকেরা তাঁর রেওয়ায়েতসমূহ লিখতেন। (দারামী, ২৯ পৃষ্ঠা)

নাফে ৩০ বছর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-এর খিদমত নিয়োজিত ছিলেন। তিনি নিজের উপস্থিতিতে লোকদেরকে লিখাতেন। (দারামী, ৬৯ পৃষ্ঠা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুর পুত্র আবদুর রহমান একটি পুস্তক বের করে কসম করে বলেন, এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ নিজ হাতে লিখেছেন। (জামে, ১৭ পৃষ্ঠা)

সা'ঈদ ইবনে জুবাইর বলেছেন : যখন কোন বিষয়ে আমাদের মতভেদ হত, আমরা সেগুলো লিখতাম, এরপর তা লুকিয়ে রেখে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুর কাছে উপস্থিত হতাম এবং তাঁকে সেসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম। যদি তিনি আমাদের লিখিত বিষয় সম্পর্কে জানতে পারতেন তাহলে তাঁর ও আমাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যেত। (জামে, ৩৩ পৃষ্ঠা)

আস'ওয়াদ সাবে'ঈ বলেন : আমি ও আলকামা একটি পুস্তিকা সহীফা পেলাম। তা নিয়ে আমরা ইবনে ওমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-এর কাছে এসেছি। তিনি তা নষ্ট করে দেন। (জামে, ৩৩ পৃষ্ঠা)

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ছিলেন কাতিবে ওহী বা ওহী লেখক। তিনিও রেওয়ায়েত লিখে রাখায় সম্মত ছিলেন না। তাই মারওয়ান একটা কৌশল অবলম্বন করে একজন লেখককে পর্দার পেছনে বসিয়ে রাখেন তিনি যায়েদ ইবনে সাবেতের বর্ণনা তাঁর অজ্ঞাতে লিখে ফেলেন। (জামে, ৩৩ পৃষ্ঠা)

হযরত মু'আবিয়া রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ও অনুরূপ কৌশলে তাঁর একটি হাদীস লিখে রাখেন। কিন্তু তিনি তা অনুমান করতে পেরে জোরপূর্বক এ লেখা নষ্ট করে দেন। (আহমদ, ৫-১৮২ পৃষ্ঠা)

www.nagorikpathagar.org

এসব বিষয় শত শত তাবে'ঈ লিখে রেখেছেন। এর মাঝে ইমাম যুহরীও একজন। শুধু তাঁর নিজের রচনাবলীর এত বিরাট স্তূপ গড়ে ওঠে যে, ওলীদ ইবনে ইয়াজীদের হত্যার পর যুহরীর এ রচনাবলী কয়েকটি পশুর পিঠে চাপিয়ে কোষাগার থেকে বাইরে নিয়ে আসা হয়েছিল। ৫০ হিজরীতে ইমাম যুহরী জন্ম এবং ইন্তিকাল ১২৪ হিজরীতে। তিনি কুরাইশ বংশীয় ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও জীবনচরিত সংগ্রহে যে শ্রম ও সাধনা করেছেন তা অনুমান করার জন্য ঐতিহাসিকগণের এ একটি বর্ণনাই যথেষ্ট যে, তিনি মদীনা মুনাওয়ারার প্রত্যেকটি আনসারের কাছে গিয়েছেন। যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ এমনকি পর্দানশীন মহিলাগণের কাছে গিয়েও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও জীবনের ঘটনাবলী জিজ্ঞেস করে লিখেছেন। (তাহযীর, তরজমায়ে যুহরী)

তখন অসংখ্য সাহাবী জীবিত ছিলেন। যুহরীর ছাত্রদের সংখ্যা সংখ্যাতীত। তাঁরা রাতদিন সবাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজকর্ম ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সংগ্রহ ও বিন্যস্তকরণ, লেখা শিক্ষাদান, অধ্যাপনা, প্রচার এবং প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত থেকেছেন। এটিই তাঁদের জীবনের একমাত্র কাজ ছিল। এজন্য পার্থিব অন্য সব কাজের সাথে তাঁরা সম্পর্ক ত্যাগ করে রেখেছিলেন।

বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রধান কারণ হচ্ছে এটাই যে, সাধারণ লোকেরা মনে করে হাদীস ও নবীচরিত সংকলন ও রচনার কাজ তাবে'ঈগণই শুরু করেছেন। আর তাবে'ঈ তাঁদেরকে বলা হয়, যাঁরা সাহাবীগণকে দেখেছেন এবং তাঁদের কাছে শিক্ষালাভ করেছেন। তাছাড়া প্রায় একশ বছর পর্যন্ত ছিল সাহাবীগণের সময়কাল। অর্থাৎ তাবে'ঈগণের যামানা যেমন শুরু হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একশ বছর পর এবং অনুরূপ হাদীস ও নবীচরিত সংকলন ও প্রণয়নের কাজও যেন একশ বছর পরই শুরু হয়েছে। অথচ পুরোপুরিই এ ধারণা ভুল। কেননা তাবে'ঈ তাঁদেরকে বলা হয়, যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেননি, কিন্তু সাহাবীগণকে দেখেছেন এবং তাঁদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও অবস্থান

www.nagorikpathagar.org

করতে পারেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি বা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার শেষের দিকে তাঁদের জন্ম হয়েছে, তাই তাঁর কাছে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি বা তাঁর ইন্তিকালের পর জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা সবাই তাবে'ঈগণের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে যদি বিচার করা হয় দেখা যাবে যে, তাবে'ঈগণের যুগ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই কমপক্ষে ১১ হিজরী থেকে শুরু হয়েছে। সুতরাং যে কাজ ১১ হিজরী থেকে শুরু হয়েছে, সে সম্পর্কে এ কথা কী করে বলা যেতে পারে যে, তাবে'ঈগণ এ কাজ শুরু করেছেন। তাবে'ঈগণের কার্যারম্ভের জন্য প্রত্যেকটি সাহাবীর পৃথিবী থেকে বিদায় অপরিহার্য নয় এবং শত বছর অতিক্রান্ত হবারও কোন প্রয়োজন নেই। শত বছর পর তাবে'ঈগণের যুগও তো শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে এবং এরপর তাবে'ঈ হবার সৌভাগ্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কেননা তখন সাহাবীগণের যুগ শেষ হয়েছে এবং সাহাবীগণকে দেখার ফলে লোকেরা তাবে'ঈদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মোটকথা আমার এ বিস্তারিত আলোচনা থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, হাদীস ও নবীচরিত সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ একশ বছর পর মুসলমানদের মাঝে শুরু হয়েছে–এ কথা বলা একটি বিরাট অজ্ঞতার পরিচায়ক।

মূলত মুসলমানদের মধ্যে সুন্নাত ও জীবনচরিত সংগ্রহ এবং তথ্য সংকলন ও লেখার কাজ তিন পর্যায়ে অগ্রসর হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রথম পর্যায়ে শুধু ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রত্যেক শহরে সংগৃহীত তথ্যাবলী একত্রিত করা হয়েছে এবং তৃতীয় পর্যায়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে সংগৃহীত তথ্যাবলী একত্রিত করে সেগুলোই বর্তমানে পুস্তকাকারে আমাদের কাছে রয়েছে। সম্ভবত প্রথম পর্যায়ের যুগটি একশ হিজরী পর্যন্ত এবং তৃতীয় পর্যায়ের যুগটি ১৫০ হিজরী থেকে তৃতীয় শতকের পরও কিছুকাল বর্তমান ছিল। প্রথম যুগটি ছিল সাহাবা ও নেতৃস্থানীয় তাবে'ঈগণের। দ্বিতীয় যুগটি ছিল তাবয়ে-তাবে'ঈগণের এবং তৃতীয় যুগটি ছিল ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) প্রমুখ ব্যক্তিগণের। প্রথম যুগের সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব দ্বিতীয় যুগের কিতাবগুলোতে স্থান লাভ করেছে এবং দ্বিতীয়

www.nagorikpathagar.org

যুগের কিতাবগুলোর যাবতীয় বিষয়বস্তু তৃতীয় যুগের কিতাবসমূহে লিখা হয়েছে। তাছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের সমস্ত গ্রন্থ সম্পদ আজ হাজার হাজার পাতায় আমাদের কাছে বিদ্যমান রয়েছে। আর এগুলোই ইতিহাসের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের সমাহার। এর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণ্য তথ্য ইতিহাসের ভাণ্ডারে আর নেই।

হযরত আল্লামা শিবলী নোমানী (রহ.)-এর ভাষায় বলা যায় : অন্যান্য জাতি যখন 'জগতে এ ধরনের মৌখিক রেওয়ায়েত লিখার সুযোগ পেয়েছে, অর্থাৎ যখন কোন যুগের অবস্থা দীর্ঘকাল পর লিখে রাখার প্রয়োজন হয়েছে, তখন সব রকমের কিংবদন্তি, প্রচলিত গাল-গল্প, উড়ো খবর, গুজব সবকিছুই নির্বিবাদে কাগজের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করেছে। এমন কি এসব ঘটনা বর্ণনাকারীদের নাম-নিশানারও উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর এসব ক্ষেত্রে বিশেষ করে গুজবগুলোর মধ্য থেকে এমন সব ঘটনা নির্বাচন করা হয়, যেগুলো অনুমানের সাথে খাপ খায়। কিছুকাল পর এসব গাল-গল্প চমৎকার ইতিহাসরূপে পরিগণিত হয়। ইউরোপের অধিকাংশ রচনার ভিত্তি এ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'

'কিন্তু মুসলমানগণ জীবনচরিত রচনার যে মানদণ্ডের সূচনা করেছে তা এদের তুলনায় অনেক উচ্চপর্যায়ের ছিল। এর প্রথম নীতি ছিল এটাই যে, কোন ঘটনা বর্ণনাকালে এমন ব্যক্তির নিজস্ব ভাষায় তা বর্ণিত হতে হবে, যে নিজে সে ঘটনার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিল। আর যদি বর্ণনাকারী নিজে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়ে থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি সরাসরি ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী ছিল তার কাছে থেকে ঘটনার ক্রমানুসারে বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ করে সাথে সাথে এ বিষয়েও অনুসন্ধান চালাতে হবে যে, ধারাবাহিক বর্ণনায় যে সকল বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ হয়েছে তারা কারা ও কোন ধরনের ব্যক্তি? তাদের কাজ-কর্ম ও আচার-ব্যবহার, চিন্তা-চেতনা কেমন ছিল? জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল কতটুকু? নির্ভরযোগ্য কিনা? সাধারণ পর্যায়ের জ্ঞানের অধিকারী ছিল, না গভীর জ্ঞানসম্পন্ন? শিক্ষিত ছিল, না অশিক্ষিত? এসব খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানা ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু শত শত হাজার হাজার মুহাদ্দিস এ তথ্যগুলো উদ্ধার করার



www.nagorikpathagar.org

জন্য তাঁদের জীবনপাত করে গিয়েছেন। তাঁরা শহরে শহরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বর্ণনাকারীদের সাথে দেখা করেছেন, তাঁদের যাবতীয় হাল-অবস্থা জিজ্ঞেস করে এ সম্পর্কে তন্নতন্ন করে বিস্তারিত অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এসব অনুসন্ধান ও গবেষণায় তাঁরা 'আসমাউর রিজাল'-এর বিরাট শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। এর ফলে কমপক্ষে এক লক্ষ লোকের জীবনচরিত আজ আমাদের জানা সম্ভব হয়েছে।'

এ ছিল শুধুমাত্র 'রেওয়ায়েত' ও ঘটনার বর্ণনা সম্পর্কিত। তাছাড়াও তাঁরা যাচাই-বাচাই করার নীতি এবং 'দেরায়েত' অর্থাৎ যুক্তিপ্রজ্ঞা ও প্রমাণের কষ্টিপাথরে রেওয়ায়েতগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য পৃথক নীতি-নিয়ম নির্ধারণ করে এ পন্থায় কিভাবে রেওয়ায়েতগুলোকে নির্ভুল প্রমাণ করা যেতে পারে, তাও তাঁরা নির্ধারণ করেছেন। বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে যাচাই ও অনুসন্ধানের ব্যাপারে তাঁরা এত বেশি সততা ও সত্যবাদিতার পন্থা অবলম্বন করেছেন যে, তাঁদের কার্যাবলী আজ ইসলামের জন্য গর্বের মহা সম্পদে পরিণত হয়েছে। বর্ণনাকারীদের বেলায় এমন সব পরাক্রমশালী খলীফা এবং আমীরও ছিলেন, যাঁদের নাম শুনলে মানুষ কেঁপে ওঠতো। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সকলের পর্দার ভেতর উঁকি মেরেছেন এবং এক্ষেত্রে যে যতটুকু মর্যাদার অধিকারী, ঠিক ততটুকু মর্যাদা তাঁদেরকে প্রদান করেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন ইমাম ও কা'য়। কিন্তু তাঁর পিতা ছিলেন সরকারি অর্থসচিব। তাই তিনি নিজে যখন পিতার কাছে থেকে শুনে রেওয়ায়েত করেন, তখন তাঁর সমর্থনে অন্য কোন বর্ণনাকারীর নামও অবশ্য উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ একা তাঁর পিতার বর্ণনা কখনো গ্রহণ করেননি। এ সর্তকতা ও সত্যবাদিতার কি কোন তুলনা হতে পারে?

(তাহযীবুত তাহযীব, ১১শ খণ্ড ১৩০ পৃষ্ঠা)

মাসউদী ছিলেন একজন মুহাদ্দিস। ১৫৪ হিজরীতে ইবনে মু'আয দেখেন যে, কিছু বর্ণনা করতে হলে তাঁকে লিখিত হাদীসের সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন হয়। তাই তিনি সাথে সাথেই তাঁর স্মৃতিশক্তির ওপর অনাস্থা প্রকাশ করেন। (তাহযীবুত তাহযীব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২১১ পৃষ্ঠা)

এ মুআয ইবনে মুআযকে এক ব্যক্তি দশ হাজার দীনার (যার মূল্য বর্তমানে দশ হাজার গিনির চেয়েও বেশি) শুধুমাত্র এজন্য দিতে চেয়েছিলেন যে,

www.nagorikpathagar.org

তিনি যেন এক ব্যক্তিকে নির্ভরযোগ্য বা অনির্ভরযোগ্য কিছুই না বলেন অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে যেন নীরবতা অবলম্বন করেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন : 'আমি কোন সত্যেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারি না।' জগতের ইতিহাস কি এর চেয়ে অধিক সততার কোন দৃষ্টান্ত পেশ করে?

কাঁচা-পাকা এসব ভুল ও নির্ভুল, শক্তিশালী ও দুর্বল এবং গ্রহণ ও অগ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতসমূহের বিরাট স্তূপ আজও বর্তমান রয়েছে এবং আজও পূর্বোল্লিখিত নীতিসমূহের মাধ্যমে প্রত্যেকটি রেওয়ায়েতের পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা করা যেতে পারে এবং ভেজাল ও নির্ভেজাল পুনরায় পৃথক করা সম্ভব হতে পারে।

প্রিয় বন্ধুগণ! এসব নীরস অনুসন্ধানের ব্যাপারে আমি আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের ঐতিহাসিক দিকটি এখন অনেকটা আপনাদের সামনে স্বচ্ছ হয়ে ওঠেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের যে সমস্ত ঘটনা সংগৃহীত হয়েছে, তার উৎস এবং সেগুলো কীভাবে সংযোজিত ও লিখিত হয়েছে, তা এখন আমি আপনাদেরকে উপস্থাপন করে যাব।

**প্রথম উৎস–** রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের সবচেয়ে নির্ভুল অংশের উৎস হচ্ছে কুরআন মজীদ। কুরআনের নির্ভুলতা ও নির্ভর যোগ্যতার ব্যাপারে দুশমনরাও কোনরূপ সন্দেহ করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় অংশ প্রাক-নবুয়ত জীবন, পিতৃ-মাতৃহীন জীবন, দারিদ্র্য, সত্যের সন্ধান, নবুয়ত, ওহী, ঘোষণা ও প্রচার, মি'রাজ, বিরোধী পক্ষের শত্রুতা, হিজরত, যুদ্ধ, চারিত্রিক অবস্থা ইত্যাদি সবকিছু এর অন্তর্ভুক্ত। এর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক জীবনচরিতের সন্ধান পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় পাওয়া অসম্ভব।

**দ্বিতীয় উৎসটি** হচ্ছে হাদীস। এর সংখ্যা প্রায় এক লাখের কাছাকাছি। এর মধ্যে নির্ভুল, দুর্বল ও মনগড়া হাদীসসমূহ পৃথক পৃথকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। মূল্যবান 'সিহাহ সিত্তা'র (ছয়টি নির্ভুল হাদীসগ্রন্থ) প্রত্যেকটি

www.nagorikpathagar.org

হাদীস কঠোর সমালোচনা এবং যাচাই-বাচাইয়ের পর সন্নিবেশিত হয়েছে। এরপর আছে বিভিন্ন ধারার সমষ্টি। এর মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও ঘটনাবহুল মুসনাদ। এর মধ্যে সবচেয়ে বিপুলায়তন হচ্ছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের গ্রন্থ মুসনাদ। এটি ছ'টি খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতিটি খণ্ডে মিসরের সর্বাপেক্ষা ক্ষদ্রাকৃতির টাইপে মুদ্রিত অন্যূন পাঁচশ পৃষ্ঠা সম্বলিত। তাতে প্রত্যেক সাহাবীর রেওয়ায়েত পৃথকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ সংকলনসমূহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-বৃত্তান্ত ও শিক্ষাসমূহ ওৎপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে।

তৃতীয় উৎসটি হচ্ছে মাগাযী। এ গ্রন্থসমূহে মূলত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধবিষয়ক ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে এবং অন্যান্য ঘটনাও উল্লেখ হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উরওয়া ইবনে যুবাইরের (মৃত্যু ৯৪ হিজরী) মাগাযী, যুহরীর (মৃত্যু ১২৭ হিজরী) মাগাযী, মুসা ইবনে উতবার (মৃত্যু ১৪১ হিজরী) মাগাযী, ইবনে ইসহাকের (মৃত্যু ১৫০ হিজরী) মাগাযী, যিয়াদ বুকাই'র (মৃত্যু ১৯৩ হিজরী) মাগাযী, ওয়াকেদীর (মৃত্যু ২০৭ হিজরী) মাগাযী প্রভৃতি অতি প্রাচীন।

চতুর্থ উৎস হচ্ছে সাধারণ ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ। এগুলোর প্রথমাংশ বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন সংক্রান্ত বিষয়েহচ্ছে 'তাবকাতে ইবনে সা'আদ' এবং ইমাম জাফর তাবারির 'তারিখুর রাসূলি ওয়াল মূলুক', ইমাম বুখারীর তারিখে সগীর ও কবীর, তারিখে ইবনে হিব্বান, তারিখে ইবনে আবী খাইসামা বাগদাদী (মৃত্যু ২৯৯ হিজরী) প্রভৃতি গ্রন্থ।

পঞ্চম উৎস হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অলৌকিক এবং আধ্যাত্মিক ঘটনাবলী সম্পর্কিত পৃথক গ্রন্থসমূহ। এগুলোকে 'কুতুবে দালায়েল' বলা হয়। যেমন, ইবনে কুতাইবার (মৃত্যু ২৭৬ হিজরী) দালায়েলুন নবুয়ত, আবূ ইসহাক হারবীর (মৃত্যু ২৫৫ হিজরী) দালায়েলুন নবুয়ত, দালায়েলে ইমাম বায়হাকী (মৃত্যু ৪৩০ হিজরী) দালায়েল আবু না'ঈম ইসফাহানী (মৃত্যু ৪৩০ হিজরী), দালায়েল মুস্তাগফেরী (মৃত্যু ৪৩২ হিজরী), দালায়েল আবুল কাসেম ইসমা'ঈল ইস্ফাহানী (মৃত্যু ৫৩৫ হিজরী)। এ শাখায় সর্বাধিক তথ্যবহুল গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম সুয়ূতীর খাসায়েসে কুবরা।

www.nagorikpathagar.org

**ষষ্ঠ উৎসটি** হচ্ছে শামায়েল গ্রন্থসমূহ। এসব গ্রন্থসমূহে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব, চরিত্র, আচার-ব্যবহার, অভ্যাস ইত্যাদি বর্ণনা রয়েছে। সর্বপ্রথম এ শাখায় ও সবচেয়ে বিপুলায়তন ও বৃহত্তম গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম তিরমিযির (মৃত্যু ২৭৯ হিজরী) শামায়েল। বড় বড় আলেম এর বহুসংখ্যক ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ শাখায় সবচেয়ে বিপুলায়তন ও বৃহত্তম গ্রন্থ হচ্ছে কাজী ইয়াযের কিতাবুশ শিফা ফী হুকূকিল মুস্তফা এবং এর ভাষ্যগ্রন্থ শিহাব খাফফাজী লিখিত নাসীমুর রিয়ায। এ শাখায় অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে আবুল আব্বাস মুসতাগফেরীর (মৃত্যু ৪৩২ হিজরী) শামায়েলুন নবী, এবং সাতেয়ু ইবনুল মুকেররী গার্নাতীর (মৃত্যু ৫৫২ হিজরী) শামায়েলুননূর এবং মাজদুধদীন ফিরোজাবাদীর (মৃত্যু ৮১৭ হিজরী) সফরুস্ সা'আদা।

**সপ্তম উৎসটি** হচ্ছে মক্কা ও মদীনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থসমূহ। এসব কিতাবে এ শহরদ্বয়ের সাধারণ বৃত্তান্ত ছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের স্থানীয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সে সকল স্থানের কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল, সেগুলোর নাম পরিচয় ও অবস্থান উল্লেখ রয়েছে। এ শাখায় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ হচ্ছে যারকীর (মৃত্যু ২২৩ হিজরী) আখবারে মক্কা, 'ওমরা ইবনে শিবা'র (মৃত্যু ২৬৩ হিজরী) আখবারে মক্কা, 'ওমরা ইবনে শিবা'র (মৃত্যু ২৬৩ হিজরী) আখবারে মক্কা, 'ওমরা ইবনে শিবা'র (মৃত্যু ২৬৩ হিজরী) আখবারে মদীনা, ফাকেহীর আখবারে মক্কা ও ইবনে যাবালার আখবারে মদীনা প্রভৃতি।

বন্ধুগণ! আমার আজকের আলোচনায় আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের ঐতিহাসিক তথ্য-সম্পদের যে বিবরণ উপস্থাপন করেছি, তা থেকে আমাদের সমর্থক ও বিরোধী সকলেই বুঝতে পেরেছেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতের ঐতিহাসিক ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ়। শুধুমাত্র মুখস্থ বিদ্যা ও বিক্ষিপ্ত স্মারকলিপির ওপরই প্রথম যুগের মুহাদ্দিসগণ ও মুসলিম খলীফাগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না; বরং তাঁরা এসব শাস্ত্রের বড় বড় ইমামগণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধ সংক্রান্ত (মাগাযী) বিষয়াবলী

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষায়তন ও মসজিদসমূহে রীতিমত ক্লাশ শুরু করেছেন। হযরত কাতাদা আনসারী একজন সাহাবী ছিলেন। তাঁর প্রপুত্র আসেম ইবনে ওমর মাগাযীর ইমাম ছিলেন। তিনি ১২১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের নির্দেশে রাজধানী দামেশকের জামে মসজিদে বসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়াবলীর শিক্ষা দান করতেন। (তথ্য : তাহযীব) মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যামানা থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক দেশে, প্রতিটি ভাষায় তাঁর জীবনচরিত, জীবনের ঘটনাবলী ও বাণীসমূহ সম্পর্কে যে সমস্ত কিতাব লেখা হয়েছে, এর সংখ্যা কয়েক হাজারেরও বেশি। উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলোতে বিগত দুশো বছর থেকে রচনার কাজ শুরু হয়েছে। তাছাড়া মৌলিক রচনার কাজ এখানে শুরু হয়েছে মাত্র বিগত ১৮৫০ ঈসায়ী সনের কিছু আগ ও পর থেকে। তবুও এসব ভাষায় ছোট বড় কয়েকশো গ্রন্থ এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

## ইসলামের শত্রুদের দৃষ্টিতে

না হয় মুসলমানদের কথা বাদই দিলাম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ এবং তাঁর নির্দেশ প্রতিপালন তাদের দ্বীন ও ঈমানেরই দাবি। এবার দুশমনদের শিবিরে আসা যাক। ভারতের হিন্দু, শিখ, খ্রিষ্টান ও ব্রাহ্মণ সমাজীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী লিখেছেন। ইউরোপও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি স্বভাবতই শ্রদ্ধাশীল নয়। তবুও সেখানে মিশনারীদের সবের জন্য বা তত্ত্বগত রুচি বা বিশ্ব-ইতিহাসের জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য 'লাইফ অব মুহাম্মদ' সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় ১৬/১৭ বছর পূর্বে দামেশকের 'আল-মুকতাবিস' নামক পত্রিকায় এ সম্পর্কিত একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে, এ পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

---

১. ১৯২৫ সনে এ বক্তৃতাটি প্রদত্ত হয়।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষায়তন ও মসজিদসমূহে রীতিমত ক্লাশ শুরু করেছেন। হযরত কাতাদা আনসারী একজন সাহাবী ছিলেন। তাঁর প্রপুত্র আসেম ইবনে ওমর মাগাযীর ইমাম ছিলেন। তিনি ১২১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের নির্দেশে রাজধানী দামেশকের জামে মসজিদে বসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়াবলীর শিক্ষা দান করতেন। (তথ্য : তাহযীব) মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যামানা থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক দেশে, প্রতিটি ভাষায় তাঁর জীবনচরিত, জীবনের ঘটনাবলী ও বাণীসমূহ সম্পর্কে যে সমস্ত কিতাব লেখা হয়েছে, এর সংখ্যা কয়েক হাজারেরও বেশি। উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলোতে বিগত দুশো বছর থেকে রচনার কাজ শুরু হয়েছে। তাছাড়া মৌলিক রচনার কাজ এখানে শুরু হয়েছে মাত্র বিগত ১৮৫০ ঈসায়ী সনের কিছু আগ ও পর থেকে। তবুও এসব ভাষায় ছোট বড় কয়েকশো গ্রন্থ এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

## ইসলামের শত্রুদের দৃষ্টিতে

না হয় মুসলমানদের কথা বাদই দিলাম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ এবং তাঁর নির্দেশ প্রতিপালন তাদের দ্বীন ও ঈমানেরই দাবি। এবার দুশমনদের শিবিরে আসা যাক। ভারতের হিন্দু, শিখ, খ্রিষ্টান ও ব্রাহ্মণ সমাজীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী লিখেছেন। ইউরোপও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি স্বভাবতই শ্রদ্ধাশীল নয়। তবুও সেখানে মিশনারীদের সবের জন্য বা তত্ত্বগত রুচি বা বিশ্ব-ইতিহাসের জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য 'লাইফ অব মুহাম্মদ' সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় ১৬/১৭ বছর পূর্বে দামেশকের 'আল-মুকতাবিস' নামক পত্রিকায় এ সম্পর্কিত একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে, এ পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

---

১. ১৯২৫ সনে এ বক্তৃতাটি প্রদত্ত হয়।

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ১৩শ গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এরপর থেকে এ পর্যন্ত আরো যে সমস্ত গ্রন্থ লেখা হয়েছে, সেগুলোকেও যোগ করা হলে এ সংখ্যা নিশ্চয় বিরাট আকার ধারণ করবে। অধ্যাপক D.S. Margoliuth (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি অধ্যাপক) লিখা এবং ১৯০৫ সনে 'হিরোজ অব দি নেশান্স' সিরিজ কর্তৃক মুদ্রিত ইংরেজি গ্রন্থ 'মুহাম্মদ'-এর চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী সংক্রান্ত অধিকতর বিষাক্ত গ্রন্থ আর একটিও লিখা হয়নি। তিনি এ গ্রন্থে প্রত্যেকটি বিষয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য উত্থাপন করে নবীচরিতকে বিকৃত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছেন। তবুও গ্রন্থের ভূমিকায় এ সত্যটি স্বীকার না করে পারেননি যে, 'মুহাম্মদের জীবনীকারদের দীর্ঘধারা শেষ হওয়া অসম্ভব, কিন্তু তাঁদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারাটা এক বিরাট সম্মানজনক ব্যাপার।'

ইংরেজি ভাষায় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে জন ডেভিনপোর্ট সর্বাধিক সহানুভূতিপূর্ণ গ্রন্থ 'এ্যপলজি ফর মুহাম্মদ এণ্ড দি কুরআন' লিখেছেন। এভাবে তিনি গ্রন্থটির সূচনা করেছেন :

'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সকল আইন-প্রণেতা ও বিজয়ীগণের মধ্যে একজনও এমন নেই, যার জীবনচরিত মুহাম্মদের জীবনচরিতের চেয়ে বেশি বিস্তারিত ও সত্য।'

অক্সফোর্ড ট্রিনিটি কলেজের ফেলো রেভারেণ্ড বসওয়ার্থ স্মিথ (Bosworth Smith) ১৮৭৪ সনে 'রয়াল ইনস্টিটিউশান অব গ্রেট বৃটেন'-'মুহাম্মদ' এবং 'মোহামেডানিজম' সম্পর্কে একটি বক্তৃতা প্রদান করুন। এটি পুস্ত কাকারে মুদ্রিত হয়েছে। এতে রেভারেণ্ড সাহেব কি চমৎকারভাবেই না তথ্য প্রদান করেছেন :

সাধারণভাবে 'ধর্ম সম্পর্কে (প্রারম্ভকাল অজ্ঞাত থাকার কারণে) যা কিছু সত্য, দুর্ভাগ্যবশত এ তিনটি ধর্ম ও এদের প্রবর্তকদের সম্পর্কেও তা সত্য। অন্য কোন ভাল নাম না থাকার কারণে আমরা এদেরকে ঐতিহাসিক ভিত্তি বলে থাকি। আমরা ধর্মের প্রাথমিক প্রারম্ভিককালের কর্মীবৃন্দের সম্পর্কে খুব কমই এবং তাদের শ্রমের সাথে যারা পরবর্তীকালে নিজেদের শ্রম যোগ করেছেন তাদের সম্পর্কে সম্ভবত অনেক বেশি জানি।

www.nagorikpathagar.org

করেছেন এবং তার প্রতিটি শব্দের অর্থ বুঝে নিয়ে অন্যের কাছে পৌঁছিয়েছেন। হাদীসের প্রথম গ্রন্থ 'মুয়াত্তাকে তার লেখক ইমাম মালিক (র)-এর কাছে থেকে ৬০০ লোক শুনেছেন। তাঁদের মধ্যে সমকালীন সুলতান, আলেম, ফকীহ, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও সূফী অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণির লোক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম বুখারীর রচনা সহীহ বুখারীকে মাত্র তাঁর একজন ছাত্র ফারবারীর কাছে থেকে ৬০ হাজার লোক শুনেছেন। এখন আপনারাই বলুন, কোন ধর্ম প্রবর্তক ও প্রচারকের জীবনচরিত ও বাণী সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য এমন সতর্কতা ও ঘটনা বর্ণনাকারীদের এরূপ ধারাবাহিকতা রক্ষা করার এত বিপুল আয়োজন করা হয়েছে কি? হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কার জীবনচরিতের ঐতিহাসিক ভিত্তি এত সুদৃঢ় ছিল এরূপ চিন্তা করা যায়?

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদের প্রতি শান্তি বর্ষণ কর!

www.nagorikpathagar.org

# ৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতে ইসলামের মানবিক গুণাবলীর পূর্ণতা

বন্ধুগণ! আপনাদের সামনে 'আজ আমি মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা' সম্পর্কে আলোচনা করব। যে জীবন যতই ঐতিহাসিক অবদানে পরিপূর্ণ হোক না কেন যতক্ষণ তার মধ্যে মানবিক গুণাবলী পরিপূর্ণতা লাভ না করে, ততক্ষণ আমাদের জন্য তা আদর্শ হতে পারে না। আবার কোন জীবনে পূর্ণাঙ্গ মানবিক গুণাবলীর সমাবেশ ও তা যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত তখনই প্রমাণিত হতে পারে, যখন তার সমগ্র অংশ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত থাকে। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর সময়কালে লোকের সামনে ছিল এবং তাঁর ইন্তিকালের পর বিশ্ব-ইতিহাসের পাতায় তাঁর কর্মময় জীবনের প্রতিটি দিক পুরোপুরিভাবেই সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর জীবনের সামান্য অংশও এমন নেই যে, সে সময়ে তিনি তাঁর দেশবাসীর দৃষ্টিসীমার বাইরে অবস্থান করে ভবিষ্যতের প্রস্তুতিতে লিপ্ত ছিলেন।[১] জন্ম, দুগ্ধপান, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, ব্যবসায়ে যোগদান, চলাফেরা, বিয়ে, নবুয়ত-পূর্বকালের বন্ধু-বান্ধব, কুরাইশদের যুদ্ধ সংক্রান্ত চুক্তিতে অংশগ্রহণ, 'আল-আমীন' উপাধি লাভ, কাবাঘরে পাথর স্থাপন, ধীরে ধীরে নির্জন-প্রিয়তা, হেরা গুহায় নিঃসঙ্গ অবস্থান, ওহী অবতরণ, ইসলামের দাওয়াত দান, প্রচার অভিযান, বিরোধিতা, তায়েফ গমন, মি'রাজ, হিযরত, যুদ্ধ, হুদায়বিয়ার সন্ধি, বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাদের কাছে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ, ইসলাম প্রচার, দীনের পূর্ণতা প্রদান, বিদায় হজ্ব ও

---

১. এ পৃথিবীতে যাঁরা বিরাট কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন বিশেষ করে নবীগণ আলাইহিস সালাম তাঁরা সর্বদাই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে থাকেন। আন্দোলনে নেতৃত্বদান এবং সভ্যতার পুনঃনির্মাণে নেতৃত্ব দানকারীদের শক্তির প্রকৃত উৎস হয়ে থাকে বিশেষ ধরনের চিন্তাধারা চরিত্রের সমন্বয়ে গঠিত তাঁদের ব্যক্তি সত্ত্বা। জগতের বুকে মানবিক গুণাবলীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত হতে হলে তাঁর জীবনেতিহাস বা সীরাত অধ্যয়নই হবে অন্যতম উদ্দেশ্য। (সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত)

www.nagorikpathagar.org

তাঁর মৃত্যুর মধ্যে কোন সময়টি জগতবাসীর দৃষ্টিসীমার আড়ালে ছিল? তাঁর কোন অবস্থানটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের অজানা? সত্য-মিথ্যা, ভুল-নির্ভুল প্রত্যেকটি বিষয়ই পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং প্রত্যেকেই তা জেনে নিয়েছে।

## দুর্বল রেওয়ায়েত সংরক্ষণ কেন করা হয়েছে?

অনেক সময় চিন্তা করি, মুহাদ্দিসগণ কেন মনগড়া ও দুর্বল রেওয়ায়েতসমূহ সংরক্ষিত রেখেছেন? কিন্তু এর পরক্ষণেই মনে হয়েছে যে, এর মধ্যে হয়ত আল্লাহর বিরাট উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ একথা বলার সুযোগ বিরুদ্ধবাদীদের যেন না থাকে যে, তারা নিজেদের নবীর বিভিন্ন দুর্বলতা ঢেকে রাখার জন্য অনেক রেওয়ায়েত বিলুপ্ত করে দিয়েছে। যেমন বর্তমানে প্রায়ই খ্রিষ্টানদের বইপত্রের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে। এজন্য আমাদের মুহাদ্দিসগণ নিজেদের নবীচরিত সম্পর্কিত সত্য-মিথ্যা যাবতীয় বিষয় সামনে রেখে দিয়েছেন, এদের উভয়ের পার্থক্য দেখিয়েছেন এবং এরূপ পার্থক্যের নীতিও নির্ধারণ করেছেন। যেমন– ওঠা-বসা, ঘুম-জাগরণ, বিয়ে-শাদী, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, নামায-রোযা, দিনরাতের ইবাদত, যুদ্ধবিগ্রহ-সন্ধি, চলাফেরা, সফর ও অবস্থান গোসল, আহার-বিহার, হাসি-কান্না, কাপড় পরিধান, হাসি-ঠাট্টা, আলাপ-আলোচনা, নির্জনে ও জনসমাজে বিচরণ, মেলামেশা, আচার-ব্যবহার, দেহের বর্ণ ও গন্ধ, আকৃতি-প্রকৃতি, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এমনকি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, একত্রে বিশ্রাম ও পবিত্রতা অর্জন ইত্যাতি প্রত্যেকটি বিষয়ই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত, সর্বজনবিদিত ও সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত মাত্র একটি প্রাচীনতম গ্রন্থ 'শামায়েলে তিরমিযী'র বিভিন্ন অধ্যায়ের শিরোনাম পাঠ করে আপনাদের শুনাচ্ছি। আপনারা এ থেকে অনুমান করতে পারবেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কিত অতি সামান্য বিষয়ও আমাদের গ্রন্থে উল্লিখিত রয়েছে।[১]

---

[১]. এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে বড় বড় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বিশেষ করে নবীগণ যাঁরা কথা বলেন এবং যাঁদের মধ্যে সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের আবেগ বিরাজ করে তাঁরা যখন কথা বলেন : তখন তাতে তাঁদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মহত্ব গভীর তাৎপর্য ফুটিয়ে তোলে, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা তাঁর কর্মময়

www.nagorikpathagar.org

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা ও গঠনাকৃতির আলোচনা।

২. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চুলের আলোচনা।

৩. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ক কেশের আলোচনা।

৪. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চুল আঁচড়াবার আলোচনা।

৫. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চুলে খেজাব লাগাবার আলোচনা।

৬. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চোখে সুর্মা লাগাবার আলোচনা।

৭. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পোশাকের আলোচনা।

৮. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন যাপনের আলোচনা।

৯. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মোজার আলোচনা।

১০. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাপোশের আলোচনা।

১১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আংটির মোহরের আলোচনা।

১২. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তলোয়ারের আলোচনা।

১৩. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লৌহবর্মের আলোচনা।

১৪. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লৌহ শিরস্ত্রাণের আলোচনা।

১৫. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাগড়ীর আলোচনা।

১৬. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পায়জামার আলোচনা।

১৭. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চলার আলোচনা।

১৮. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে কাপড় ঢাকবার আলোচনা।

১৯. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বসার আলোচনা।

২০. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিছানা ও বালিশের আলোচনা।

২১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হেলান দেয়ার আলোচনা।

২২. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহার করার আলোচনা।

২৩. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রুটির আলোচনা।

২৪. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওযূ করার আলোচনা।

---

জীবনের মানকে উন্নত করে এবং তাঁদের চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব পবিত্রতর করে তোলে। (সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।)

www.nagorikpathagar.org

২৫. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহারের পূর্বে ও পরে দোয়া পাঠের আলোচনা।

২৬. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেয়ালার আলোচনা।

২৭. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফলের আলোচনা।

২৮. রাসূলুল্লাহ্ (সা) কী কী পান করতেন এর আলোচনা।

২৯. রাসূলুল্লাহ্ (সা) কীভাবে পান করতেন এর আলোচনা।

৩০. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খোশবু লাগাবার আলোচনা।

৩১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা বলার আলোচনা।

৩২. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কবিতা পাঠের আলোচনা।

৩৩. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাতে কথাবার্তার আলোচনা।

৩৪. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘুম সংক্রান্ত আলোচনা।

৩৫. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর 'ইবাদতের আলোচনা।

৩৬. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাসির আলোচনা।

৩৭. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রসিকতার আলোচনা।

৩৮. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাশতের নামাযের আলোচনা।

৩৯. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে নফল পড়ার আলোচনা।

৪০. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোযার আলোচনা।

৪১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠের আলোচনা।

৪২. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোনাজারি আলোচনা।

৪৩. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিছানার আলোচনা।

৪৪. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নম্রতার আলোচনা।

৪৫. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আচার-আচরণের আলোচনা।

৪৬. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ক্ষৌর কাজের আলোচনা।

৪৭. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামসমূহের আলোচনা।

৪৮. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের বিভিন্ন অবস্থার আলোচনা।

৪৯. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্ম তারিখ ও বয়সের আলোচনা।

৫০. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মৃত্যু আলোচনা।

৫১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মীরাস ও পরিত্যক্ত বস্তুর আলোচনা।

www.nagorikpathagar.org

এগুলো সবই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত অবস্থা সংক্রান্ত বিবরণ। এর মধ্যে প্রত্যেকটি শিরোনামে কোথাও মাত্র কিছু এবং কোথাও বহু বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে। এসব ঘটনাগুলোর প্রত্যেকটি দিক স্বচ্ছ ও দ্ব্যর্থহীন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের কোন একটি মুহূর্তও পর্দান্তরালে ছিল না। অন্তপুরে তিনি থাকতেন স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে এবং বাইরে আত্মীয়-বান্ধব ও ভক্ত সহচরগণের মজলিসে।

প্রিয় বন্ধুগণ! বিরাট প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিও জগতে নিজ ঘরে সাধারণ মানুষের মতই অবস্থান করেন। এজন্য ভল্টেয়ারের কথায় বলা যায়, 'কোন ব্যক্তি নিজ ঘরে হিরো হতে পারে না' (No man is hero to his valet)। বসওয়ার্থ স্মিথের মতে 'এ নীতিটি কমপক্ষে ইসলামের নবীর ক্ষেত্রে একান্তভাবেই সত্য নয়।[১] গীবন বলেছেন : 'মুহাম্মদের ন্যায় অন্য কোন নবীই তাঁর অনুসারীগণকে এমন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে দেননি। যারা তাঁকে মানুষ হিসেবে অত্যন্ত উত্তমরূপেই জানতেন, তাঁদের সামনে তিনি হঠাৎ নিজেকে নবী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। নিজ স্ত্রী, নিজ গোলাম, নিজ ভাই এবং নিজ ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সামনে নিজকে নবী হিসেবে উত্থাপন করেছেন এবং তাঁরা বিনা দ্বিধায় তাঁর দাবি মেনে নিয়েছেন।'

জাগতিক জীবনে মানুষের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার বিষয়য়াদি স্ত্রীর চেয়ে বেশি আর কেউ জানতে পারে না। তাহলে এটি কি একটি বাস্তব সত্য নয় যে, একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের ওপর সর্বপ্রথম তাঁর স্ত্রী খাদিজা ঈমান এনেছিলেন? নবুয়ত লাভের পূর্বে পনের বছর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জীবন-যাপন করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রতিটি বিষয় উত্তমরূপে জানতেন। এসবের পরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত দাবি করার পর সর্বপ্রথম তিনিই তাঁর দাবির সত্যতা স্বীকার করেছেন অর্থাৎ ঈমান এনেছেন।

---

১. বসওয়ার্থ স্মিথের বই 'লাইফ অব মুহাম্মদ' সম্পর্কে বক্তৃতার অংশ বিশেষ। (গ্রন্থকার)

www.nagorikpathagar.org

অতি মহান ব্যক্তিও যিনি মাত্র একটি স্ত্রীর স্বামী, তিনিও স্ত্রীকে এ মর্মে ব্যাপক অনুমতিদানের মনোভাব রাখেন না যে, তুমি আমার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি অবস্থা ও ঘটনা মানুষের সামনে প্রচার কর এবং যা কিছু গোপন রয়েছে তাও জনসমক্ষে প্রকাশ করে দাও। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই সাথে ন'জন স্ত্রী ছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেককে এ অনুমতি প্রদান করেছিলেন যে, নির্জনে আমার মাঝে যা কিছু দেখ তা কোন প্রকার সংকোচ না করে জনসাধারণের প্রচার কর। বন্ধ ঘরে যা কিছু দেখ, খোলা পরিবেশে তা সবাইকে জানিয়ে দাও। এবার আপনারাই চিন্তা করুন এমন চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন নবী কি আর পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া সম্ভব হতে পারে?

আর এগুলোই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনার সমষ্টি। হাদীসগ্রন্থসমূহে তাঁর পবিত্র চরিত্র, উন্নত গুণাবলী ও উত্তম আচার-আচরণের বিস্তারিত বর্ণনায় পরিপূর্ণ। বিশেষ করে এক্ষেত্রে কাযী 'ইয়ায আনন্দালুসীর কিতাব 'আশ্‌শিফা' সর্বোত্তম। আমাকে এক ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ ফ্রান্সে বলেছিলেন, ইসলামের নবীর প্রকৃত গুণাবলী সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার জন্য কাযী 'ইয়াযের 'আশশিফা' গ্রন্থটিকে ইউরোপীয় কোন ভাষায় অনুবাদ করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

আমরা এসব সীরাতুন্নবীর দ্বিতীয় খণ্ডে 'শামায়েল' অধ্যায়ে শিরোনামসমূহ সংযোজিত করেছি : যেমন–

'পবিত্র চেহারা, নবুয়তের মোহর, পবিত্র কেশ, চলার ভঙ্গী, কথাবার্তা, হাসি, পোশাক, আংটি, বর্ম ও লৌহ শিরস্ত্রাণ, খাদ্য ও আহার পদ্ধতি, দৈনন্দিন আহার, উত্তম পোশাক, পসন্দনীয় রং ও অপ্রিয় রং, সুগন্ধি ব্যবহার, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, সওয়ার হবার আগ্রহ ইত্যাদি বিষয়সমূহ।'

www.nagorikpathagar.org

## 'নিয়মিত কার্যধারা' অধ্যায়ে নিচের শিরোনামসমূহ সংযোজিত হয়েছে

'সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যা করেছেন, ঘুম, শেষ রাতের ইবাদত, নিয়মিত নামাযসমূহ, বক্তৃতার ধরন, সফর, জিহাদ, রোগীদের খোঁজ-খবর নেয়া, সাধারণ সাক্ষাৎকার এবং সবার সাথে লেনদেন এবং আদান-প্রদান ইত্যাদি বিবরণ।'

## 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিস

'নবীর মজলিস, নসিহতের মজলিস, মজলিসের আদব-কায়দা, মজলিসের সময়সূচী, মহিলাদের জন্য বিশেষ মজলিস, নসিহতের ধরন-পদ্ধতি, মজলিসের আনন্দঘন পরিবেশ, সঙ্গলাভের সুফল, কথা বলার ভঙ্গি, বক্তৃতাসমূহের ধরন, বক্তৃতাসমূহের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়সমূহ।'

## 'ইবাদত' সংক্রান্ত শিরোনামসমূহ

'দোয়া এবং নামায, রোযা, যাকাত, সাদকা, হজ্ব, সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহ প্রেমের আনন্দ, যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহভীতি, রোনাজারি, আল্লাহপ্রেম, আল্লাহ নির্ভরশীলতা, ধৈর্যধারণ ও শোকর ইত্যাদি বিষয়।'

## 'নবী-চরিত' অধ্যায়ের বিস্তারিত শিরোনামসমূহ

পূর্ণাঙ্গ 'নবী-চরিতের আলোচনা'[১], কর্মের দৃঢ়তা, সদ্ব্যবহার, সদাচার ও ইনসাফ, দানশীলতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, মেহমানদারী, ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি ঘৃণা, সাদকা গ্রহণে অসম্মতি, তোহফা গ্রহণ, কারো অনুগ্রহশীল না হওয়া, বলপ্রয়োগ বিরোধ নীতি, আত্মপীড়ন অপসন্দনীয়, অন্যের প্রচার ও অযথা-প্রশংসার প্রতি বিরূপ মনোভাব, সারল্য এবং অনাড়ম্বরতা, কর্তৃত্বের প্রকাশ ও লোক দেখানো মনোভাব থেকে দূরে থাকা, সাম্য, নম্রতা, অপাত্রে সম্মান

---

১. নবী #-এর আখলাখ বা স্বভাব চরিত্র ও নৈতিকতার বিবরণ কোন উপশিরোনামে দেয়া অসম্ভব। কেননা তাঁর সমগ্র জীবনটাই ছিল সৎচরিত্রের নামান্তর। আপাততঃ এটুকু বলাই যথেষ্ট যে সত্য আদর্শ একেবারেই মাঠে অবস্থান নিয়ে ছিলেন এবং সমগ্র দেশবাসীর বিরোধিতা ও অত্যাচারের মুখেও অটল ছিলেন। কখনো কোন কঠিনতম পরিস্থিতির মুখেও ভীতি বা দুর্বলতা প্রকাশ করেননি। সর্বত্রই অবিচল প্রত্যয় ও বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন। (সূত্র : প্রাগুক্ত)

www.nagorikpathagar.org

এবং প্রশংসার প্রতি বিরূপ মনোভাব, লজ্জাশীলতা, নিজ হাতে কাজ করা, সাহস ও দৃঢ়তা, সাহসিকতা, সত্যবাদিতা, প্রতিজ্ঞা পালন, মিতাচার এবং অল্পতে তুষ্টি, ক্ষমা ও ধৈর্যধারণ, শত্রুদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত ও সদ্ব্যবহার, কাফের ও মুশরিকদের সাথে ব্যবহার, ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সাথে আচার-ব্যবহার, গরীবদের প্রতি ভালাবাসা ও সমবেদনা প্রকাশ, শত্রুর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন, শত্রুদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কামনা, ছোটদের প্রতি স্নেহ, মহিলাদের সাথে আচার-ব্যবহার, পশুর প্রতি দয়া প্রদর্শন, সাধারণভাবে সকলের জন্য করুণা ও ভালবাসার প্রকাশ, অন্তরের কোমলতা, রোগীদের দেখাশোনা, মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সহানুভূতি, নম্র মেজাজ, সন্তানদের প্রতি ভালবাসা এবং নিজের স্ত্রীগণের সাথে আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়সমূহ।'

হাফিজ ইবনে কাইয়েম 'যাদুল মা 'আদ' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতের হাল-হাকীকত সর্বাধিক তথ্য বহুলরূপে আলোচনা করেছেন। শুধু তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচ্য সূচীর তালিকা এরূপ : যেমন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যোগাযোগ পদ্ধতি, আহার ও পানীয় গ্রহণের পদ্ধতি, বিবাহ এবং দাম্পত্য সম্পর্কের পদ্ধতি, নিদ্রা ও জাগরণ পদ্ধতি, সওয়ার হবার পদ্ধতি, দাস-দাসীকে নিজ খিদমতের জন্য পেশ করার পদ্ধতি, লেনদেন এবং বেচাকেনার পদ্ধতি, মলমূত্র ত্যাগের নিয়মাবলী, দড়ি বানাবার পদ্ধতি, গোঁফ রাখা এবং ছাঁটার পদ্ধতি, কথা বলার পদ্ধতি, নীরবতা, হাসি, কান্না, বক্তৃতার পদ্ধতি, ওযূর পদ্ধতি, মোজার ওপর মসেহ করার পদ্ধতি, তায়াম্মুম করার পদ্ধতি, নামায আদায়ের পদ্ধতি, দু'সিজদার মাঝখানে বসার পদ্ধতি, সিজদা করার পদ্ধতি, শেষ বৈঠকে বসার ধরন, নামাযে বসার ও তাশাহ্হুদের সময় আঙ্গুল ওঠাবার পদ্ধতি, নামাযে সালাম ফেরাবার পদ্ধতি, নামাযে দোয়া পঠ করা, সোহ্-সিজদা করার পদ্ধতি, নামাযে 'সতর' নির্ধারণ করার পদ্ধতি, সফররত ও স্থির অবস্থা, মসজিদে এবং ঘরে সুন্নাত এবং নফল আদায়ের পদ্ধতি, তাহাজ্জুদ বা ফজরের সুন্নাতের পর বিশ্রাম করার পদ্ধতি, তাহাজ্জুদ পড়ার পদ্ধতি, রাতের নামায এবং বিতের পড়ার পদ্ধতি, বিতেরের পর বসে নামায পড়ার পদ্ধতি,



www.nagorikpathagar.org

কুরআন পাঠের সময় তাঁর হাল অবস্থা, চাশতের নামায পড়ার পদ্ধতি, শোকরের সিজদা আদায় করার পদ্ধতি, জুমআর নামায পড়ার নিয়মাবলী, জুমআর দিন ইবাদতের পদ্ধতি, খুতবাদান পদ্ধতি, দু' ঈদের নামায পড়ার পদ্ধতি, সূর্য গ্রহণের সময় নামায পড়ার পদ্ধতি, অনাবৃষ্টির কারণে নামায পড়ার পদ্ধতি, সফরের পদ্ধতি, সফরে নফল পড়ার পদ্ধতি, দু' নামাযকে এক সাথে পড়ার পদ্ধতি, কোরআন পড়ার ও শুনার পদ্ধতি, পীড়িতদের দেখার ব্যাপারে পদ্ধতি, জানাযার পদ্ধতি, জানাযার সাথে দ্রুতপদে চলার পদ্ধতি, মৃতের ওপর কাপড় ঢাকা দেয়ার পদ্ধতি, কোন লাশ আনা হলে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার পদ্ধতি, তাঁর জানাযার নামাযের পদ্ধতি, শিশুদের জানাযা পড়ার ব্যাপারে তাঁর নিয়ম, আত্মহত্যাকারী এবং জিহাদে প্রাপ্ত গনীমাতের মাল আত্মসাৎকারীর জানাযা না পড়া, জানাযার আগে আগে তাঁর চলা পদ্ধতি, অদৃশ্য লাশের জন্য তাঁর জানাযা পড়ার পদ্ধতি, জানাযার জন্য দাঁড়াবার পদ্ধতি, শোক প্রকাশ এবং কবর যিয়ারতের পদ্ধতি, রোযার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, রমযানে অধিক ইবাদত করার পদ্ধতি, চাঁদ দেখার সাক্ষী গ্রহণে পদ্ধতি, সফরে রোযা না রাখার ক্ষেত্রে পদ্ধতি, আরাফা দিনে আরাফার কারণে তাঁর রোযা না রাখার এবং শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার রোযা রাখার পদ্ধতি, তাঁর একাধিক্রমে রোযা রাখার পদ্ধতি, তাঁর নফল রোযা রাখার ও তা ভেঙ্গে যাবার পর আদায় করাকে ওয়াজিব না মনে করার পদ্ধতি, জুমআর দিনটিকে রোযার জন্য বাছাই করার পদ্ধতি, তাঁর এক বছরে দুটি ওমরা আদায়ের পদ্ধতি, হজ্বসমূহের হাল অবস্থা, নিজ হাতে কুরবানি করার পদ্ধতি, হজ্বে চুল মুণ্ডনের পদ্ধতি, হজ্বের দিনগুলোতে খুতবাদানের পদ্ধতি, ঈদুল আযহায় কুরবানী করার পদ্ধতি, আকীকা করার পদ্ধতি, নবজাতকের কানে আযান দেয়ার এবং তাঁর নাম রাখার ও খাতনা করার পদ্ধতি, নাম এবং কুনিয়াত (ডাক নাম) রাখার ব্যাপারে পদ্ধতি, কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন পদ্ধতি এবং শব্দ নির্বাচনে তাঁর পদ্ধতি, ঘরে প্রবেশ করার পদ্ধতি, পায়খানায় প্রবেশের ও সেখান থেকে বের হবার পদ্ধতি, কাপড় পরিধান করার পদ্ধতি, ওযূর দোয়ার পদ্ধতি, প্রথম তারিখের চাঁদ দেখার পর দোয়া করার পদ্ধতি, খাবার পূর্বে এবং পরে দোয়ার পদ্ধতি, আহারের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় পদ্ধতি, সালামের আনুষ্ঠানিকতায় পদ্ধতি, অন্যের ঘরে অনুমতি নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

প্রবেশে পদ্ধতি, বিবাহে দোয়ায় পদ্ধতি, কোন কোন শব্দের ব্যবহার অপসন্দ করার পদ্ধতি, যুদ্ধ ও জিহাদের পদ্ধতি, বন্দিদের ক্ষেত্রে গুপ্তচর-কয়েদী গোলামের ক্ষেত্রে পদ্ধতি, সন্ধি করার পদ্ধতি, নিরাপত্তাদানের পদ্ধতি, জিজিয়া নির্ধারণ করার এবং আহলে কিতাব এবং মুনাফিকদের সাথে আচার-আচরণের পদ্ধতি, কাফের ও মুনাফিকদের সাথে পর্যায়ক্রমে ব্যবহারের পদ্ধতি, তাঁর অন্তর ও দেহের রোগ চিকিৎসার পদ্ধতি ইত্যাদি।

আপনাদের সামনে আমি এখানে সামান্য এবং খুঁটিনাটি কাজ-কর্মসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করেছি। আপনারা তা থেকে অনুমান করতে পারেন যে, এসব ছোট ছোট বিষয়কে যখন এভাবে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে, তখন বিরাট বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ কত বিস্তারিত বিবরণ এখানে বর্তমান। মোটকথা একটি মানুষের জীবনের যতগুলো দিক থাকা সম্ভব হতে পারে, সবই এখানে লিখে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

প্রিয় বন্ধুগণ! তাহলে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, আমি 'মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছি এবং এখন আমার দাবি মোতাবেক এ মানদণ্ডে যদি বিচার করা হয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-বৃত্তান্ত ব্যতীত অন্য কোন নবীর জীবন এমন সুষ্ঠ পদ্ধতিতে জীবনচরিত সংরক্ষিত নেই আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

আর এ আলোচনা দীর্ঘ না করে সংক্ষেপেই এবার উত্থাপন করছি। উপলব্ধি করুন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্জনে বা জনসমাজে, মসজিদে বা জিহাদের ময়দানে, রাতের নামাযে মশগুল বা সেনাদলের সংগঠনে, ব্যস্ত মিম্বরের ওপর বা নির্জন ঘরে– যেখানে যে অবস্থায় রয়েছেন না কেন সকল অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনি আদেশ দিয়েছেন : 'আমার যাবতীয় অবস্থা এবং প্রতিক্রিয়াকে জনসমাজে প্রকাশ করে দাও।' তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁর নির্জন অবস্থান ও ঘটনাবলী প্রকাশ করতে থাকেন। মসজিদে নববীর একটি ওঠান ছিল। সেখানে গৃহহীন আসহাফে সুফফা ভক্তের দল অবস্থান করতেন। তাঁরা দিনে একেকজন বন-জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে তা বিক্রি করে খাবারের সংস্থানের ব্যবস্থা করতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী শোনে, তাঁর অবস্থা

www.nagorikpathagar.org

পর্যবেক্ষণ ও সাহচর্যেই অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করতেন। ৭০ এর কাছাকাছি ছিল তাঁদের সংখ্যা। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ছিলেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর চেয়ে অধিক রেওয়ায়েত আর কোন সাহাবীর ছিল না। এ ৭০ জন অনুগত সহচরের অতি আগ্রহ সহকারে দিনরাত তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অন্যের কাছে তা প্রকাশ করেছেন। একাধিক্রমে মদীনার সমস্ত বাসিন্দারা ১০ বছর যাবত প্রতিদিন অন্তত পাঁচবার তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ এবং কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছেন। যুদ্ধকালে হাজার হাজার সাহাবা দিনরাত তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ এবং কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছেন। যুদ্ধকালে হাজার হাজার সাহাবা দিনরাত তাঁকে দেখার ও তাঁর অবস্থা জানার সুযোগ লাভ করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় ১০ হাজার, তাবুক যুদ্ধে ৩০ হাজার এবং বিদায় হজ্বে প্রায় এক লাখ সাহাবা তাঁকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ লাভ করেছেন। এভাবে নির্জনে এবং জনসমাজে, ঘরে ও বাইরে, মসজিদে এবং মসজিদের ওঠানে, সাহাবীগণের মজলিসে, শিক্ষালয়ে ও যুদ্ধক্ষেত্রে যে তাঁকে যে অবস্থায় দেখেছেন, তাঁর ব্যাপক প্রচারের শুধুমাত্র অনুমতিই ছিল না বরং নির্দেশ এবং কঠোর নির্দেশও ছিল। এখন আপনারাই বিচার করতে পারেন– তাঁর জীবনের কোন দিকটি পর্দান্তরালে ছিল এবং তাঁর শত্রু ও বিরোধীরা সব রকমের যাচাই ও অনুসন্ধান চালাবার পর মাত্র জিহাদ এবং তাঁর স্ত্রীগণের সংখ্যা ব্যতীত তাঁর অন্য কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেনি। তাহলে এমন জীবনকে নিষ্পাপ বলা সঙ্গত, না এমন জীবনকে অসঙ্গত বলা, যার বিরাট অংশ আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে?

আর এক অন্যদিকেও ভেবে দেখুন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় শুধু তাঁর ভক্তদল পরিবেষ্টিত হয়ে ছিলেন না; বরং তিনি মক্কায় কুরাইশদের মধ্যেও অবস্থান করেছেন। নবুয়ত-পূর্ব চল্লিশটি বছর তাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। তাছাড়া ব্যবসায়ী জীবন, লেনদেন, ব্যবহারিক ও কারবারি জীবন, যেখানে প্রতি পদে পদে অসদ্ব্যবহার, অসদিচ্ছা, ওয়াদা খেলাফী ও খিয়ানতের গভীর আবর্ত ছিল বিদ্যমান, এরপরও তিনি এমন সতর্কতায় এ পথ অতিক্রম করেছেন যে,

www.nagorikpathagar.org

তাঁকে জনগণ 'আল-আমীন' উপাধি দান করেছে। নবুয়ত লাভের পরও লোকেরা তাঁকে পূর্বের মতই বিশ্বস্ত মনে করেছে এবং তাদের আমানতসমূহ তাঁরই কাছে আমানত ছিল। তাই হিযরতের সময় লোকদের আমানত ফেরত দেয়ার জন্য হযরত আলীকে মক্কায় রেখে গিয়েছিল। কোরাইশরা তাঁর নবুয়ত দাবির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে, তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করে, তাঁর সাথে সব রকমের শত্রুতা করে, তাঁকে গালি দেয়, তাঁর পথরোধ করে, তাঁর ওপর নাপাক আবর্জনা নিক্ষেপ করে, তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে, তাঁকে যাদুকর আখ্যা দেয়, কবি নামে অভিহিত করে, উন্মাদ বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। কিন্তু তাঁর আচার-ব্যবহার, কর্ম-চরিত্রের বিরুদ্ধে একটি কথা বলার দুঃহসাহস কেউ করেনি। অথচ অনুয়ত ও নবীর দাবীর অর্থই হচ্ছে এটাই যে, দাবীদার নিজের নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ ও মা'সুম অবস্থা ঘোষণা করছেন। এ দাবি বাতিল করার জন্য তাঁর চরিত্র ও কাজকর্ম সম্পর্কে শুধুমাত্র কয়েকটি শত্রুতামূলক সাক্ষীই যথেষ্ট ছিল। এ দাবীটিও বাতিল করার জন্য বিরোধীরা নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেয়ার ক্ষেত্রে পিছপা হয়নি, এরপরও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি সামান্যতম দোষারোপ করে একে চিরতরে স্তব্ধ করা তাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হয়নি। তাহলে এ থেকে কি একথা প্রমাণ হয় না যে, বন্ধুদের চোখে তিনি যেমন ছিলেন শত্রুদের চোখেও তা থেকে মোটেই ভিন্ন ছিলেন না? আর তাঁর সম্পর্কিত কোন বিষয়ই অগোচরে বা অজানা ছিল না?

একদিন কোরাইশদের বড় বড় নেতারা মজলিস সরগরম করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কেই চলছিল উত্তপ্ত আলোচনা সমালোচনা। কুরাইশদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ এবং বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণকারী হিসেবে নাযার ইবনে হারেস বলে : 'হে কোরাইশরা! তোমাদের ওপর যে বিপদ পতিত হয়েছে এর কোন সুরাহা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। মুহাম্মদ তোমাদের সামনে শিশু থেকে যুবকে পরিণত হয়েছে, সে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও উত্তম। সে

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের সামনে এসব কথা বলছে। এজন্য তোমরা তাঁকে বলছ যাদুকর, জ্যোতিষী, কবি এবং পাগল। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর কথা শুনেছি। মুহাম্মদের মাঝে এ দোষগুলোর একটিও বিদ্যমান নেই। (ইবনে হিশাম)

তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু আবূ জাহল বলেছে : 'হে মুহাম্মদ! তোমাকে আমি মিথ্যাবাদী বলছি না, কিন্তু তুমি যা বলছ এবং বোঝাতে চেয়েছে, সেগুলোকেই আমি সত্য মনে করি না।' কোরআনে নিচের আয়াতটি এ প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে : (তিরমিযী, তফসীরে আন'আম)

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ۔

'(হে নবী!) আমি জানি, এ কাফেরদের কথা তোমাকে মর্মাহত করে। কিন্তু এরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না; কিন্তু এরা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে।' (সূরা আনআম, আয়াত-৩৩)

যখন আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আদেশ করেছেন, তোমার বংশের লোকদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দাও, তখন তিনি একটি পাহাড়ের পাদদেশে সকলকে সমবেত করে বললেন : 'হে কুরাইশগণ! আমি যদি তোমাদেরকে একথা বলেছি যে, এ পাহাড়ের পিছন থেকে হঠাৎ একটি সেনাদল এসে তোমাদেরকে হামলা করতে এসেছে, তাহলে কি তোমরা একথা বিশ্বাস করবে? তখন সবাই বলে, 'হ্যাঁ'! কারণ কখনো তোমাকে আমরা মিথ্যা বলতে শুনিনি।' (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত যখন রূমের কাইসারের দরবারে পৌঁছেছেন। কুরাইশ বংশের কাফেরদের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী আবূ সুফিয়ান, যে একাধিক্রমে ছয় বছর তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেছে, তাঁকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবরণ সম্পর্কিত সাক্ষী এবং অনুসন্ধানের জন্য ডাকা হয়েছে। এবার পরিস্থিতির নাজুকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এক শত্রু তার এমন এক শত্রুর পক্ষে সাক্ষী দিচ্ছে যাকে

www.nagorikpathagar.org

সে মনে-প্রাণে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে। এমন এক পরাক্রান্ত বাদশাহর দরবারে এ সাক্ষী প্রদান করতে হচ্ছে যে, তাকে কোনক্রমে রাজি করতে পারলেই মূহূর্তে তার বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। এবার সেখানকার প্রশ্নোত্তরগুলো দিকে লক্ষ্য করুন :

কাইসার : নবুয়তের দাবিদারের বংশগত মান-মর্যাদা কোন পর্যায়ের?

আবূ সুফিয়ান : অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত।

কাইসার : এ বংশে ইতোপূর্বে আর কেউ কি নবুয়তের দাবি করেছে?

আবূ সুফিয়ান : না।

কাইসার : এ বংশের কেউ বাদশাহ ছিল কিনা?

আবূ সুফিয়ান : না।

কাইসার : যারা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেছে তারা দুর্বল না প্রভাবশালী?

আবূ সুফিয়ান : নিতান্তই দুর্বল।

কাইসার : তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বেড়েছে না কমেছে?

আবূ সুফিয়ান : ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে।

কাইসার : তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন এমন কোন ঘটনা কি তোমরা জানতে পেরেছ?

আবূ সুফিয়ান : না।

কাইসার : তিনি কখনো নিজের ওয়াদা বা চুক্তি ভঙ্গ করেছেন কিনা?

আবূ সুফিয়ান : এখনো পর্যন্ত তো ভঙ্গ করেননি, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলা যেতে পারে না।

কাইসার : তিনি মানুষকে কী শিক্ষা প্রদান করেন?

আবূ সুফিয়ান : তিনি বলেন, এক আল্লাহ্‌র। ইবাদত কর। নামায পড়, পাপ কাজ থেকে দূরে থাক, সত্য কথা বল, আত্মীয়-পরিজনদের হক আদায় করা ইত্যাদি।

আপনারাই এবার চিন্তা করুন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ব্যতীত অন্য কোথাও কি এমন নাজুক অবস্থায় এমন সাক্ষী পাওয়া যেতে পারে? জগতে তাঁর মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে!

www.nagorikpathagar.org

এরপর আর একটি বিষয়ের দিকে আপনাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই। যাঁরা প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান এনেছেন, তাঁরা নদী-তীরের মৎস্যজীবী ছিলেন না, তাঁরা মিসরের পরাধীন ও গোলাম জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না; বরং তাঁরা ছিলেন একটি আযাদ জাতির লোক। সে জাতি ছিল বুদ্ধি এবং জ্ঞানের প্রাধান্যে সুপরিচিত ও তারা কখনো সৃষ্টির শুরু থেকে সে সময় পর্যন্ত কারো আনুগত্য করেনি। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ইরান সিরিয়া, মিসর ও এশিয়া মাইনর পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত। তাদের মাঝে এমন লোকও ছিলেন, যাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি, গভীর জ্ঞান, বুদ্ধি মেধার প্রমাণ বিভিন্ন আকারে আজও আমাদের সামনেই আলোচনায় বর্তমান আছে। তাদের মাঝে এমন লোকও আছেন, যারা বিরাট বিরাট সেনাবাহিনীর মুকাবিলা করে বিজয় লাভ করেছেন এবং দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতর সেনাপতিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তাদের মাঝে এমন লোকও ছিলেন, যাঁরা বিরাট দেশে শাসন চালিয়েছেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাহলে এক মুহূর্তের জন্য কি কেউ একথা বিশ্বাস করতে পারে যে, এমন শক্তিশালী, এমন যোগ্যতাসম্পন্ন ও এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের দৃষ্টি থেকে কখনো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন অবস্থা আড়ালে থাকতে পারে? বরং তাঁরাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কাজ অনুসরণ করে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের অনুসৃতিকে নিজেদের ক্ষেত্রে বিরাট সৌভাগ্য মনে করেছেন। এটিও তাঁর মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতার এক প্রধানতম অকাট্য দলীল বলা যায়।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন অবস্থা ও জীবনের কোন ঘটনা কখনো পর্দান্তরালে রাখার চেষ্টা করেননি। তিনি যেভাবে জীবনযাপন করেছেন তা সবার কাছে প্রকাশিত ও পরিচিত ছিল এবং আজও আছে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু নয় বছর তাঁর সাথে বসবাস করেছেন। তিনি বলেন : 'যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর মধ্য থেকে কিছু লুকিয়ে রেখেছেন এবং মানুষের কাছে তা প্রকাশ করেননি, তাকে সত্যবাদী মনে করবে না।' (বুখারী, তফসীর নিচের আয়াত)

www.nagorikpathagar.org

কেননা আল্লাহ বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔

অর্থাৎ 'হে নবী! আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। যদি তুমি এরূপ না কর, তাহলে তুমি, তাঁর (নবুয়তের) হক আদায় করলে না।' (সূরা মায়িদা, আয়াত-৬৭)

কোন ব্যক্তিই জগতে তাঁর সামান্যতম দুর্বলতার কথাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে চায় না। বিশেষ করে যে কোন একটি দলের নেতৃত্ব এবং তাও আবার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দান করেন তিনি কখনো এ কাজে ব্রতী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহ্যিক ছোট-খাট ভুলত্রুটির জন্য তাঁকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এর পরেও কুরআনের প্রতিটি আয়াত তিনি লোকদেরকে শুনিয়েছেন। লোকেরা সেগুলো মুখস্থ করে নিয়েছেন। সেগুলো প্রত্যেকটি মুসজিদে ও মেহরাবে আবৃত্তি হয়েছে। আজও যেখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম পরিচিত, সেখানে তাঁর অনুসারীগণের মুখে সেগুলোও উচ্চারিত হচ্ছে। অথচ এ সাধারণ ভুলগুলোর উল্লেখ যদি কোরআনে না হত, তাহলে আজ জগতে এগুলোর কথা অজানাই থেকে যেত। কিন্তু একটি পবিত্র জীবনের প্রত্যেকটি বস্তুরই প্রকাশ দিবালোকে আসার প্রয়োজন ছিল এবং তাই হয়েছেও।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজ পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা আরবের অজ্ঞদের কাছে আপত্তিকর এক বিষয় ছিল। কোরআনে এ ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন : যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র কোন আয়াত লুকিয়ে রাখতে পারতেন, তাহলে এ আয়াতটিকে অবশ্যই লুকিয়ে রাখতেন (যে আয়াতে বিয়ের উল্লেখ আছে-(মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা)। এর ফলে অজ্ঞ লোকদের অনর্থক প্রশ্ন তোলার কোন সুযোগই হতো না। কিন্তু এমন পন্থা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করেননি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের কোন অংশও অজানা নেই বা ছিল না।

বসওয়ার্থ স্মিথ কি চমৎকারভাবেই বলেছেন : 'এখানে সবকিছুই উজ্জ্বল দিনের আলোর মত সুস্পষ্ট। এ আলোক প্রতিটি বস্তুর ওপর পড়ে প্রতিটি বস্তু পর্যন্ত তা পৌঁছতে পারে। মূলতঃ ব্যক্তি জীবনের গভীরতম দিকগুলো চিরকালই আমাদের দৃষ্টির বাইরে থাকবে। কিন্তু আমরা মুহাম্মদের বাহ্যিক জীবনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জানি। তাঁর যৌবন, তাঁর নবুয়তের প্রকাশ, মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক, তাঁর অভ্যাস, তাঁর প্রাথমিক চিন্তাধারা এবং এর ক্রমিক উন্নতি, তাঁর ওপর মহান ওহীর পর্যায়ক্রমিক অবতরণ, তাঁর ভেতরের জীবনের জন্য তাঁর ক্ষেত্রে ঘোষিত হবার পরবর্তীকালের একখানা কিতাব (কুরআন) আমাদের কাছে রয়েছে। এ গ্রন্থটি নিজের মৌলিকত্বের ব্যাপারে, সংরক্ষিত থাকার ও অবিন্যস্ত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। এ গ্রন্থের মাঝে আলোচিত বিষয়বস্তুর সত্যতার প্রশ্নে কখনো কোন ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ করতে পারেনি। যদি এমন কোন গ্রন্থ আমাদের কাছে থাকে, যার মাঝে যামানার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির সত্ত্বা রূপ লাভ করেছে, তাহলে তা হচ্ছে এ মহাগ্রন্থ আল-কোরআন যা, সাধারণভাবে কৃত্রিমতা মুক্ত, অবিন্যস্ত, বৈপরীত্যসম্পন্ন, ক্লান্তিকর অথচ বিরাট ও মহৎ চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ। এর মাঝে আবদ্ধ আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ একটি চিন্তাশীল মগজ আল্লাহ প্রেমে বিভোর। কিন্তু তার সাথে মানবিক দুর্বলতারও যোগ হয়েছে। এ দুর্বলতা থেকে মুক্ত হবার দাবি তিনি কখনো করেননি এবং এটি হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠত্ব যে, তা থেকে মুক্ত হবার দাবি করেননি।' (পৃষ্ঠা ১৫)

ঐতিহাসিক গীবনের ভাষায় 'প্রথম যুগের কোন নবীর সত্যতার এমন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি, যেমন মুহাম্মদ উত্তীর্ণ হয়েছেন। সর্বপ্রথম এমন সব লোকের সামনে নিজেকে নবী হিসেবে উত্থাপন করেছিলেন, মানুষ হিসেবে তাঁর যাবতীয় দুর্বলতা সম্পর্কে জানা ছিল। যারা তাঁকে সবচেয় বেশি

www.nagorikpathagar.org

জেনেছেন, স্ত্রী, গোলাম, চাচাতো ভাই, সবচেয়ে পুরাতন বন্ধু-যাঁর সম্পর্কে মুহাম্মদ নিজেই বলেছেন যে, একমাত্র সে বন্ধুই কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি এবং কখনো শঙ্কিত হয়নি– এসব লোকই সর্বপ্রথম অনুসারী হয়েছেন। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে নবীগণের ভাগ্যে যা ঘটে থাকে, মুহাম্মদ এর ক্ষেত্রে হয়েছে এর ঠিক বিপরীত। যারা তাঁকে জানেনা, তারা ব্যতীত অন্যদের কাছে অখ্যাত ছিলেন না তিনি।'

এ কথাগুলো উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে এটাই যে, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা যত বেশি জেনেছিলেন, তিনি তাঁর প্রতি ততই শ্রদ্ধা ও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সাধারণ নবীগণের ক্ষেত্রে এ নিয়ম ছিল না। সর্বপ্রথম অপরিচিত লোকেরাই তাঁদের ওপর ঈমান এনেছে। এরপর তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা এগিয়ে এসেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। তাঁকে সর্বপ্রথম তাঁরাই মেনে নিয়েছেন যাঁরা তাঁর অবস্থা, চরিত্র ও অভ্যাসসমূহ সম্পর্কে সর্বাধিক জানা ছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকেই নিজেদের ঈমান এবং আকিদার কঠোর পরীক্ষায় সফল হয়েছেন।

হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু তিন বছর পর্যন্ত 'শিআবে আবু তালিব' উপত্যকায় অবরুদ্ধ ছিলেন। সেখানে তাঁকে ক্ষুধা, অনাহার ও অর্ধাহারের জীবন অতিক্রান্ত করতে হয়েছে। যখন চারদিক থেকে শত্রুরা পশ্চাদ্ধাবন করছিল তখন রাতের অন্ধকারের হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ভীষণ বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে তাঁর সহযাত্রী হন। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু এমন বিছানায় শোয়ে রয়েছেন, যা পরদিন সকালে রক্তরঞ্জিত হওয়ার কথা ছিল। হযরত যায়েদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু এমন ক্রীতদাস ছিলেন, যিনি পিতার সন্ধান পাবার পর তাঁর অত্যধিক পীড়াপীড়ির পরও আধ্যাত্মিক পিতাকে ত্যাগ করতে সম্মত হননি।

www.nagorikpathagar.org

ক্যাডফ্রে হেগেল্স 'এ্যাপল : জি ফর মুহাম্মদ'-এ বলেছেন : যদি 'খ্রিষ্টানরা একথা মনে রাখে, তাহলে অত্যন্ত ভালই হবে যে, মুহাম্মদ এর পয়গাম বা নির্দেশনা তাঁর অনুসারীদের মনে এমন নেশার সৃষ্টি করেছিল, যা যীশুর প্রথম যুগের অনুসারীদের মধ্যে সন্ধান করা অর্থহীন। যখন যীশুকে শূলদণ্ডের ওপর চড়ান হয়, তখন তাঁর অনুগামীরা পালিয়ে যায়। তাদের ধর্মীয় নেশা কেটে গিয়েছিল এবং নিজেদের শ্রদ্ধেয় নেতাকে মৃত্যুর কবলে শৃঙ্খলিত অবস্থায় রেখে তারা সরে যায়। অন্যদিকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীরা তাঁদের মজলুম নবীর চারদিকে একত্র হয়, তারা নিরাপত্তার জন্য নিজেদের জানমাল বিপদের মুখে নিক্ষেপ করে তাঁকে শত্রুদের ওপর বিজয়ী করেছেন।' (উর্দু অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭, ১৮৭৩ সনে বেরিলীতে মুদ্রিত)

যখন ওহুদ যুদ্ধে করাইশ-সেনারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আক্রমণ করে এবং মুসলমানদের সারিগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তখন তিনি বলেন : 'কে আমার জন্য প্রাণ দেবে?' এ কথা শোনার সাথে সাথেই সাতজন আনসার বের হয়ে আসেন এবং তাঁদের প্রত্যেকে প্রাণপণ জেহাদ করে করে শাহাদতবরণ করেন। এক আনসারী মহিলার পিতা, ভাই ও স্বামীর ন্যায় প্রিয়জন এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। পর পর এ তিনটি হৃদয় বিদারক সংবাদ শুনেছেন; কিন্তু প্রতিবারই তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, 'আমার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? লোকেরা বলে, 'নিরাপদেই আছেন।' আনসারী মহিলা কাছে এসে তাঁর পবিত্র চেহারা দেখে বলেন :

كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعْدَكَ ذَامِلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ۔

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নিরাপদ হলে সকল বিপদই তুচ্ছ।

প্রিয় বন্ধুগণ! এ ভালবাসা, এ প্রেম, এ প্রাণ উৎসর্গের প্রেরণা তাঁদের মাঝে ছিল যাঁরা তাঁকে সর্বতোভাবে জেনেছেন। এমন কোন ব্যক্তি যার সঙ্গীদের দৃষ্টিতে তাঁর মাঝে মানবিক গুণাবলী পরিপূর্ণতা অর্জন করেনি, তাঁর জন্য

www.nagorikpathagar.org

সাথীরা কি এভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে? এর চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটাই যে, ইসলাম তার নবীর জীবনকে তাঁর অনুসারীদের জন্য আদর্শে পরিণত করেছে এবং তাঁর অনুসরণকে আল্লাহর ভালবাসার মাধ্যমে পরিণত করেছে। যেমন আল্লাহর নির্দেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ۔

"যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন।" (সূরা ইমরান, আয়াত : ৩১)

তাঁর আনুগত্য ও জীবনের অনুস্মৃতিকে আল্লাহর ভালবাসার মানদণ্ডে পরিণত করা হয়েছে। দ্বীনের নেশায় এক মুহূর্তের জন্য বিভোর হয়ে প্রাণ উৎসর্গ করা সহজ। কিন্তু সারা জীবন প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রতিটি অবস্থায় তাঁর অনুসৃতির পুলসিরাত এমনভাবে অতিক্রম করা- যেন কোন পদক্ষেপেই সুন্নাতে মুহাম্মদী থেকে সামান্য পরিমাণও এদিক-ওদিক না হতে পারে– বড়ই কঠিন পরীক্ষা। এ অনুসৃতির পরীক্ষায় সকল সাহাবা পূর্ণ সাফল্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং এ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই সাহাবা, তাবে'ঈন, তাবেই-তাবে'ঈন, মুহাদ্দিসগণ, ঐতিহাসিক এবং নবীচরিত রচয়িতাগণ তাঁর প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি বিষয় ও প্রতিটি কাজ সম্পর্কে জানা এবং ভবিষ্যত বংশধরদের জানানো নিজেদের একান্ত কর্তব্য মনে করেছেন, যেন প্রত্যেক মুসলমান সে অনুসারে চলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীগণের দৃষ্টিতে তাঁর জীবনে মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটেছিল। এজন্যই তো তাঁরা তার অনুগমনকে পরিপূর্ণ মানবিকতার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে তাঁর জীবন মুসলমানদের জন্য পরিপূর্ণ আদর্শ। তাই এ আদর্শের সকল দিক প্রত্যেকের সামনে থাকা উচিত এবং অবশ্যই তা সবার সামনে রয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, তাঁর জীবনের কোন একটি

www.nagorikpathagar.org

বিষয়ও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। কোন একটি ঘটনাও পর্দার আড়ালে নেই। ইতিহাসের পাতায় তাঁর জীবনের সবকিছুই লিখা রয়েছে। কোন একটি জীবনের পরিপূর্ণতা, নিস্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হওয়ার ওপর বিশ্বাস করার এটিই একমাত্র প্রধান মাধ্যম। তাছাড়া যে জীবনের প্রত্যেকটি দিক এমনিভাবে উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল থাকে, একমাত্র সে জীবনটিই মানুষের জন্য আদর্শের উজ্জ্বল প্রতীক রূপে চিহ্নিত হতে পারে।

জগতের বুকে ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া, ভারতবর্ষ, চীন, মিসর, সিরিয়া, গ্রীস ও রোমে বিরাট বিরাট শক্তিশালী সভ্যতার জন্ম হয়েছে; নৈতিকতা সম্পর্কে চমৎকার মতবাদের প্রচলন হয়েছে; সংস্কৃতির উন্নততর নীতি নির্ধারিত হয়েছে; ওঠা-বসা, পানাহার, মেলামেশা, পরিধান, বসবাস, শয়ন-জাগরণ, বিবাহ, জীবন-মৃত্যু, দুঃখ-আনন্দ, আমন্ত্রণ, সাক্ষাৎ, মুসাফাহা, সালাম, গোসল, পবিত্রতা অর্জন, রোগীর সেবা, শোক প্রকাশ, অভিনন্দন ও মুবারকবাদ জানানো, কাফন-দাফন ইত্যাদির অনেক নিয়ম-কানুন, শর্ত ও নির্দেশ প্রণীত হয়েছে এবং এ সবের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সামাজিকতার নীতি নির্ধারিত হয়েছে। শত শত বছরে এ সব নির্ণীত হয়েছে এবং এরপরও এগুলো বিকৃত হয়েছে। এগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দীর প্রচেষ্টা-সাধনায় সমাজে স্থান লাভ করে, তবুও এগুলো বিলুপ্ত হয়েই যাচ্ছে। ইসলামের এ সভ্যতা-সংস্কৃতি কিন্তু মাত্র কয়েক বছরেই বিকাশ লাভ করেছে এবং সুগঠিত হয়েছে। এরপর এক হাজার চারশত বছর থেকে সারা পৃথিবীতে শত শত জাতির মধ্যে একই ধারায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কেননা এর উৎস একটি মাত্র এবং তা হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন। সাহাবীগণ নিজেদের এ জীবন-মুকুরে জীবনকে প্রতিফলিত করেছেন এবং তার প্রতিফলন হয়েছে পরবর্তী সময়ে তাবেঈগণের জীবনে। এভাবে তা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে রীতি-প্রকৃতি ও কাজে পরিণত হয়েছে। এ পবিত্র জীবনটি ছিল কেন্দ্রবিন্দু, সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে রেখায় এবং পরবর্তীগণ তাঁকে বৃত্তে পরিণত করেছেন। যদিও এ সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ প্রতিফল আজ পরিদৃশ্য নয়, তবুও এর পদচিহ্ন

www.nagorikpathagar.org

তখনো বিরাজমান এবং তারই অনুসরণে জগতের সমস্ত মুসলমান প্রভাবিত হচ্ছে। যা একদিন ছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন– তাই সমস্ত সাহাবার জীবনধারায় পরিণত হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে তা সারা মুসলিম বিশ্বে জীবনধারার রূপ পরিগ্রহ করেছে। আজও সে পরিপূর্ণ চিত্র আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। আফ্রিকা বা ভারতবর্ষের কোন গোত্র যখন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে তখন তাদেরকে ধর্মের প্রশিক্ষণ ইঞ্জিল থেকে প্রদান করা হলেও সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কর্মজীবনের শিক্ষাদান করা হয় ইউরোপে সৃষ্ট সভ্যতাসমূহের ভিত্তিতে।

কিন্তু যখন জগতের অসভ্য ও বর্বর জাতি মুসলমান হয় তখন তারা যেখান থেকে ধর্মলাভ করে সেখান থেকেই সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সামাজিকতা শিক্ষা ও মুসলমান হবার পর ইসলামে নবীর সারাজীবন মানবিক প্রয়োজন ও অবস্থাসহ তাদের সামনে উপস্থাপন হয় এবং এ সক্রিয়, জীবন্ত ও জাগ্রত চিত্র প্রত্যেক মুসলমানের জীবনের প্রতিটি কাজ ও স্পন্দনে আয়নায় পরিণত হয়ে যায়। একজন সাহাবীকে এক ইহুদী ব্যঙ্গ করে বলে : তোমাদের নবী তোমাদেরকে প্রত্যেকটি বস্তুর শিক্ষাদান করেন এবং মামুলি কথাও বলেন, তখন সাহাবী বলেছিলেন : 'অবশ্যই আমাদের নবী প্রত্যেকটি বস্তুর শিক্ষাদান করেন আমাদেরকে। এমনকি তিনি আমাদেরকে ইস্তিঞ্জা ও হাত প্রক্ষালনের শিক্ষাও দেন।' আমরাও আজ সে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষামূলক জীবনকে জগতে উপস্থাপন করি। অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন যেন পৃথিবীর গৃহ-মুকুর। এর মধ্যে নিজের দেহ-আত্মা, ভেতরে-বাইর, কথা-কাজ, কণ্ঠ-হৃদয়, রসম-রেওয়াজ, নিয়ম-পদ্ধতি, চাল-চলন ইত্যাদির প্রতিফলন লক্ষ্য করে প্রত্যেকে সেগুলোর সংস্কার ও সংশোধনের উদ্যোগী হতে পারে। এজন্যই মুসলিম জাতি নিজের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সামাজিকতা ও নৈতিকতার জন্য তার ধর্মের এবং তার রাসূলের জীবনের বাইরে থেকে পৃথক কোন কিছু গ্রহণ করতে চায় না। আর চাওয়ার কোন প্রয়োজনও হয় না। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও চরিত্র মুসলিম জগতের জন্য

www.nagorikpathagar.org

এক বিশ্বমুকুর। এর সামনে দাঁড়ালে ভালমন্দ এবং সুন্দর-অসুন্দরের রহস্য সকলের কাছে উদ্ভাসিত হয়।

কেননা, এরূপ ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতার সাথে কোন পরিপূর্ণ মানুষের জীবন বিশ্বে বিদ্যমান নেই, এজন্য সমগ্র মানবজাতির জন্য এটিই একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ এবং এমন জীবনই পরিপূর্ণ এবং আবরণহীন মানবজাতির জন্য আদর্শের প্রতীক হওয়ার একান্তভাবেই উপযোগী।[১]

وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

আল্লাহ্ তা'আলা নবীজীর প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন!

✉✉✉

[১]. রাসূলুল্লাহ # জীবনচরিত অধ্যায়ে এ শিক্ষাই আমাদের অর্জিত হয় তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামে সাধরণ এবং কঠিনতম পরিস্থিতিতে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রেরণা সঞ্চারিত হবে আর হৃদয় মনে সে মহান ব্যক্তির প্রতিটি কাজের ধারা অনুসারে ভক্তি ও ভালবাসার জন্ম নেবে, যিনি মানবতার সর্বপেক্ষা বড় সেবক ছিলেন এবং যিনি সবচেয়ে বড় উপকার সাধন করেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে হৃদয় আপ্লুত হবে এবং গভীর ভালবাসায় মন ভরে ওঠবে। ইসলাম এটাই কামনা করে। রাসূল (সাঃ)-এর জীবনচরিতের আলোকে আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে কোরআন, হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে যেসব কঠিনতম পরিবেশ-পরিস্থিতি, বিপদ, মসিবত, বাধা-বিপত্তি, আঘাত আক্রমণ একজন সত্যিকার মু'মিনের জীবনে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি তা আমাদের জীবনে না আসে তাহলে আমাদের চলার পথ এবং তার গন্তব্য সঠিক আছে কি পুনর্বিবেচনা করতে হবে। আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে আমরা যাকে ইসলামের পথ মনে করছি তা কুফর ও জাহিলিয়াতের পথ তো নয়। (সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত)

www.nagorikpathagar.org

# ৫. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতেই ইসলামের সর্বজনীনতা

প্রিয় বন্ধুগণ! আল্লাহর ভালবাসার যোগ্য ও তাঁর প্রিয়পাত্র হবার জন্য প্রত্যেক ধর্মে একটি মাত্র পথের নির্দেশনা রয়েছে। তা হচ্ছে সে ধর্মের প্রর্বতক যেসব উত্তম উপদেশ দান করেন, সেগুলোকে মেনে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করা। কিন্তু ইসলামে এর চেয়েও সুচিন্তিত ও উত্তম পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ইসলাম তাঁন নবীর বাস্তব কর্মজীবন সবার সামনে উপস্থাপন করেছে এবং সে কর্ম জীবনের অনুকরণ এবং আনুগত্যকে আল্লাহ্‌র ভালবাসার যোগ্য ও তাঁর প্রিয়পাত্র হবার উপায় হিসেবে তুলে ধরেছে। ইসলামের আছে দুটি বস্তু : কুরআন এবং সুন্নাহ। কুরআন অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশাবলী, যা কুরআন মজীদের দ্বারা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আর সুন্নাতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পথ। এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে পথের ওপর দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, সে পথ। অর্থাৎ তাঁর বাস্তব কর্মজীবন, যার চিত্র আমরা শব্দের আবরণে হাদীসসমূহে পেয়ে থাকি। এজন্য একজন মুসলমানের সাফল্য ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে যে বস্তুটির একান্ত প্রয়োজন, তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত বা আদর্শ অনুসরণ।

যেসব লোক কোন ধর্মের আওতায় প্রবেশ করে তাদের সকলেরই মানবজাতির কোন এক বিশেষ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়া অসম্ভব। কর্মের বৈষম্যের মাধ্যমেই এ জগতে সমাজ জীবনের বুনিয়াদ গড়ে ওঠেছে। কেননা পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বিভিন্ন বৃত্তি ও কর্মের মাধ্যমেই বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে। এখানে রাজা-বাদশাহ বা জননায়কের প্রয়োজন যেমন আছে তেমনি অধীনস্থ জনগোষ্ঠী এবং প্রজার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা মোকাবেলায় জন্য বিচারক ও জজের প্রয়োজন যেমন অপরিহার্য- তেমনি সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং অফিসারদের



www.nagorikpathagar.org

প্রয়োজনও রয়েছে। এখানে ধনী আছে আবার গরীবও আছে, রাতের ইবাদতকারীও কৃচ্ছ্রতাসাধনকারীও। আবার দীনের মুজাহিদ এবং সৈনিকও। সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, ব্যবসায়ী-বণিক, নেতা এবং জননায়কও রয়েছে।

মোটকথা, এ জগতে আইন-শৃঙ্খলা এ সকল শ্রেণির অস্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠায় নির্ভরশীল। এজন্য এসব শ্রেণি তাদের নিজেদের জীবনের জন্য বাস্তব আদর্শের মুখাপেক্ষী। ইসলাম জগতের সকল মানুষকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসৃতি এবং আনুগত্যের আহ্বান জানায়। এর অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন মানবশ্রেণীর জন্য নবীর বাস্তব কর্মজীবনের মধ্যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রয়েছে। ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই প্রমাণ হয় যে, ব্যাপকতা ও সর্বজনীনতা ইসলামের নবীর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ মানব জাতির সকল গোষ্ঠী ও শ্রেণির জন্য অধীনের জীবন এবং অধীনের জন্য শাসকের জীবন, আবার ধনীর জন্য গরীবের জীবন এবং গরীবের জন্য শাসকের জীবন, পূর্ণাঙ্গ আদর্শ এবং দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হতে পারেনা। এজন্য এমন একজন বিশ্বজনীন ও স্থায়ী নবীর জীবনের প্রয়োজন, যেখানে সে সমস্ত বিভিন্ন দৃশ্যাবলীর সমাবেশ ঘটেছে! শ্রেণিগত দিক ছাড়া খোদ ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন মুহূর্তের বিভিন্ন কর্মের সর্বজনীনতা লক্ষ্য করার মত! আমরা চলাফেরা, ওঠা-বসা, খাওয়া-পরা, লেন-দেন, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি করে থাকি। আমরা মারি এবং মার খেয়ে থাকি, নিজে খাই আবার অন্যকে খাওয়াই, উপকার করি এবং উপকার গ্রহণ করি, প্রাণ দান করি, আবার প্রাণ রক্ষা করি, ইবাদত এবং দোয়া করি-আবার ব্যবসা-বাণিজ্যও পরিচালনা করি, আমরা মেহমান হই, আবার মেহমানদারীও করি। আমাদের দেহের কর্মের সাথে জড়িত এ সমস্ত বিভিন্ন নতুন অবস্থায় নতুন পথ-নির্দেশ এবং নতুন নেতৃত্বদানের আমাদের শিক্ষা প্রদান করবে।

মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট এসব কার্যাবলীর পর হৃদয় ও মস্তিষ্কের সাথে বহু কর্মও জড়িত। এগুলোকে আমরা মানসিক কর্ম বা প্রেরণা ও অনুভূতি বলে চিহ্নিত করি। প্রায় প্রতি মুহূর্তে একটি নতুন মানসিক কর্ম বা প্রেরণা অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হই। আমরা কখনো সন্তুষ্ট আবার কখনো অসন্তুষ্ট হয়ে থাকি। কখনো আনন্দিত কখনো দুঃখিত হই।

www.nagorikpathagar.org

কখনো বিপদের মুখোমুখি হই আবার কখনো সুখ-শান্তিতে থাকি, কখনো ব্যর্থতার মুখোমুখি হই আবার কখনো সাফল্যও লাভ করি। এসব অবস্থায় আমরা নানা ধরনের প্রেরণা এবং আবেগের অধীনে থাকি। উন্নতর নৈতিক চরিত্র অধিক মাত্রায় নির্ভর করে সে সমস্ত প্রেরণা, আবেগ ও অনুভূতির ভারসাম্য রক্ষা ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। এজন্য এসবের জন্য আমাদের একটি বাস্তব জীবনের প্রয়োজন। তার হাতে থাকবে আমাদের সে সমস্ত অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহী ও চপল শক্তিসমূহের লাগাম। সে আমাদের আত্মার ভারসাম্যহীন শক্তিসমূহকে সে পথে নিয়ে যাবে, যে পথে একদিন মদীনার নিষ্কলুষ মানবাত্মার সমাবেশে পরিণত হয়েছিল।

হিম্মত, দৃঢ়তা, সাহস, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, নির্ভরতা, ভাগ্যের ওপর সন্তুষ্টি, বিপদ সহ্য করা, ত্যাগ, অল্পে তুষ্টি, স্বাবলম্বিতা, কুরবানি, দানশীলতা, নম্রতা, উন্নতি ও অনুন্নতি এবং ছোট ও বড় সব রকমের নৈতিক বৃত্তি বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় বা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় বিরাজ করে। এগুলোর জন্য আমাদের বাস্তব নির্দেশ ও দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তা কোথায় পাওয়া যেতে পারে। তা একমাত্র হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই পাওয়া সম্ভব হতে পারে। হযরত মূসা (আ)-এর কাছে থেকে আমরা দুরন্ত সাহসিকতার দৃষ্টান্তমূলক অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি। কিন্তু সেক্ষেত্রে কোমল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত লাভ করতে পারি না। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে কোমল ব্যবহারের অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর জীবনচরিতে কর্ম-তৎপরতা ও রক্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী শক্তি অনুপস্থিত। আর এ উভয় ধরনের শক্তির ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানই মানুষের প্রয়োজন। তাই পৃথিবীতে এ উভয় শক্তির ব্যাপক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেই পাওয়া সম্ভব এবং জোর দিয়ে বলা যায়।

মানবসমাজে যে ব্যক্তি-চরিত্রে সকল গোষ্ঠী শ্রেণির বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রার প্রতিফলন ঘটেছে এবং যেখানে সকল বিষয়ে সঠিক মনোভাব ও পূর্ণাঙ্গ নৈতিকতার সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, তা হচ্ছে একমাত্র হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ। যদি তুমি

www.nagorikpathagar.org

ধনী হয়ে থাক, তাহলে মক্কার ব্যবসায়ী ও বাহরাইনের অর্থশালীর অনুগামী হও। যদি তুমি গরিব হয়ে থাক, তাহলে আবূ তালেব গিরিসঙ্কটের কয়েদি ও মদীনার প্রবাসীর অবস্থা শোন। যদি তুমি বাদশাহ হয়ে থাক, তাহলে কুরাইশদের অধিপতিকে এক নজর দেখ। যদি বিজয়ী হয়ে থাক, তাহলে বদর এবং হুনায়নের সিপাহসালারের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যদি তুমি পরাজিত হয়ে থাক, তাহলে ওহুদ যুদ্ধ থেকে শিক্ষা নাও। যদি তুমি শিক্ষক হও, তাহলে 'সুফফা'র শিক্ষালয়ের মহান শিক্ষকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যদি ছাত্র হয়ে থাক, তাহলে জিব্‌রাঈল (আ) সামনে উপবেশনকারীর দিকে তাকিয়ে দেখ। যদি বক্তৃতা ও উপদেশদানকারী হয়ে থাক, তাহলে মদীনার মসজিদে মিম্বরের ওপর দাঁড়ানো ব্যক্তির কথা শোন। যদি তুমি নিঃসঙ্গ ও অসহায় অবস্থায় সত্যের প্রতি আহবানকারীর দায়িত্ব পালন করতে চাও, তাহলে মক্কার সহায়-সম্বলহীন নবীর আদর্শ তোমার জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ কাজ করবে। যদি তুমি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে শত্রুদের পরাজিত এবং বিরোধীদের দুর্বল করতে সক্ষম হয়ে থাক, তাহলে মক্কাবিজয়ীর অবস্থার দিকে তাকাও। যদি তুমি নিজের ব্যবসা এবং পার্থিব বিষয়াবলীর ব্যবস্থাপনা ঠিক করতে চাও, তাহলে বনী নাযীর, খয়বর ও ফিদাকের ভূ-সম্পত্তির মালিকের কাজ-কারবার এবং ব্যবস্থাপনা দেখে নাও। যদি ইয়াতিম হয়ে থাক, তাহলে আবদুল্লাহ এবং আমিনার কলিজার টুকরার দিকে লক্ষ্য কর। যদি শিশু হয়ে থাক, তাহলে হালিমা সা'ঈদার আদরের সন্তানকে দেখ। যদি যুবক হয়ে থাক, তাহলে মক্কার মেষপালকের জীবনী পাঠ কর। যদি ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী হয়ে থাক, তাহলে বসরা সফরকারী দলের অধিনায়কের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। যদি আদালতের বিচারক ও পঞ্চায়েতের বিবাদ মীমাংসাকারী হয়ে থাক, তাহলে কাবাঘরে সূর্যকিরণ প্রবেশের পূর্বে প্রবেশকারী এবং 'হাজরে আসওয়াদকে' পুনস্থাপনজনিত বিবাদ মীমাংসাকারীকে দেখে নাও। মদীনার কাঁচা মসজিদের বারান্দায় উপবেশনকারী বিচারকের দিকে দৃষ্টিপাত কর, যাঁর দৃষ্টিতে বাদশাহ-ফকীর, আমীর-গরীব সকলেই ছিল সমান।

যদি তুমি স্বামী হয়ে থাক তাহলে খাদীজা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ও আয়েশা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-এর মহান স্বামীর পবিত্র জীবন পাঠ কর। যদি তুমি সন্তানের পিতা হয়ে থাক, তাহলে ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

তা'আলা আনহুর পিতা এবং হাসান হোসাইনের নানার অবস্থা জিজ্ঞেস কর। আর তুমি যা-ই হও না কেন এবং যে অবস্থায়ই থাক না কেন, তোমার জীবনের জন্য আদর্শ, তোমার চরিত্র সংশোধনের উপকরণ, তোমার অন্ধকার ঘরের আলোকবর্তিকা এবং পথ নির্দেশক মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপক জীবনাদর্শের মধ্যে সর্বক্ষণ ও প্রতি মুহূর্তে পাওয়া সম্ভব। তাই ঈমানী আলোকবর্তিকার অনুসন্ধানরত প্রতিটি মানুষের জন্য একমাত্র মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনই একমাত্র হিদায়াতের উৎস ও নাজাত লাভের উপায় উপকরণ। তার সামনে আছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন, আবার নূহ আলাইহিস সালাম, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, আইয়ূব (আ), মূসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনও তার সামনে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। কিন্তু অন্য সকল নবীর জীবন যেন এমন কতকগুলো দোকান, যেখানে একটি মাত্র পণ্য পাওয়া যায় আর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত পার্থিব বৃহত্তম বিপণীর মত যেখানে প্রত্যেক বস্তুর ক্রেতা ও প্রত্যেকটি জিনিস অনুসন্ধানকারীর জন্য সর্বোত্তম উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে।

আজ থেকে[১] ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে পাটনার বিখ্যাত বাগ্মী মরহুম মাস্টার হাসান আলী 'নূর ইসলাম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তাতে তিনি তাঁর এক শিক্ষিত হিন্দু বন্ধুর স্বচ্ছ চিন্তা-চেতনামূলক মতামত উল্লেখ করেছিলেন। তাতে বলা হয় : একদিন এ হিন্দু-বন্ধুটি মাস্টার সাহেবকে বলেন, 'আমি আপনাদের নবীকে সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও আদর্শ মানুষ হিসেবে মনে করি।' তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমাদের নবীর তুলনায় আপনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে কীরূপ মনে করেন? জবাবে বলেন, 'মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্র তুলনায় ঈসা (আ)-কে এমন মনে হয়, যেমন কোন মহাজ্ঞানী ব্যক্তির সামনে একটি ছোট্ট শিশু বসে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে।' তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনি কেন ইসলামের নবীকে জগতে সর্বাধিক পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে চিন্তা-ভাবনা করেন? জবাবে বলেন, তাঁর জীবনে একই সাথে এতগুলো পরস্পর বিরোধী বিচিত্র গুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়,

১. হিসেবটা হবে ১৯২৫ সন থেকে। (সম্পাদক)

www.nagorikpathagar.org

যা ইতিহাসে কখনো একই ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হতে দেখা যায় না। তিনি এমন বাদশাহ একটি দেশ যার পুরোপুরি কর্তৃত্বাধীন। আবার এমনি অসহায় খোদ নিজের ওপর নিজের অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করেন না বরং সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর অধিকারই স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি এমন ধনী, অর্থসম্পদ বহন করে উটের পর উট তাঁর রাজধানীতে প্রবেশ করছে-আবার এমন দরিদ্র মাসের পর মাস তাঁর ঘরের চুলোয় আগুন জ্বলে না, একাদিক্রমে কয়েকদিন তাঁকে অনাহারে দিন কাটাতে হয়েছে। তিনি এমন সিপাহসালার মুষ্টিমেয় প্রায় নিরস্ত্র সৈন্যদল নিয়ে পূর্ণরূপে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত অগণীত সৈন্যের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই লড়ছেন। অন্যদিকে এমন শান্তিপ্রিয় অনুগত প্রাণ উৎসর্গকারী সহচরের উপস্থিতিতেও নির্বিবাদে সন্ধি করছেন। তিনি এমন সাহসী ও বীর অগণিত লোকের বিরুদ্ধে একাকী অবতীর্ণ হন এবং এমন কোমল হৃদয় যিনি নিজ হাতে কখনো মানুষের সামান্যতম রক্ত প্রবাহিত করেননি। তিনি মাটির সাথে সম্পর্ক এতই গভীর যে, আরবের প্রতিটি ধূলিকণার জন্য চিন্তিত, দরিদ্র ও অভাবী মুসলমানদের জন্য চিন্তিত, মানবজাতির জন্য উদ্বিগ্ন। মোটকথা, সমগ্র জগত সম্পর্কে তিনি চিন্তা করেছেন। আবার নিরাশক্তিও এত প্রবল যে নিজের আল্লাহ ব্যতীত সবাইকে ভুলে যান। কখনো ব্যক্তিগত কারণে তিনি নিজের বিরোধীদের কাছে থেকে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। সর্বদা নিজের ব্যক্তিগত শত্রুদের কল্যাণের জন্য সব সময় দোয়া করে তাদের মঙ্গল কামনা করেছেন।

কিন্তু কখনো আল্লাহর দুশমনদের ক্ষমা করেননি এবং সত্যের প্রত্যাখ্যানকারীদের সর্বদা জাহান্নাম এবং আল্লাহর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। তাঁকে একই সময়ে ধারাল অস্ত্রধারী ও রাতে জাগরণকারী চরিত্রে দেখা যায়। তাঁকে যে মুহূর্তে বিপুল পরাক্রমশালী বিজয়ী বলে ধারণা হয়, ঠিক সে সময়ে তিনি নবীসুলভ নিষ্কলুষতার সাথে আমাদের সামনে উপস্থিত হন। আমরা তাঁকে যে মুহূর্তে আরবের কবি বলে উল্লেখ করেছি, ঠিক সে মুহূর্তেই তাঁকে দেখেছি খেজুরের ছোবড়ার বালিশে ভর দিয়ে মোটা চাটাইর ওপর বসা উপদেশ দানকারী রূপে। যেদিন আরবের

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন এলাকা থেকে ধন-দৌলত এসে তাঁর মসজিদের ওঠানে স্তূপীকৃত হয়েছিল, ঠিক সে দিনই দেখা যায় তাঁর ঘরের লোকজন অনাহারী। যে যুগে যুদ্ধবন্দিদেরকে দাস-দাসীরূপে মুসলমানদের ঘরে ঘরে পাঠান হত, ঠিক সে যুগেই তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা.) এসে নিজের হাতের ফোসকা ও বুকের দাগ পিতাকে দেখালেন– যাঁতা পিষতে ও মশক ভরতে ভরতে তাঁর হাত ও বুকে এ সব ফোসকা ও দাগ পড়েছিল। যখন অর্ধ আরব তাঁর কর্তৃত্বাধীন সে সময় একদিন হযরত ওমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু তাঁর দরবারে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নবী ঘরের আসবাবপত্র দেখেছেন। তখন তিনি ছিলেন একটি বিশ্রামরত মোটা দড়ির খাটে। তখন তাঁর পবিত্র শরীরে দড়ির দাগ পড়ে যায়। ঘরের এক কোণে এক মুঠি জোয়ার রাখা আছে। আর একটি খুঁটির গায়ে শুকনা মশক ঝুলছে। বিশ্বজাহানের নেতার ঘরের এ অবস্থা এবং জিনিসপত্র দেখে হযরত ওমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু কেঁদে ফেলেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করছে, কাইসার ও কিস্‌রা আর আপনি নবী হয়ে এ দুরবস্থায় আছেন, এর চেয়ে অধিক দুঃখজনক বিষয় আর কী হতে পারে? জবাবে বলেন 'হে ওমর! তারা পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করবে, আর আমরা লাভ করব আখিরাতের উচ্চ মর্যাদা, এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও?'

আবূ সুফিয়ান ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরম শত্রু। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুর পাশে দাঁড়িয়ে মুসলিম সেনাবাহিনীর বিজয় দেখেছিলেন। নানান রঙের ব্যানার ও পতাকার ছায়াতলে ইসলামের দুর্বার তরঙ্গ ছুটে আসছিল। আরব উপজাতিদের দুরন্ত মিছিল অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। আবূ সুফিয়ানের দৃষ্টি এবারও প্রতারিত হল। হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-কে বললেন : 'আব্বাস! তোমার ভাতিজা এখন বিরাট বাদশাহ হয়ে যাচ্ছে।' হযরত আব্বাসের দৃষ্টি অন্য দৃশ্যের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। বললেন : 'হে আবূ সুফিয়ান, এটা বাদশাহী নয়, নবুয়ত।'

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাস বিখ্যাত হাতেম তাঈর পুত্র ছিলেন আদী ইবনে হাতেম তাঈ এবং গোত্রের প্রধান। তিনি ঈসায়ী ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এক সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। সাহাবায়ে কিরামের ভক্তি ও জিহাদের সাজসরঞ্জাম দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন না যে, হযরত মুহাম্মদ বাদশাহ না অন্য কিছু। হঠাৎ মদীনার একটি দারিদ্র ক্রীতদাস এসে সেখানে দাঁড়ায় এবং বলে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু কথা বলতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, দেখ, মদীনার যেখানেই তুমি আমাকে আহবান করবে সেখানেই দাঁড়িয়ে তোমার কথা শুনব– এ বলে তিনি ওঠে দাঁড়ালেন এবং তার প্রয়োজন পূরণ করলেন। এমন এ বাহ্যিক শান-শওকতের অন্তরালে নম্রতা, কোমলতা এবং উদারতা দেখে হাতেম-পুত্র আদীর চোখের উপর থেকে পর্দা সরে গেল। তিনি মনে মনে চিন্তা করেন– অবশ্যই এটা নবীসুলভ শান-শওকতেরই বহিপ্রকাশ। তখনই তিনি গলা থেকে ক্রুশ নামিয়ে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যে শৃঙ্খল গলায় পরে নিলেন।

মোটকাথা ইতোপূর্বে যা কিছু আমি বলেছি তা নিছক কবিত্ব নয় বরং তা ঐতিহাসিক সত্য। যে পরিপূর্ণ ও সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনে মানুষের সকল শ্রেণির, সকল দলের ও সকল গোষ্ঠীর জন্য পথনির্দেশ, দৃষ্টান্ত ও আদর্শ নমুনা বিদ্যমান আছে, একমাত্র তিনিই এ বিচিত্র ধারা ও পেশায় পরিপূর্ণ জগতের বিশ্বজনীন ও চিরন্তন নেতৃত্বদানে সক্ষম। যে আমাদেরকে রাগ, ক্রোধ, করুণা, দয়া, দানশীলতা, দারিদ্র্য, অভাব, অনাহার, সাহসিকতা, বীরত্ব, কোমলতা, সংসার বুদ্ধি, আল্লাহ্ জ্ঞান এবং ইহ্কাল-প্রকালের উভয়ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ জীবনের মাধ্যমে আলোক প্রদান করেন, তিনি জগতের বাদশাহীর সাথে সাথে আসমানের বাদশাহীর এবং উভয় বাদশাহীর নিয়ম-কানুন কর্মধারায় নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দেন, একমাত্র তিনিই মানবজাতির নেতৃত্বদানের একমাত্র যোগ্য। জগতে সাধারণভাবে ক্ষমা, দয়া, করুণা ও কোমলতাকে মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ

www.nagorikpathagar.org

বিবেচনা করা হয়। বরং এসব গুণাবলীকেই একমাত্র পূর্ণতার উপায় বলে বিবেচনা করা হয়। তাই যে ব্যক্তির চরিত্রে শুধু এ একমুখী গুণের সমাবেশ দেখা যায়, তাঁকেই মানবতার সবচেয়ে বড় শিক্ষক এবং কল্যাণ সাধনকারী মনে করা হয়। কিন্তু এখন বলুন, মানুষের চরিত্রে কি শুধু এ শক্তিগুলোই রয়েছে? অথচ এর বিপরীত শক্তিগুলোরও সেখানে সমাবেশ ঘটেছে। একই মানুষের মধ্যে ক্রোধ, দয়া, ভালবাসা, শত্রুতা, বাসনা, পরিতৃপ্তি, প্রতিশোধ স্পৃহা, ক্ষমা সব রকমের বিপরীত গুণের সমাবেশ দেখা যায়। তাই তিনিই একজন আদর্শ ও পরিপূর্ণ শিক্ষক একমাত্র হতে পারেন, যিনি এ সমস্ত শক্তি ও আবেগের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে এগুলোর যথার্থ প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণে সক্ষম। যে সকল ধর্ম দাবী করে যে, তাদের নবীগণের জীবন শুধু দয়া, করুণা, ক্ষমা ও কোমলতায় পরিপূর্ণ, তাদের অনুসারীরা কি আমাকে বলতে পারেন যে, সামগ্রিকভাবে তারা কতদিন সে নবীগণের জীবনাদর্শ মোতাবেক চলতে পারেন? প্রথম খ্রিষ্টান বাদশাহ কনস্ট্যান্টন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী কত রাজা-বাদশাহইনা রাজত্ব করেছেন এবং কত নতুন নতুন খ্রিষ্টধর্মানুসারী প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু তাদের মাঝে কোন বাদশাহ তাদের নবীর জীবন এবং চরিত্রের অনুসরণ ও আনুগত্যকে তার রাষ্ট্রের আইন বলে ঘোষণা করেছেন কি? তাহলে বাস্তব জগতে যে জীবন ও চরিত্র সকল দিক দিয়ে তার অনুসারীদের জন্য আদর্শ হবার যোগ্যতা রাখে না, তাকে কি করে সর্বগুণের অধিকারী বলা যেতে পারে?

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম-এর জীবন ছিল কুফরীর বিরুদ্ধে অবস্থান। হযরত ইবরাহীমের জীবনচরিত মূর্তি ভাঙ্গার অবস্থা উত্থাপন করে। হযরত মূসা (আ)-এর জীবন কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদ এবং রাজকীয় শাসন-শৃঙ্খলা, সমাজ-বিধান, আইনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করে। হযরত ঈসার জীবন নম্রতা, কোমলতা, উদারতা, ক্ষমা ও পরিতুষ্টির বিস্তারিত শিক্ষায়তন। হযরত সুলায়মানের জীবন রাজকীয় শান-শওকতের, দৃঢ়তা, পরাক্রম এবং শক্তিমত্তায় পরিপূর্ণ। হযরত আইয়ূবের জীবন ধৈর্য ও

www.nagorikpathagar.org

কৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত স্বরূপও আদর্শ। হযরত ইউনুসের জীবন অনুতাপ, লজ্জা, প্রভুর নৈকট্যলাভ ও ভুলের স্বীকারোক্তির প্রকাশ। হযরত ইউসুফের জীবন জেল-জুলুমে এবং হকের দাওয়াত ও সত্য প্রচারের ব্যাপক প্রেরণার শিক্ষা, হযরত দাউদের জীবন কান্নাকাটি, দোয়া এবং আল্লাহর প্রশংসার পরিপূর্ণ কিতাব, হযরত ইয়াকুবের জীবন আশা-আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা এবং আশ্বাসের দৃষ্টান্ত। কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনে ও চরিতে নূহ ও ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা, সুলায়মান ও দাউদ, আইয়ুব ও ইউনুস, ইউসুফ ও ইয়াকুব (আঃ) প্রমুখ নবীগণের সবার জীবনচরিত একত্রিত ও সুসংবদ্ধভাবে বিদ্যমান।

মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী একটি দুর্বল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে বলা হয়েছে– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময় আওয়াজ এল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেশে দেশে ঘুরিয়ে নিয়ে এসো এবং সমুদ্রের তলদেশে নিয়ে যাও, যেন সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর নাম ও নিশানা জানতে চিনতে পারে, জিন-ইনসান, পশু-পাখীসহ প্রত্যেকটি প্রাণীর সামনে তাঁকে নিয়ে যাও। তাকে আদমের ব্যবহার, শীসের তত্ত্বজ্ঞান, নূহের সাহসিকতা, ইবরাহীমের বন্ধুত্ব, ইসমাঈলের বাকশক্তি, ইসহাকের সন্তুষ্টি, সালেহ্র মধুর ভাষণ, লূতের হিকমত, মূসার কঠোরতা, আইয়ুবের সবর, ইউনুসের আনুগত্য, ইউশার জিহাদ, দাউদের কণ্ঠ, দানিয়েলের প্রেম, ইলিয়াসের গাম্ভীর্য, ইয়াহ্ইয়ার চারিত্রিক পবিত্রতা ও ঈসার কৃচ্ছতা সাধনা দান করে সকল নবীগণের চরিত্রের মধ্যে তাঁকে নিমজ্জিত করে দাও। যেসব আলেম এ হাদীসটিকে তাঁদের কিতাবে স্থান দিয়েছেন, তাঁদের একমাত্র প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের নবীর যাবতীয় গুণাবলীকে প্রকাশ করে তাঁর মর্যাদা দান করা। অর্থাৎ অন্যান্য নবীগণকে আলাদাভাবে যা কিছু দান করা হয়েছিল, তা সব একত্রিত করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে একত্র করা হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বিভিন্ন দিকে যদি দৃষ্টিপাত করা যায় তাঁর সে সর্বজনীন ও পরিপূর্ণ গুণাবলীর উজ্জ্বল চিত্র লক্ষ্য করা যায়। যখন মক্কার নবীকে মক্কা থেকে ইয়াসরিবে গমন করতে দেখেন তখন কি আপনারা সে নবীর চিত্র দেখেন না যিনি মিসর থেকে মাদায়েনে হিজরত করেন? হেরা পর্বতের গুহাবাসী এবং সিনাই পর্বতে আল্লাহর নির্দশন প্রত্যক্ষকারীর মধ্যে একদিক দিয়ে কত গভীর সামঞ্জস্য ছিল। এক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে ছিল শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, হযরত মূসার চোখ উম্মিলিত ছিল আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ ছিল মুদিত। হযরত মূসা (আ) দেখেছিলেন বাইরে আর তিনি দেখেছেন ভেতরে। যয়তুন পর্বতে উপদেশ দানরত নবী (হযরত ঈসা) আর সাফা পর্বতে আরোহণ করে 'হে কুরাইশরা' বলে আহ্বানকারীর মধ্যে কত সামঞ্জস্য ছিল! বদর ও হুনায়েন এবং আহযাব ও তাবুকের সিপাহসালার এবং মাওয়াবী, উমুনী ও মূরীগণের সাথে যুদ্ধরত নবীর (মূসা) মধ্যে কতই না সাদৃশ্য বিদ্যমান! কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার সাতজন সর্দার প্রধানের জন্য বদদোয়া করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর জীবনের সাথে হযরত মূসার ব্যাপক মিল রয়েছে। কেননা, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম অসংখ্য 'মুজিযা' দেখানোর পরও তাঁর ওপর ঈমান না আনার কারণে ফিরাউনদের জন্য বদদোয়া করেছেন। আবার যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদে তাঁর শত্রু ও প্রাণসংহারকারীদের কল্যাণের জন্য দোয়া করেছেন, তখন তাঁর মধ্যে দেখা যায় হযরত ঈসার চিত্র– যিনি কখনো শত্রুদের অমঙ্গল কামনা চাননি। যখন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেন মসজিদে নববীর আদালতে ও পঞ্চায়েতসমূহের সালিসী মজলিসে বা যুদ্ধ ও জিহাদের ময়দানে, তখন তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিপাত করুন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর চিত্র। কিন্তু যখন তাঁকে নিজের ঘরে, পর্বতগুহায় এবং রাতের নির্জনতায় ও অন্ধকারে দেখেন, তখন তাঁর মধ্যে হযরত ঈসার জীবনচিত্র লক্ষ্য করা যায়। দিন-রাতে তাঁর মুবারক কণ্ঠ থেকে

www.nagorikpathagar.org

দোয়া ও মুনাজাতের আওয়ায শুনে 'যবুরে' বর্ণিত দলগুলোর চিত্র চোখের সামনে ভেসে আসে। মক্কা বিজয়ের শান-শওকত এবং জ্ঞান ও বিচারের ছায়াতলে তাঁকে দেখে শান-শওকত, পরাক্রম ও সেনাদল পরিচালনাকারী সুলায়মানের কথা মনে পড়ে যাবে। যদি তাঁকে আবূ তালিব গিরিসঙ্কটে তিন বছর এমনতর অবস্থায় দেখেন যে, সামান্যতম খাবারও বাইর থেকে তাঁর কাছে পৌঁছতে পারে না, তখন মিসরের জেলে আটক হযরত ইউসুফের চিত্র মানস পটে ভেসে ওঠবে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এনেছেন আইন, হযরত দাউদ (আঃ) এনেছেন দোয়া ও মুনাজাত, হযরত ঈসা (আঃ) এসেছেন কৃচ্ছ্রতা ও সদ্ব্যবহার নিয়ে, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইন এনেছেন, দোয়া ও মুনাজাতও এনেছেন এবং কৃচ্ছ্রতা ও আচার-ব্যবহারও এনেছেন। শাব্দিক এবং অর্থগতভাবে এ সব কুরআনে উল্লেখ এবং কাজের দিক দিয়ে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও চরিতে বিদ্যমান রয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্র।

প্রিয় বন্ধুগণ! মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতের আর একটি দিক এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরব। বিশ্বে রয়েছে দু' ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু একটি বিষয়েরই শিক্ষা দান করা হয়। সেখানে প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য পৃথক এবং স্থায়ী শিক্ষাগার থাকে। যেমন মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আর্ট কলেজ, কমার্স কলেজ, কৃষি শিক্ষা নিকেতন, আইন কলেজ ও ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদি। এসবের মাঝে প্রত্যেকটি শিক্ষক শুধু এক ধরনের ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। মেডিকেল কলেজ থেকে শুধু ডাক্তার সৃষ্টি হয়। কৃষি কলেজ থেকে শুধু কৃষি বিশেষজ্ঞ। আইন কলেজ থেকে শুধু আইনবিদ। বাণিজ্য শিক্ষাকেন্দ্র থেকে শুধু ব্যবসা বিশেষজ্ঞ। বিদ্যা ও শিল্পকেন্দ্র থেকে শুধু বিদ্বান ও শিল্পী তৈরি হয়। সাহিত্য শিক্ষায়াতন থেকে শুধু লেখক ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। ক্যাডেট কলেজ থেকে শুধু উচ্চ শ্রেণির সৈনিক সৃষ্টি হয়। আর এভাবেই

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন চলতে থাকে। আবার কোথাও বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় থাকে যেগুলো দ্বিতীয় ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ শিক্ষায়তনসমূহ তাদের ব্যাপকতা ও ক্ষমতা মোতাবেক বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা দান করে থাকেন। তাদের পরিচালনাধীনে থাকে মেডিকেল কলেজ আবার শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রও, কৃষি ও প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় থাকে, আবার সামরিক কলেজও থাকে। সেখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্ররা এসে নিজের রুচি, প্রকৃতি, প্রয়োজন এবং ক্ষমতা অনুযায়ী এক একটি কলেজ বা বিদ্যালয় নির্বাচন করে। এরপর সেখানে সেনাবাহিনীর জেনারেল ও সৈনিক, আদালতের জজ ও আইনবিদ, ব্যবসায়ী ও এ্যাকাউন্টেন্ট, ডাক্তার, শিল্পী ও শিল্পী বিশেষজ্ঞ সবই তৈরি হয়। যদি একটু চিন্তা করা যায় বুঝা যাবে, শুধু একই ধরনের শিক্ষা, একই ধরনের শিল্প ও একই ধরনের বিদ্যা আহরণে তার মাধ্যমে মানব-সমাজে পরিপূর্ণতা আসে না। বরং এর সবগুলো একত্রিত হলে তাহলেই মানব সমাজ পরিপূর্ণতা লাভে সক্ষম হয়। যদি শুধু একটি বিদ্যা এবং একটি শিল্প বিশেষজ্ঞ দ্বারা জগত ভরে যায়, তাহলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির কারখানা মুহূর্তেই রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং মানুষের যাবতীয় কাজ-কারবার সহসাই স্তব্ধ হয়ে যাবে। এমনকি সমগ্র বিশ্ব যদি নির্জনবাসী সাধনাকারীদের দ্বারা ভরে যায়, তখনো পৃথিবীতে পরিপূর্ণতা আসবে না।

এবার আসুন, বিভিন্ন নবী-রাসূলের জীবনকে আমরা এ মানদণ্ডে বিচার করি। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর কথায় বলা যায়, 'ফলেই গাছের পরিচয়।' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের আধ্যাত্মিক সন্তান ও ছাত্রবৃন্দের মাধ্যমে। নবীগণ ছিলেন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, তাই এবার একবার সেগুলো পর্যালোচনা করে দেখুন। প্রথমে কোথাও দশ-বিশজন, কোথাও ষাট-সত্তরজন, কোথাও দু-একশ, কোথাও হাজার দু'-হাজার, আবার কোথাও পনের-বিশ হাজার ছাত্র পরিলক্ষিত হবে। কিন্তু এবার দেখুন নবুয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ শিক্ষায়াতনটি। সেখানে একই সময়ে এক লাখেরও অধিক ছাত্র দেখতে পাবেন। তাছাড়া অন্যান্য

www.nagorikpathagar.org

নবীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্রগণের অবস্থা যদি জানতে চান, তাদের বসবাস কোথায় ছিল, তাদের পরিচয় কি, তারা কিভাবে তৈরি হয়েছিল, তাদের আচার, ব্যবহার, আধ্যাত্মিক অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় কেমন ছিল, এবং তাদের শিক্ষা ও অনুশীলনের বাস্তব ফলশ্রুতি কেমন ছিল, তাহলে এ প্রশ্নগুলোর কোন জবাব পাওয়া যাবেনা। কিন্তু আপনি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিষয় জানতে পারেন। তাঁর প্রত্যেকটি ছাত্রের নাম, পরিচয়, অবস্থা, জীবনচরিত, শিক্ষা ও অনুশীলনের ফলাফল, প্রত্যেকটি বস্তু ইসলামের ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বলভাবে লিখা রয়েছে।

এবার আরো সামনে অগ্রসর হই! নবুয়ত ও ধর্মের দাওয়াতের প্রতিটি শিক্ষায়াতন আজ দাবি করছে যে, এর দুয়ার প্রত্যেক জাতির জন্য খোলা আছে। কিন্তু সে শিক্ষায়াতনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম শিক্ষকের জীবনী পাঠ করুন। তাঁর যুগে কোন একটি দেশের, একটি গোত্রের ও একটি বংশের ছাত্ররা কি সেখানে ভর্তি হয়েছে এবং তাদের কি ভর্তি হবার অনুমতি দান করা হয়েছে বা তাদের দাওয়াতে কি এমন কোন সর্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতা লক্ষ্য করা যায়, যে কারণে প্রত্যেকটি আদমসন্তান এবং ধরাপৃষ্ঠে প্রতিটি মানুষ তার মধ্যে কার্যত প্রবেশ করতে পেরেছে বা প্রবেশ করার জন্য তাকে আহবান করা হয়েছে কিনা? তাওরাতের সকল নবী ইরাক, সিরিয়া বা মিসর দেশের সীমানা অতিক্রম করেননি। অর্থাৎ তাদের নিজের দেশে যেখানে তাঁরা থেকেছেন সেখানেই তাঁদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ হয়েছে এবং নিজেদের বংশ ও গোত্র ব্যতীত অন্যকে তাঁরা দাওয়াত প্রদান করেনি। তাঁদের প্রচেষ্টার কেন্দ্র ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু বনী ইসরাইল বংশেই সীমাবদ্ধ। আরবের প্রাচীন নবীগণও তাঁদের নিজেদের জাতির দায়িত্বই গ্রহণ করতেন। তাঁরা কেউ বাইরে গমন করেননি। যীশুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ-ইসরাইলী ছাত্রদের অস্তিত্ব ছিল না। তিনি ছিলেন শুধু ইসরাইলদের হারানো মেষগুলোর সন্ধানে। (তথ্য : মোথিঃ ৭ম অধ্যায় : ২৪শ আয়াত) এবং অন্য জাতির লোকদের শিক্ষা দান করতেন না।

www.nagorikpathagar.org

(তথ্য : ইঞ্জিল) ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ধর্মের আহবায়ক 'পবিত্র আর্যবর্ত্যে'র বাইরে যাবার কথা চিন্তাই করতে পারতেন না। যদিও গৌতম বুদ্ধের অনুসারী রাজারা তাঁর বাণীকে বাইরের জাতিদের কাছে পৌঁছিয়েছেন কিন্তু তা ছিল যথার্থই খ্রিষ্টানদের দেখাদেখি পরবর্তীকালের বৌদ্ধদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার ফসল। তাদের ধর্মের আহবায়কের নিজের জীবনচরিতে এ সর্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

এবার আরবের এ উম্মী নবীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যালোচনা করা যাক! এর ছাত্ররা কারা? তারা আবূ বকর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, ওমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, ওসমান রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, আলী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, তালহা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, ও যুবাইর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু প্রমুখ মক্কার কুরাইশ বংশীয় ছাত্র। তাঁরা কারা? তারা আবূ যর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ও আনাস রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, মক্কার বাইরের তাহামা এলাকার গফফার গোত্রের লোকজন। তাঁরা কারা? তাঁরা আবূ হোরায়রা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ও তোফায়েলদ ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু। ইয়ামন দেশের দুসী গোত্রের লোকজন। তাঁরা কারা? তাঁরা আবূ মূসা আশআরী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ও মুআয ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু। তাঁরাও ইয়ামন দেশের অন্য গোত্রের লোক। ইনি কে? ইনি যিয়াদ ইবনে ছাআলাবা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু উযদু গোত্রের লোক। ইনি কে? ইনি খাব্বাব ইবনে ইর্ত রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, তামীম গোত্রের লোক। ---তাঁরা হচ্ছেন আবদুল কায়েস গোত্রের মুনকায ইবদে জাম রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ও মানযার ইবনে আসেদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, এসেছেন বাহরাইন থেকে। আর তাঁরা হচ্ছেন আম্মানের সর্দার উবাইদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ও জাফর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু। ইনি হচ্ছেন মাআন অর্থাৎ সিরিয়া অধিবাসী ফারদা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু। এ কৃষ্ণকায় লোকটি কে? ইনি হচ্ছেন আবিসিনিয়ার অধিবাসী বিলাল রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু। আর

www.nagorikpathagar.org

ইনি কে? ইনি হচ্ছেন রোমের অধিবাসী সোহায়েব রুমী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু। এসব লোকগুলো কারা? তাঁরা হচ্ছেন ইরানের সালমান ফারসী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, ফিরোজ দাইলামী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, সাইখাত রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ও মারকাবুদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু। তাঁরা পুরুষানুক্রমে ছিলেন ইরানবাসী।

হিজরী ষষ্ঠ শতকে হুদায়বিয়ার সন্ধিতে এমন একটি চুক্তিপত্র তৈরি করা হয় যা ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্যের পরিপূরক। অর্থাৎ কুরাইশ ও মুসলমান উভয়পক্ষে যুদ্ধ মূলতবী করতে হবে এবং মুসলমানরা যেখানে ইচ্ছা তাদের ধর্মের দাওয়াত দান করে যাবে। এ বিরাট সাফল্যলাভের পর ইসলামের নবী কি করেছেন? সে বছর ৬ হিজরীতে তিনি সকল রাষ্ট্রপ্রধানদের নামে ইসলামী দাওয়াত সম্বলিত পত্র পাঠান এবং তাদের কাছে আল্লাহর নির্দেশনা পৌঁছিয়ে দেন। দেহিয়া কালবী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু রুমের কায়সার হিরাক্লিয়াসের দরবারে, আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহামী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ইরানের প্রভাবশালী বাদশাহ খসরু পারভেজের দরবারে; হাতিব ইবনে বালতায়া রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু মিসরের গভর্নর মুকাওকাসের দরবারে, আমর ইবনে উমাইয়া রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজজাশীর দরবারে, সুজা' ইবনে দাহাবুল আসাদী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু সিরিয়া প্রধান হারেস গাসসানীর দরবারে এবং সালীত ইবনে আমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ইয়ামামার প্রধানগণের দরবারসমূহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র বহন করে নিয়ে যান যে, তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বার সবার জন্য ছিল উন্মুক্ত।

প্রিয় বন্ধুগণ! এসব জ্ঞানগর্ভ তথ্যমূলক আলোচনা থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষায়াতনের সর্বজনীনতার এ দিকটি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় যে, এর মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য বর্ণ ও আকৃতি, দেশ এবং রাষ্ট্র, জাতি ও বংশ এবং ভাষা ও উচ্চারণ ভঙ্গিমার কোন প্রশ্নই ছিল না। বরং এর দ্বার জগতের সকল জাতি, সকল বংশ, সকল দেশ ও সকল ভাষাভাষীর জন্য সমানভাবেই উন্মুক্ত ছিল।

www.nagorikpathagar.org

এবার আসুন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা এবং মর্যাদা পর্যালোচনা করি। এটি কি এমন একটি স্কুল বা কলেজ, যেখানে একটি বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়? অথবা এটি একটি ব্যাপক ও সর্বজনীন বিশ্ববিদ্যালয়- যেখানে রুচি, প্রকৃতি ও সামর্থ অনুযায়ী প্রত্যেক দেশের অধিবাসী ও প্রত্যেক জাতির ব্যক্তিরা শিক্ষা লাভ করে থাকেন। হযরত মূসা (আ)-এর শিক্ষায়তনের লক্ষ্য করুন! সেখানে শুধু সিপাহী, ইউশার ন্যায় সেনানায়ক ও বিচারপতি এবং সামান্য সংখ্যক ধর্মীয় পদাধিকারীই পাওয়া যায়। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ছাত্রদের সন্ধান করুন! সামান্য সংখ্যক কৃচ্ছ্রতাসাধনকারী ফকিরকে দেখতে পারেন ফিলিস্তীনের গলি পথে। কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এখানে কি দেখবেন? একদিকে আছেন আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী বাদশাহ আসমাহা, মাআনের প্রধান ফারদা, হামীরের প্রধান যুলকোলা, হামদান গোত্রের প্রধান আমির ইবনে শাহর, ইয়ামনের প্রধান ফিরোজ দায়লামী ও মারকাবুদ, আম্মানের প্রধান উবাইদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ও জাফর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু এবং অপরদিকে বিলাল রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, ইয়াসির রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, সোহাইব রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, খাব্বাব রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, আম্মার রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ও আবূ ফকীহা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুর ন্যায় গোলাম এবং সুমাইয়া রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, লোবীয়া রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, যীযা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, নাহদীয়া রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ও উম্মে উবাইস রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুর ন্যায় বাঁদিগণ। এবার গভীরভাবে নিরীক্ষণ করুন, এখানে আমীর-গরীব, বাদশাহ-ফকির, প্রভু-ভৃত্য সবাইকে এক সারিতে দণ্ডায়মান দেখা যাবে।

একদিকে বুদ্ধিজীবীগণ, প্রকৃতির রহস্যজ্ঞানী, দেশশাসক ও পরিচালকগণ তাঁর শিক্ষাগার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বের হয়েছেন। আবূ বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, ওমর ফারূক রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, ওসমান গনী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, আলী মুর্তজা রাদ্বিআল্লাহ



www.nagorikpathagar.org

তা'আলা আনহু, মুআবীয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষের সীমান্ত পর্যন্ত বিশাল ভূ-খণ্ড শাসন করেছেন এবং এমনভাবে রাজ্য পরিচালনা করেছেন যে, তাঁদের সামনে মহা প্রতাপশালী বাদশাহ ও শাসকগণের রাজনীতি, কূটনৈতিক কার্যক্রম ও শাসন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিধান ও যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিষ্প্রভ ও অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। তাঁদের ইনসাফ এবং ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানসমূহ ইরানী শাসনতন্ত্র এবং রোমীয় আইনকে মূল্যহীন করে দেয় এবং জগতের রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ইতিহাসে এমন এক স্থান অধিকার করে, যার কোন দৃষ্টান্ত উত্থাপন করা যায় না।

অন্যদিকে আছেন খালিদ ইবনে ওলীদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, আবূ উবাইদা ইবনে জাররা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ও আমর ইবনুল আস রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু। তাঁরা মাত্র কয়েক বছরের মাঝে যালিম, পাপাসক্ত ও মানবতার জন্য অভিশাপ স্বরূপ পূর্ব ও পশ্চিমের দুটি বিশাল সাম্রাজ্যকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। এভাবে তাঁরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক ও বিজয়ী রূপে প্রমাণিত হন। আজও তাঁদের বিজয় অভিযানের কাহিনী মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করে। সাআদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ইরাক ও ইরানের রাজমুকুট ছিনিয়ে এনে ইসলামের পদতলে নিক্ষেপ করেন। খালিদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, আবূ উবাইদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু রোমীয়দেরকে সিরিয়া থেকে বিতাড়িত করে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতিশ্রুত ভূ-খণ্ডের আমানত মুসলমানদের হাতে তুলে দেন। আমর ইবনুল আস রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ফিরাউনের দেশ নীলনদের অববাহিকা রোমান সাম্রাজ্যের হাত থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ও ইবনে আবী সারাহ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু আফ্রিকার বিশাল ভূ-খণ্ড শত্রুদের কাছে থেকে ছিনিয়ে নেন। এ বিশ্ববিখ্যাত বিজেতা ও সেনানায়কগণের যোগ্যতা ইতিহাসের

www.nagorikpathagar.org

পাতায় শুধু স্বীকৃতিই লাভ করেনি বরং ইতিহাস তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বেরও প্রমাণ উত্থাপন করেছে। তৃতীয় দিকে বাযান রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ইবনে হাসান (ইয়ামন), খালেদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ইবনে সাঈদ (সানয়া), মুহাজির রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ইবনে উমাইয়া (কান্দা), যিয়াদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ইবনে লোবীদ (হাদরামাউত), আমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু (তাইমা), আলা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ইবনে হাযরামী (বাহরাইন) প্রমুখ অগণিত সাহাবী সাফল্যজনকভাবে বিভিন্ন শহর এবং প্রদেশ শাসন করে আল্লাহর সৃষ্ট জীবকুলের জীবন সুখ-শান্তিতে পরিপূর্ণ করে তোলেছেন সে দৃষ্টান্ত ও ইতিহাসের পাতায় রয়েছে।

চতুর্থ দিকে রয়েছেন ওলামা এবং ফকীহগণের দল। ওমর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ইবনে খাত্তাব, আলী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ইবনে খাত্তাব, আলী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ইবনে আবী তালেব, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, উবাই ইবনে কাব রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, মুআয ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, যায়েদ ইবনে সাবেত রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, ইবনে যুবাইর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু প্রমুখ সাহাবীগণ ইসলামী ফিক্‌হ ও আইনশাস্ত্রের ভিত রচনা করে বিশ্বে আইন প্রণেতাগণের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন।

পঞ্চম কাতারে আছেন সাধারণ হাদীস সংকলনকারী ও ইতিহাস রচয়িতাগণ। যেমন হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, হযরত আবূ মূসা আশয়ারী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, হযরত ইবাদা ইবনে সামেত রাদ্বিআল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

তা'আলা আনহু, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, হযরত বারায়া ইবনে আযেব রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু প্রমুখ অসংখ্য সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা ও ঘটনাবলী সংগ্রহ এবং বর্ণনা করেছেন।

সাহাবীগণের ষষ্ঠ দলটিতে রয়েছেন সত্তরজন আসহাবে সুফ্ফা। মসজিদে নববীর আঙ্গিনা ছাড়া তাঁদের মাথা গুঁজার দ্বিতীয় আর কোন স্থান ছিল না। দেহের সাথে জড়ানো কাপড়টি ব্যতীত জগতে তাঁদের মালিকানায় আর দ্বিতীয় কোন বস্তু ছিল না। তাঁরা দিনে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে এনেছেন এবং তা বিক্রি করে নিজেদের ভরণ- পোষণের ব্যবস্থা করেছেন, তা থেকে ব্যয়ও করেছেন আল্লাহর পথে এবং রাতে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থেকেছেন।

সপ্তম পর্যায়ে দৃষ্টিপাত করুন! আবূ যর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-কে দেখা যাবে পৃথিবীর বুকে তাঁর চেয়ে বেশি সত্যভাষী আজও জন্ম নেয়নি। তাঁর মতে আজকের খাবার পরবর্তী দিনের জন্য জমা রাখাও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার বিরোধী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'মসীহুল ইসলাম' উপাধি প্রদান করেছেন। সালমান ফারসী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-কে দেখুন, তিনি তাকওয়া ও কৃচ্ছ্রতাসাধনার স্তম্ভের প্রতীক। আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকেও দেখুন। ত্রিশ বছর তিনি পূর্ণ অনুসরণ ও ইবাদতে অতিবাহিত করেছেন। আর যখন তাঁর কাছে খিলাফত পেশ করা হয় তখন বললেন, যদি এর দরুন মুসলমানদের একবিন্দুও রক্তপাত হয়, তখন আমার কাছে এ খিলাফত অগ্রহণযোগ্য। মুসাআব ইবনে উমাইর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-কেও দেখুন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কাকম (পরিধেয় রূপে ব্যবহৃত এক জাতীয় সূক্ষ্ম ও মোলায়েম এবং অতি মূল্যবান চামড়া) ও রেশমী বস্ত্র পরিধান করতেন। তিনি অত্যন্ত প্রাচুর্য এবং বিলাসিতায় লালিত-পালিত হন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মোটা এবং তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করতেন এবং

www.nagorikpathagar.org

যখন শাহাদত লাভ করেন তখন তাঁর কাফনের জন্য পুরা কাপড়ও পাওয়া যায় না, অবশেষে তাঁকে পায়ের ওপর ঘাস ছড়িয়ে দিয়ে দাফন করা হয়েছে।

ওসমান ইবনে মাযউন রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-কেও দেখুন। তাঁকে বলা হয় ইসলামের প্রথম সূফী। আবার মুহাম্মদ ইবনে সালমা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-কে দেখুন। তিনি ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার যুগে বলতেন, 'যদি কোন মুসলমান তলোয়ার নিয়ে আমাকে হত্যা করার জন্য আমার ঘরে প্রবেশ করে তাহলেও আমি তার ওপর আঘাত হানব না। আবূ দারদা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুকেও দেখুন। তাঁর রাতের বেলা নামাযে এবং দিনের বেলায় রোযায় অতিবাহিত হত।

আর একদিকে দেখুন! দুঃসাহসী কর্মবীর ও বিচক্ষণ আরবদের দল এটি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তালহা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, যুবাইর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, মুগীরা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, মিকদাদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, সাআদ ইবনে মুআয রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, সাআদ ইবনে ইবাদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, উসাইদ ইবনে হুযাইর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, আসআদ ইবনে যিয়ারা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু। মক্কার ব্যবসায়ী ও সওদাগরদের দেখুন আর মদীনার কৃষকদের প্রতিও লক্ষ্য করুণ। তাদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু, এবং সাআদ ইবনে যুবাইর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-এর মত ধনীও দেখা যায়।

আর একটি দল হচ্ছে শহীদ ও নিরপরাধ নিহত ব্যক্তিদের। তাঁরা আল্লাহর পথে তাঁদের প্রিয় জীবন ত্যাগ করেছেন, তবুও সত্যের সঙ্গ ত্যাগ করতে সম্মত হননি। হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-র প্রথম স্বামীর পুত্র হালাকে তরবারির অসংখ্য আঘাতে কেটে কুচি কুচি করা হয়। হযরত আম্মার রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-এর মা সুমাইয়া রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা

www.nagorikpathagar.org

আনহু আবূ জাহলের বর্শার আঘাতে নিহত হন। হযরত ইয়াসের রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু কাফেরদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত খোবাইব রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু শূলীবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত যায়েদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু তলোয়ারের নিচে গলা বাড়িয়ে দেন। হারাম ইবনে মালাহাম ও তাঁর উনসত্তরজন সাথী বীরে মাউনায় আসীয়াতুর রেহেল এবং যাকয়ান উপজাতিদ্বয়ের হাতে নির্দয়ভাবে শাহাদৎবরণ করেন। রাজীয়ের ঘটনায় হযরত আসেম এবং তাঁর সাতজন সঙ্গীর দেহ বনু লাহিয়ানের একশজন তীরন্দাজের তীরের আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়! সপ্তম হিজরীতে ইবনে আবী রজার ৪৯ জন সাথী বনু সালীম গোত্রের হাতে শাহাদাৎবরণ করেন। হযরত কাব ইবনে ওমর সাফফারী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ 'যাতেইতলাহে'র ময়দানে শাহাদৎবরণ করেন। পৃথিবীর একটি বহুল পরিচিত ধর্ম মাত্র একটি শূলবিদ্ধ মৃত্যুকে নিয়ে আত্মগরিমা প্রকাশ করে কিন্তু ইসলামের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখুন, সেখানে অসংখ্য শূলবিদ্ধ মৃত্যু ও নির্মম হত্যা এবং শত শত কুরবানী গাহের নীরব সাক্ষী আজও বিদ্যমান রয়েছে।

তলোয়ার ও বর্শার আঘাত বা শূলদণ্ড এগুলো সাময়িক কষ্ট। কিন্তু সত্যানুসারীর জীবন এর চেয়ে অধিক দৃঢ়তা এবং এর চেয়ে অধিক ধৈর্য ও পরীক্ষায় পরিপূর্ণ। একমাত্র সত্যের খাতিরেই তাঁরা বছরের পর বছর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। তাঁরা জ্বলন্ত-আগুনে ও উত্তপ্ত বালির ওপর শুয়ে রয়েছেন এবং বড় বড় পাথরখণ্ড নিজেদের বুকের ওপর ধারণ করেছেন। তাঁদের গলায় দড়ি বেঁধে টানা-হেঁচড়া হয় তবু জিজ্ঞাসিত হলে বার বার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালেমাই তাঁদের মুখে উচ্চারিত হয়, 'আবূ তালেব গিরিসঙ্কটে' তাঁরা তালাহ গাছের পাতা খেয়ে জীবন-যাপন করেছেন। সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন, এক রাতে ক্ষুধার তাড়নায় একটি শুকনো কাপড় পেয়ে সেটিকে ধুয়ে আগুনে ভাজা করে পানি মিশিয়ে খেয়েছি। আম্বাসা ইবনে

www.nagorikpathagar.org

গাযাওয়ান বলেন, আমরা সাতজন মুসলমান ছিলাম। অনভ্যস্ত খাদ্য খেয়ে খেয়ে আমাদের ঠোঁট ও জিভের চামড়া ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। খাব্বাব রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন কাফেররা তাঁকে জ্বলন্ত কয়লার ওপর শুইয়ে দেয় এবং তাঁর শরীরের চর্বি গলে এ আগুন নিভে যায়। বিলাল রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুকে দুপুরের গরম মরু-বালুকার ওপর হাত-পা বেঁধে শুইয়ে দেয়া হত এবং বুকের ওপর স্থাপন করা হত বড় বড় পাথর খণ্ড। তাঁর গলায় দড়ি বেঁধে অলি-গলিতে টেনে নেয়া হত। আবূ ফকীহা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুর পায়ে দড়ি বেঁধে পথে পথে ঘুরানো হয়। তাঁর গলা টিপে ধরা হয়। তাঁর বুকের ওপর এত বড় পাথর রাখা হত, তাতে তাঁর জিভ বেরিয়ে পড়ে। আম্মার রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুকে গরম মরু বালুকার ওপর শুইয়ে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হত। হযরত যুবাইর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুকে তাঁর চাচা চাটাইয়ে জড়িয়ে নাকের মধ্যে ধোঁয়া প্রবেশ করাত। সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু- কে দড়ি দিয়ে বেঁধে প্রহার করা হত। হযরত ওসমান রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-কে তাঁর চাচা দড়ি দিয়ে বেঁধে মারপিট করে। এসব কিছু সংঘটিত হচ্ছিল, কিন্তু এরপরও যে নেশায় তাঁরা বিভোর হয়েছিলেন এর ঘোর কেটে যাচ্ছিল না। এ আবার কেমন নেশা? এ ছিল কাওসারের পানি যিনি পান করাচ্ছিলেন তাঁর চিরন্তন পানশালার পানীয় পানের নেশার মতই।

বন্ধুগণ! চিন্তা করুন, এরা সে বর্বর মূর্তিপূজারী ও অসভ্য আরব ছিল! এদের মধ্যে একি বিপ্লব সংঘটিত হয়? এক নিরক্ষর ব্যক্তির শিক্ষা মূর্খ আরবদেরকে বুদ্ধিমান, স্বচ্ছ চিন্তা ও হৃদয়ের অধিকারী এবং আইনবিদে পরিণত করে কেমন করে! এক নিরস্ত্র নবীর আবেগময় প্রচারে কীভাবে দুর্বল আরবদেরকে সেনানায়ক ও বীর যোদ্ধায় পরিণত করে নতুন প্রাণ শক্তি শৌর্যবীর্যে পরিণত করে। যারা আল্লাহ্‌র নামও জানত না তারা আবার কেমন করে এহেন রাতে জাগরণকারী সাধক মুত্তাকী ও আনুগত্যশীলে পরিণত হল! আপনারা হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মদীনার বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন শেষ করেছেন। সেখানে সকল বর্ণের ও সকল রুচি-প্রকৃতির ছাত্র লক্ষ্য করেছেন। আলেম, আইন প্রণেতা, সৈনিক, আদালতের বিচারক, শাসক ও গবর্নর, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত, বাদশাহ ও আমীর, গোলাম, প্রভুও, যোদ্ধা দেখেছেন, মৃত্যুবরণকারীও, সত্যের পথে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদেরকেও দেখেছেন। তা থেকে আপনারাই সিদ্ধান্তে পৌছালেন যে, হযরত হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর যোগ্যতা ও শক্তির যে পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটেছিল, এ কথার স্বীকৃতি ছাড়া এসব থেকে আর কোন সিদ্ধান্তে আপনি পৌছতে পারেন? আর এসবই ছিল তাঁর সর্বজনীন গুণাবলীর বিচিত্র ও বৈশিষ্ট্যময় প্রকাশ।

এসব গুণাবলীও কখনো সিদ্দীক ও ফারুকরূপে প্রতিভাত হয়েছে, কখনো যুন্নুরাইন ও মুর্তযার রূপ ধারণ করেছে, কখনো খালিদ ও আবূ উবাইদা এবং কখনো সা'দ ও জাফর তাইয়ার রূপে উপস্থাপন হয়েছে, কখনো ইবনে ওমর ও আবূ যর এবং সালমান ও আবূ দারদারূপে মসজিদ ও মেহরাবে দৃশ্যমান রয়েছে। কখনো তা ইবনে আব্বাস ও উবাই ইবনে কা'ব এবং যায়েদ ইবনে সাবিত ও আবুদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রূপে জ্ঞান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বুদ্ধিতত্ত্ব জ্ঞানের পর্যায়ে রূপধারণ করেছে। আবার কখনো বিলাল ও সোহায়েল এবং আম্মার ও খোবাইবের পরীক্ষায় হৃদয় ও আত্মার সান্ত্বনার বাণী হয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্তিত্ব ছিল বিশ্ব উজ্জ্বলকারী সূর্যের মত। সুউচ্চ পাহাড়, বালুকাময় মরুভূমি, প্রবহমান স্রোতস্বিনী, শস্যশ্যামল ক্ষেতে সবাই নিজেদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী তা থেকে উত্তাপ ও আলো সংগ্রহ করেছে। অথবা এ ছিল যেন বর্ষার মেঘমালা। পাহাড় পর্বত, বন-জঙ্গল, ক্ষেত-খামার, মরু-প্রান্তর, বাগান সবকিছুই এ বারিধারায় প্লাবিত হয়। প্রত্যেকেই সাধ্য অনুসারে এ বারিধারা পান করে বিভিন্ন বর্ণের পত্র-পুষ্পে সুশোভিত রূপ ধারণ করেছে।

www.nagorikpathagar.org

এ বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নজনের যোগ্যতার পার্থক্যের পরও একটি বিষয় সবার মধ্যে সাধারণ ছিল। আর তা হচ্ছে একই প্রকারের বিদ্যুৎ প্রবাহ যা সকলকেই স্পন্দিত করছিল। একই জীবনশক্তি যা সকলের বুকে সঞ্চারমান ছিল। বাদশাহ-ফকীর, আমীর-গরীব, শাসক-শাসিত, বিচারক-সাক্ষী, সেনানায়ক-সিপাহী, শিক্ষক-ছাত্র, ইবাদতকারী, কৃচ্ছ্রতাসাধক ও ব্যবসায়ী, ধর্মযোদ্ধা বা শহীদ সবার ক্ষেত্রে তওহীদের জ্যোতি, আন্তরিকতার প্রবাহ, ত্যাগের প্রেরণা, মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের বাসনা সর্বত্র ছিল সক্রিয়। তাঁরা যে পর্যায়েরই হোন, যেখানেই থাকেন এবং যে কাজই করুন না কেন, তাঁদের সবার মধ্যে এ প্রেরণাগুলো ওৎপ্রোতভাবে বিদ্যমান ছিল। রুচি-প্রকৃতি ও পথের পার্থক্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ সকলেরই এক, একই কুরআন, একই রাসূল, একই কাবা সকলেই মেনে চলেছেন। সকল রুচি, সকল পথ ও কাজের উদ্দেশ্য ছিল জগতের সংশোধন, সৃষ্টি ক্ষেত্রে সহানুভূতি, আল্লাহর নামকে বুলন্দ করা এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করা। এ ছাড়া তাদের সামনে আর অন্য কোন প্রকার উদ্দেশ্যই ছিল না।

প্রিয় বন্ধুগণ! আজকের বক্তৃতায় আমি হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বজনীন গুণাবলীর বিভিন্ন বৈচিত্যময় দিক আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। বিশ্ব-প্রকৃতিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পর যদি আপনারা বিশ্বাস করেন যে, এ বিশ্বে মানুষের রুচি-প্রকৃতি, যোগ্যতা ও সামর্থ বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ, তাহলে আপনাদেরকে অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বজনীন ও সর্বগুণাধার ব্যক্তিত্ব ছাড়া অন্য কোন মানুষ সর্বশেষ, চিরন্তন ও বিশ্বজনীন নেতা হতে পারে না।

তাই তিনি ঘোষণা করেছেন :

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ۔

'যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণের দাবী করে থাক, তাহলে আমার আনুগত্য কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।' (ইমরান, আয়াত : ৩১)

www.nagorikpathagar.org

যদি তোমরা বাদশাহ হও, তাহলে আমার আনুগত্য কর। যদি তোমরা প্রজা হয়ে থাক, তাহলেও আমার আনুগত্য কর। যদি সিপাহসালার ও সিপাহী হয়ে থাক, তাহলেও আমার আনুগত্য কর। যদি শিক্ষক ও অধ্যাপক হয়ে থাক, তবু আমার আনুগত্য কর। ধনী হলেও আমার আনুগত্য কর এবং গরিব হলেও আমার আনুগত্য কর। অসাহায় ও মজলুম হলেও আমার আনুগত্য কর। আল্লাহর ইবাদতকারী ও জাতির খাদেম হলেও আমার আনুগত্য কর। মোটকথা, তোমরা যে নেক পথই অবলম্বন কর এবং যত উন্নত ও শ্রেষ্ঠতম আদর্শের প্রত্যাশী হও আমার আনুগত্যেই তা পাওয়া সম্ভব।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ ও হযরত সাহাবায়ে কেরামের প্রতি শান্তি বর্ষণ কর!

www.nagorikpathagar.org

# ৬. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতে ইসলামের বাস্তবতা

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

'আল্লাহর রাসূলের জীবনই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আর্দশ।'

প্রিয় বন্ধুগণ! এখন আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য কোন ব্যাপারে ও কীভাবে করা উচিত এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁর জীবনচরিতের বাস্তব দিকগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। এটি একটি নবী ও ধর্মপ্রবর্তকগণের জীবনের এমন অধ্যায়, যার প্রায় সব অংশটুকুই শূন্য। কিন্তু এ অধ্যায়টিই হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সবচেয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত। নবীগণের নেতা ও সর্বশেষ নবী কে হতে পারেন, এ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য এমন একটি মানদণ্ডই যথেষ্ট। সদুপদেশ, মধুর বাণী ও উন্নত শিক্ষার অভাব এখানে নেই, অভাব হচ্ছে প্রচারিত নীতি এবং বাস্ত বক্ষেত্রে তা প্রতিপালনের। বর্তমান ধর্মগুলোর প্রবর্তক ও প্রচারকগণের জীবনকথার সবটুকু যদি পাঠ করা যায় সেখানে উৎকৃষ্ট মতবাদ, মনোরম কাহিনী, বক্তাসুলভ বিরাট দাবি, বক্তৃতার আবেগ, মুখরোচক ও সুবিন্যস্ত শব্দ এবং অত্যধিক আবেগ ও উৎসাহ পাওয়া যাবে। কিছুক্ষণের চমৎকার দৃষ্টান্ত হৃদয় জয় করে নেবে, কিন্তু যে বিষয়টি সেখানে পাওয়া যাবেনা, তা হচ্ছে নিজের প্রচারিত আদেশ-নিষেধগুলো সর্বপ্রথম নিজে পালন ও কার্যকর করে দেখানো। মানুষের কর্ম জীবনের নাম হচ্ছে চরিত্র। কুরআন ব্যতীত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে কি তার প্রবর্তকের স্বপক্ষে এ দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য প্রদান করেছে যে, তিনি বাস্তব কর্মজীবনের মানদণ্ডেও উন্নততর মানুষ ছিলেন? কিন্তু কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে এবং বন্ধু ও শত্রুদের সমাবেশে ব্যক্ত করেছে :

وَإِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۔ وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۔

www.nagorikpathagar.org

'অবশ্য তোমার প্রতিদান অফুরন্ত, যা শেষ হবার নয়, আর অবশ্য তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী।' (সূরা আল কলম, আয়াত : ৩-৪)

এখানে 'আর' যদিও ব্যাকরণের দৃষ্টিতে নিছক একটি অব্যয় পদ এবং তা পূর্বাপর দুটি বাক্যকে সংযুক্ত করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আয়াতের অন্তর্নিহিত রহস্য ও বাক্য সংযোজনের দিক দিয়ে যদি বিচার করলে দেখা যায় যে, একটি হচ্ছে ঘটনা এবং অন্যটি হচ্ছে তা কারণ। অর্থাৎ একটি হচ্ছে দাবী, অপরটি হচ্ছে তার প্রমাণ। প্রথম বাক্যে তাঁর (মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্‌র) প্রতিদান শেষ না হবার দাবী উল্লেখ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে এর স্বপক্ষে যুক্তি এবং প্রমাণ হিসেবে তাঁর কর্ম ও চরিতকে উত্থাপন করা হয়েছে। কেননা তাঁর কর্মজীবন ও চরিত্রই প্রমাণ করে যে, তাঁর প্রতিদান কখনো শেষ হবার নয়। মক্কার উম্মী শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহ্বান জানিয়ে কোরআনে বলা হয়েছে :

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ۔

'কেন তোমরা তা বল, যা কর না?' (সূরা আস্ সফ, আয়াত : ২)

একথা ঘোষণা করার অধিকার তাঁর ছিল। কেননা তিনি যা কিছু বলেছেন একে বাস্তবে কার্যকরী করে দেখিয়েছেন। তূর পাহাড়ের বক্তা ও উপদেশদাতা (হযরত ইউশা) এবং সাফা পাহাড়ের প্রচারক (মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্) উভয়ের জীবনকাহিনী এ দৃষ্টিতে তুলনা করুন। তাহলে জানতে পারবেন যে, একজনের চরিত্রে এর ছিটেফোঁটাও নেই আর অন্যজনের চরিত্রে তা পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান। শক্তিলাভ করার পর ক্ষমা ও ধৈর্যের দৃষ্টান্ত পেশ করা উন্নত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কোন অক্ষম, দুর্বল ও শক্তিহীনের নীরবতাকে ক্ষমা ও ধৈর্য আখ্যা দান করা যায় না। এক ব্যক্তি কাউকেও আঘাত করেনি, কাউকেও হত্যা করেনি, কারোর সাথে অশুভ আচরণ করেনি, কারোর অর্থ লুট করেনি, কোন ঘর নির্মাণ করেনি, কিছুই সঞ্চয় করেনি। কিন্তু এসব হচ্ছে নেতিবাচক গুণ।

এখন বলুন, সে কাউকেও আঘাত করেনি– একথা ঠিক। কিন্তু সে কোন অভাবী ও দুর্বলকে সাহায্য করেছে কি? কাউকেও হত্যা করেনি; কিন্তু কারোর প্রাণরক্ষা করেছে কি? কারোর সাথে অসদ্ব্যবহার করেনি,

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু কারোর সাথে সদ্ব্যবহার করেছে কি? কারোর সম্পদ লুট করেনি, কিন্তু কোন গরীব ও অভাবীকে কিছু দান করেছে কি? নিজের জন্য কোন ঘর তৈরি করেনি, কিন্তু কোন গৃহহীন ও নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছে কি? নিজের জন্য কিছু সঞ্চয় করেনি, কিন্তু অন্যের জন্য কিছু করেছে বা করিয়েছে কি? পার্থিব প্রয়োজনে এ ইতিবাচক গুণাবলীর নামই হচ্ছে বাস্তব কর্মজীবন।

কোরআনে বলা হয়েছে :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ۔

'অতপর এটা আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ যে তুমি তাদের প্রতি কোমল। (হে মুহাম্মদ) আর যদি তুমি কঠোর হৃদয় হতে তাহলে অবশ্য তারা (যারা তোমার চারপাশে একত্র হয়েছে) তোমার পাশ থেকে সরে যেত।'

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৯)

এ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোমল হৃদয়ের দ্ব্যর্থহীন বর্ণনা। দাবি ও প্রমাণসহ তা আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান। অর্থাৎ যদি তিনি কোমল হৃদয় ও দয়ালু না হতেন, তাহলে এ বর্বর, নির্ভীক ও উগ্র মেজাজের অধিকারী আরবেরা কোন দিন তাঁর চারপাশে সমবেত হত না।

অন্য স্থানে বলা হয়েছে :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔

'তোমাদের কাছে তোমাদের মাঝে থেকে একজন নবী এসেছেন। তোমাদের কষ্ট তাঁর কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তোমাদের উপকার করার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী। তিনি ঈমানদারদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু।' (সূরা আত্ তাওবা, আয়াত : ১২৮)

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ এ আয়াতগুলোতে সমগ্র মানবজাতির প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকরুণ হৃদয়ানুভূতির উল্লেখ করেছেন। তাই বলেন : হে মানবজাতি! তোমাদের কষ্ট ও বিপদ, তোমাদের পাপাচার এবং যুদ্ধ ও জিহাদের কারণে তোমাদের দুঃখ-কষ্ট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরকে ব্যথিত করে এবং তোমাদের উপকার ও কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকেন। মানবজাতির প্রতি এত কল্যাণ কামনাই তাঁকে তোমাদের মধ্যে সত্য প্রচার এবং তোমাদের সত্য পথে আহবান জানানো ও উপদেশ দানে উদ্বুদ্ধ করেছে। যারা তাঁর আহবান ও উপদেশ গ্রহণ করে তাদের সাথে তিনি স্নেহপূর্ণ ও কোমল ব্যবহার করেন। মোটকথা, এ আয়াতে এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে যে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন গোটা মানবজাতির কল্যাণকামী এবং বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতি তিনি স্নেহশীল ও কোমল হৃদয়। তাঁর বাস্তব চরিত্র সম্পর্কে এ হচ্ছে আল্লাহ্র সাক্ষী। ইসলামের বিধি-বিধান ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ দ্বারা মানুষকে যে শিক্ষা দান করা হয়েছে, তার সমষ্টিকে কোরআন বলা হয়। একজন কর্মতৎপর নবী হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন চরিতের প্রকৃতপক্ষে কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা। তাঁর ওপর যে বিধান নাযিল করা হয়েছে, তিনি নিজেই তা কার্যকর করে দেখিয়েছেন। ঈমান, তওহীদ, সালাত, সিয়াম, হজ্ব, যাকাত, সাদকা, খয়রাত, জিহাদ, ত্যাগ, কুরবানি, হিম্মত, দৃঢ়তা, সবর, শোকর এবং এ ছাড়াও সৎকাজ ও সচ্চরিত্র সম্পর্কে যত কথা তিনি বলেছেন, সব কিছুতেই নিজের বাস্তব কর্মজীবন থেকে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। যা কিছু কুরআনে রয়েছে তার সবই তাঁর জীবনে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পেয়েছে। কিছু সাহাবী হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহার কাছে হাজির হয়ে বললেন : হে উম্মূল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ও স্বভাব বর্ণনা করুন। হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু জবাবে বললেন : তোমরা কি কুরআন পাঠ করনি?

www.nagorikpathagar.org

كَانَ خُلُقُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقُرْاٰنَ۔

অর্থাৎ 'সমগ্র কুরআনটিই ছিল তাঁর চরিত্র'। (আবূ দাউদ)

কুরআন হচ্ছে শব্দ ও বাক্যের সমষ্টি আর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের ব্যাখ্যা।

মানুষের চরিত্র, অভ্যাস ও কাজ সম্পর্কে স্ত্রীর চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুকে বিয়ে করার পনের বছর পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের দাবি করেন। একজনের পক্ষে অপরাজনের স্বভাব, চরিত্র, অভ্যাস ইত্যাদি যথার্থরূপে জানার জন্য পনের বছরের সংসর্গ যথেষ্ট। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে নবুয়তের দাবি উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুয়তের বিরাট দায়িত্ব লাভ করে ঘাবড়ে যান, তখন হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করেন : 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ কখনো আপনাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছাড়বেন না। কেননা আপনি আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় করেন, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করেন, গরিবকে সাহায্য করেন, মেহমানকে আপ্যায়িত করেন, হকের পক্ষাবলম্বন করেন, আপনি বিপদে মানুষের সাহায্য করেন।" (বুখারী) চিন্তা করুন, এগুলো হচ্ছে তাঁর জীবনের বাস্তব কর্মময় জীবনের তৎপরতার দৃষ্টান্ত। নবুয়তের পূর্বেও তিনি এসব কাজ সম্পাদন করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের মাঝে হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-এর পর হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু নয় বছর তাঁর সাহচর্যে রয়েছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে অভিশাপ দিতে, কারো নিন্দা করতে বা কারো সাথে কর্কশ আচার-আচরণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। দুষ্কর্মের বিনিময়ে দুষ্কর্ম করতেন না; বরং ক্ষমা করে দিয়েছেন। গোনাহের কাজ থেকে বহু দূরে অবস্থান করেছেন। কখনো কারোর ওপর প্রতিশোধ

www.nagorikpathagar.org

নেননি। কখনো কোন চাকর-চাকরাণী, পুরুষ বা নারী এমনকি কোন পশুকেও কোনদিন আঘাত করেননি। কখনো কারো বৈধ আবেদন ও অনুরোধ নাকচ করেননি।

আত্মীয়দের মাঝে তাঁর দিনরাতের অবস্থা ও চরিত্র সম্পর্কে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-এর চেয়ে বেশি কেউই ওয়াকিফহাল ছিলেন না। তিনি শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ছিলেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা প্রফুল্ল, কোমল স্বভাবের ও সদাচারী ছিলেন। তাঁর প্রকৃতি ছিল করুণাসিক্ত। তিনি কঠোর প্রকৃতির ছিলেন না। কখনো কোন খারাপ কথা মুখ দিয়ে বের করতেন না। মানুষের দোষ ও দুর্বলতা খুঁজে অনুসন্ধানে লিপ্ত ছিলেন না। কারোর কোন অনুরোধ যদি তাঁর অপছন্দনীয় হত, তাহলে নীরব থাকতেন। সুস্পষ্ট জবাব দিয়ে তাকে ব্যথিত করতেন না এবং মঞ্জুরীও দান করতেন না। বুদ্ধিমান লোকেরা এ ব্যবহারের দ্বারাই প্রকৃত বিষয় বুঝতে পারে। এর কারণ হচ্ছে এটাই যে, কারো আশা নষ্ট করতে চান না, আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিনিয়ে নিয়ে কারো হৃদয়কে ব্যথিত করতেন না, আহত হৃদয়ে প্রফুল্লতা সৃষ্টি করা ছিল তাঁর কাজ। কেননা তিনি ছিলেন দয়ালু হৃদয় ও করুণাশীল।

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন : তিনি উদারচেতা, অত্যন্ত দানশীল, সত্যভাষী ও কোমল স্বভাব বিশিষ্ট ছিলেন। লোকেরা তাঁর কাছে বসে উৎফুল্ল হত। যে ব্যক্তি প্রথমবার তাঁকে দেখেছে সে ভীত হত। কিন্তু এরপর যতই তাঁর সংস্পর্শে অবস্থান করেছে ততই তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতে শুরু করেছে। (শামায়েলে তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী পাঠ করে ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গীবন অবিকল এ মতের প্রতিধ্বনি ব্যক্ত করেছেন।

হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-এর প্রথম স্বামীর পুত্র হযরত হিন্দ রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয়ে লালিত হন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোমল স্বভাব প্রকৃতির ছিলেন, কঠোর ছিলেন না। কারো মনে দুঃখ দেননি। কারো মর্যাদা বিরোধী কোন কথা বলতেন না। সামান্য সামান্য ব্যাপারে অন্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। কোন জিনিসকে মন্দ বলতেন না। যে প্রকারের খাদ্যই সামনে এসেছে– আহার করেছেন, একে মন্দ বলতেন না। নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো রাগান্বিত হতেন না, কারো কাছে থেকে বিনিময় বা প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না এবং কারো মনে দুঃখ দেয়া অপছন্দ করতেন, কিন্তু যদি কেউ কোন সত্য কথার বিরোধিতা করেছে; তাহলে সত্যের পক্ষাবলম্বনে রাগান্বিত হতেন এবং এ সত্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাতেন। (শামায়েল)

যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে নিকটবর্তী ও তাঁর সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন, এসবই হচ্ছে তাঁদের সাক্ষ্য। তাঁর বাস্তব কর্মময় জীবনে যে কত উন্নত ছিল, এসব বিবরণ থেকেই তা জানা যাবে। তাঁর চরিত্রের উজ্জ্বলতার প্রথম দিক হচ্ছে এটাই যে, নবী হিসেবে নিজের অনুসারীগণকে যেসব উপদেশ প্রদান করেন সর্বপ্রথম নিজেই সেগুলো পালন করেছেন।

তিনি মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন সবসময় আল্লাহ্কে স্মরণ করতে ও তাঁর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে। এ উপদেশের যে প্রভাব সাহাবাগণের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে তা অবশ্য স্বতন্ত্র। প্রশ্ন হচ্ছে তাঁর নিজ জীবনে প্রকাশ কী পরিমাণ ছিল? দিনরাতের এমন সময় খুব কমই ছিল যখন তাঁর অন্তর আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর কণ্ঠ আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ থেকে বিরত থেকেছে। ওঠা-বসা, চলাফেরা, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ, কাপড় পরিধান ইত্যাদি সর্বাবস্থায় ও সর্বসময় আল্লাহ্র নাম ও প্রশংসাবাণী তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হত। বর্তমান হাদীসগ্রন্থসমূহের একটি বিরাট অংশে তাঁর সেসব পবিত্র বাণী ও দোয়াগুলো লিখা রয়েছে। এগুলো বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন অবস্থায় তাঁর পবিত্র মুখ জারি হয়েছে। দু'শ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'হিসনে হাসীন' গ্রন্থটি শুধু এসব বাণী ও দোয়ার সমষ্টি। এর প্রতিটি বাক্য ও ছত্র আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব এবং আল্লাহভীতির সুস্পষ্ট প্রকাশ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ সব সময়ই ছিল এ প্রশংসায় নিমজ্জিত।



www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ সৎকর্মশীল বান্দাদের সাথে নির্দেশ করে বলেছেন :

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ ـ

'তারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং নিজেদের পার্শ্বদেশের ওপর শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।' (সূরা ইমরান, আয়াত : ১৯১)

আর এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব জীবনের চিত্র। এজন্য হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সময় ও প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত রয়েছেন।

তিনি মুসলমানদেরকে নামায পড়ার আদেশ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর নিজের অবস্থা কীরূপ ছিল? তাঁর অনুসারীগণকে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি নিজে আট ওয়াক্ত নামায পড়তেন। সূর্যোদয়ের পর ইশরাক, এরপর দিনের কিছু ওয়াক্ত অতীত হলে চাশত, এরপর যথাক্রমে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা। এরপর শেষরাতে তাহাজ্জুদ এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ফযরের নামায তিনি নিয়মিত পড়তেন। সাধারণ মুসলমানদের জন্য ফযরে দু'রাকাত, মাগরিবে তিন রাকাত এবং অবশিষ্ট তিন ওয়াক্তে চার রাকাত করে নামায ফরয। অর্থাৎ দিনরাতে মাত্র সতের রাকাত নামায ফরয। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে দিনরাত কমবেশি পঞ্চাশ-ষাট রাকাত নামায পড়তেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হবার পর তাহাজ্জুদের নামায সাধারণ মুসলমানদের জন্য মাফ করে দেয়া হয়। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নামাযটিও সারাজীবন প্রতি রাতেই আদায় করেছেন। আর তাঁর পবিত্র নামাযই বা কেমন ছিল? রাতভর দাঁড়িয়ে থেকেছেন। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তাঁর পবিত্র পা দুটি ফুলে যেত। হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহা বলতেন : আল্লাহ্ তো আপনাকে সকল দিক দিয়ে মাফ করে দিয়েছেন, এরপরও আপনার এত কষ্ট করার কি প্রয়োজন? তিনি বলতেন : হে আয়েশা! আমি কি আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হিসেবে পরিগণিত হব না? অর্থাৎ এ নামাযের উদ্দেশ্য আল্লাহ্র ভয় নয় বরং আল্লাহ্ প্রেম। রুকুতে তিনি বহুক্ষণ ঝুঁকে থেকেছেন, এমনকি লোকেরা মনে করেছে যে তিনি সিজদা করা ভুলে গিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

তিনি নবুয়তের সূচনাকাল থেকে নামায পড়তেন, কাফেররা তাঁর ঘোর বিরোধী ছিল। কিন্তু তবু তিনি হারেম শরীফে গিয়ে সবার সামনে নামায পড়তেন। অনেকবার নামায পড়া অবস্থায় কাফেররা তাঁর ওপর আক্রমণও করেছে। তবুও আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত হননি। কিন্তু কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চলাকালে নামায পড়া ছিল সবচেয়ে কঠিন ও সংকটজনক কাজ। দু'দলের সেনারা যুদ্ধে লিপ্ত। তীর-তরবারি এবং বর্শা মানুষের বুক বিদীর্ণ করছে। এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হল। সাথে সাথেই তিনি সাহাবীগণকে নামাযের জন্য কাতারবদ্ধ করলেন। বদরের যুদ্ধে সকল মুসলিম সেনাদল কাফেরদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র কাছে সিজদায় ঝুঁকে ছিলেন। সারা জীবনে তাঁর কোন নামায নির্ধারিত সময় থেকে ব্যতিক্রম হয়নি। আর দু'ওয়াক্ত ব্যতীত তাঁর কোন ওয়াক্তের নামায কাযাও হয়নি। একবার খন্দক যুদ্ধে ঘোরতর আক্রমণ চলাকালে কাফেররা আসরের নামায আদায়ের সুযোগ দেয়নি। আর একবার আর একটি যুদ্ধে-সফরে সারারাত চলার পর ফযরের নামাযের সময় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাই পরে কাযা নামায আদায় করেছেন। এর চেয়েও কঠিন অবস্থা ছিল তাঁর মৃত্যুকালীন সময়ে। তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। কষ্ট হচ্ছিল বর্ণনাতীত। কিন্তু নামায এমনকি জামাতের সাথে নামায পড়াও ত্যাগ করেননি, চলার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, এরপরও তিনি সাহাবীগণের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে এসেছেন। ইন্তিকালের তিনদিন পূর্বে একবার ওঠার চেষ্টা করে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তিনবারই এ অবস্থা হয়। তখন তাঁকে জামাতের সাথে নামায পড়া ত্যাগ করতে হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযার আদেশ দিয়েছেন। তা মুসলমানদের ওপর সারা বছরে মাত্র ত্রিশ দিন রোযা রাখা ফরয। কিন্তু তাঁর নিজের কী অবস্থা ছিল? রোযা ছাড়া তাঁর একটি সপ্তাহ এবং একটি মাসও অতিবাহিত হয়নি। হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন : যখন রোযা রাখা শুরু করতেন, তখন মনে হত তিনি আর কোন দিন ইফতার করবেন না। তিনি মুসলমানদেরকে রোযা রাখতে নিষেধ করেন, তাঁর নিজের অবস্থা ছিল এটাই যে কখনো কখনো দু'তিন

www.nagorikpathagar.org

দিন যাবত তিনি কিছুই খেতেন না এবং একটানা দু-তিন দিন রোযা রেখেছেন। এ সময়ে এক তিল পরিমাণ খাদ্যও তাঁর মুখে প্রবেশ করেনি। সাহাবীগণ যদি এ ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করতে চেয়েছেন তাহলে বলতেন : তোমাদের মধ্যে কে আমার মত? আমাকে তো আমার প্রভু পানাহার করান। বছরের দু'টি মাস রমযান এবং শাবান তাঁর পুরোপুরি রোযার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। প্রত্যেক মাসেই কয়েকদিন রোযার মধ্যে অতিবাহিত করতেন। প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। এ হল রোযার ব্যাপারে তাঁর বাস্তব জীবনের করণীয় কাজ।

মুসলমানদেরকে তিনি যাকাত ও সাদকাদানের আদেশ দিয়েছেন কিন্তু সর্বপ্রথম তিনি নিজে এ বিষয়ে আমল করে দেখিয়েছেন। হযরত খাদীজা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুর সাক্ষ্য আপনারা শুনেছেন। তিনি বলেছেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঋণগ্রস্তদের ঋণ শোধ করে দেন, গরিব ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেননি যে, তোমরা সবকিছু ত্যাগ করে আমার পেছনে এসে দাঁড়াও। তিনি ঘর-সংসার যথাসর্বস্ব দিয়ে দেয়ার আদেশও দেননি এবং আসমানি সাম্রাজ্যের দুয়ার ধনীদের জন্য বন্ধও করে দেননি; বরং শুধু এতটুকু আদেশ দিয়েছেন যে, নিজেদের আয়ের এক অংশ অন্যদের দান করে আল্লাহ্র হক আদায় করে নাও।

أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ 'তোমাদের যে সম্পদ প্রদান করেছি এর একটি অংশ আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর।' কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর নিজের নীতি ছিল এটাই যে, তাঁর কাছে যা কিছু এসেছে সবই আল্লাহ্র পথে খরচ করে দিয়েছেন। জেহাদ ও বিজয় অভিযানের ফলে অর্থসম্পদের আমদানি অপ্রচুর ছিল না। কিন্তু সেসব ছিল অন্যের জন্য, তাঁর নিজের জন্য কিছুই ছিল না। দারিদ্র্য ও অনাহার ছিল তাঁর চিরসাথী। খায়বার বিজয়ের পর অর্থাৎ সপ্তম হিজরি থেকে তিনি নিয়মিতভাবে তাঁর মহিয়সী ও পবিত্রচরিতা স্ত্রীগণকে সারা বছরের খোরাক দান করতেন। কিন্তু বছর শেষ হবার আগেই তাঁদের শস্য ফুরিয়ে যেত। কেননা, শস্যের বিরাট অংশ অভাবীদের কাছে চলে যেত।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার চেয়ে অধিক দানশীল ছিলেন এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণ দান করতেন তিনি রমযান মাসে। জীবনে কারো আবেদনের জবাবে তিনি কখনো 'না' বলেননি। তিনি কখনো কোন জিনিস একাকী খেতেন না। যত সামান্য পরিমাণ জিনিসই হোক না কেন, উপস্থিত সবাইকে তিনি তাঁর সাথে শরীক করতেন। তিনি সাধারণ আদেশ জারি করেছিলেন যে, 'যে মুসলমান ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার সংবাদ আমাকে জানাবে, আমি তার ঋণ শোধ করব। আর মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ-সম্পত্তির মালিক হবে তার ওয়ারিসগণ।' একবার এক বেদুইন এসে বলে : 'হে মুহাম্মদ! এ সম্পদ তোমার নয়, তোমার পিতারও নয়। এগুলো আমার উটের পিঠে চাপিয়ে দাও।' তিনি জোয়ার ও খেজুর দিয়ে তার উটের পিঠ বোঝাই করে দেন এবং এভাবে বলার জন্য মোটেই ক্রোধান্বিত হলেন না। তিনি নিজে বলতেন–

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللهُ يُعْطِيْ۔

অর্থাৎ 'আমি তো হচ্ছি বিতরণকারী ও খাজাঞ্চী এবং প্রকৃত দাতা হচ্ছেন আল্লাহ্।' হযরত আবূ যর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন, একবার রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হেঁটে যাচ্ছিলাম। পথে তিনি বললেন : হে আবূ যর! যদি ওহুদের এ পাহাড়টি আমার জন্য সোনায় রূপান্তরিত হয়, তাহলে তিনরাত পর এর মধ্য থেকে একটি দীনারও আমার কাছে অবশিষ্ট থাকা আমি পছন্দ করব না। কিন্তু যদি কোন ঋণ থাকে তাহলে তা শোধ করার জন্য হয়তো কিছু রাখব।'

বন্ধুগণ! এগুলো শুধু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিত্তাকর্ষক বাণীই ছিল না বরং এ ছিল তাঁর যথার্থ সঙ্কল্পের প্রকাশ এবং তিনি এ সবই কার্যকর করেছেন। বাহরাইন থেকে একবার রাজস্ব বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ আসে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ওগুলো মসজিদের ওঠানে ঢেলে দেয়া হোক!

www.nagorikpathagar.org

ফযরের নামাযের জন্য যখন তিনি মসজিদের এলেন তখন সম্পদের স্তূপের দিকে চোখ ওঠিয়ে দেখলেন না। নামাযের পর স্তূপের কাছে বসে বিতরণ শুরু করলেন। যখন সব শেষ হয়ে যায় তখন জামা-কাপড় ঝেড়ে এমনভাবে ওঠে পড়লেন যেন এগুলো ছিল ময়লা আবর্জনা এবং এগুলো লেগে তাঁর জামা-কাপড় নষ্ট হয়েছিল। একবার ফিদাক থেকে চারটি উট বোঝাই শস্য এল। কিছু ঋণ ছিল, হযরত তা আদায় করলেন। কিছু ভাগ করলেন। এরপর তিনি বেলাল রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন : আর কিছু অবশিষ্ট নেই তো? জবাব এল : আর কোন প্রার্থী নেই, তাই কিছুটা রয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যতক্ষণ পার্থিব এ সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ আমি ঘরে প্রবেশ করতে পারি না। কাজেই রাতটি মসজিদে কাটালেন। সকালে হযরত বেলাল রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু এসে সুখবর শুনালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে দায়িত্বমুক্ত করেছেন।' অর্থাৎ যা কিছু ছিল সব বিতরণ করা হয়েছে। তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। একবার আসরের নামাযের পরই ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আবার সাথে সাথে বের হয়ে এলেন। লোকেরা অবাক হল। তিনি বললেন, 'নামাযের মধ্যে আমার মনে হল যে, ছোট এক টুকরা সোনা আমার ঘরে রয়ে গিয়েছে। মনে হল, রাত আসা পর্যন্ত যেন তা মুহাম্মদের ঘরে পড়ে না থাকে। হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখিত ও বিষণ্ন বদনে ঘরের ভেতর এলেন। আমি কারণ জিজ্ঞেস করেছি। বললেন, 'উম্মে সালামা! গতকাল যে সাতটি দীনার এসেছিল, তা আজ সারাটি দিন অতীত হয়ে যাবার পরও এখন সন্ধ্যা নাগাদ আমার বিছানার ওপর পড়ে আছে।' এর চেয়েও বড় ঘটনা হচ্ছে এটাই যে, তিনি যখন মৃত্যু পীড়ায় আক্রান্ত, ভীষণ রোগকষ্ট ও অস্থিরতা উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ মনে হল কয়েকটি আশরাফী ঘরে রয়েছে। আদেশ হল, 'এখনি ওগুলো খয়রাত করে দাও। মুহাম্মদ কি তার প্রতিপালকের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার পেছনে তার ঘরে আশরাফী পড়ে থাকবে?'

www.nagorikpathagar.org

এ অধ্যায়ে বর্ণিত এ বিষয়গুলোই তাঁর কর্মজীবনের বাস্তব দৃষ্টান্ত। তিনি কৃচ্ছ্রতাসাধন ও অল্প-তুষ্টির শিক্ষা দান করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর নিজের কর্ম পদ্ধতি কী ছিল? আগেই শুনেছেন যে, আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ জিযিয়া, খারাজ, উশর, যাকাত ও সাদকা মদীনায় স্তূপীকৃত এসেছিল। কিন্তু সমগ্র আরবের শাসনকর্তার ঘরে আগেরই মত অভাব ও অনাহারের ধারাই চলছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত 'আয়েশা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পৃথিবী থেকে চলে গেছেন, কিন্তু কখনো দুবেলা পেট ভরে খেতে পারেননি।' তিনি আরো বলেন, ' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় তাঁর ঘরে সেদিনের খাবার জন্য সামান্য জোয়ার ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। আর কয়েক সের জোয়ারের বিনিময়ে এক ইহুদীর কাছে তাঁর লৌহবর্ম বন্ধক রাখা ছিল। তিনি বলতেন : আদম সন্তানের এ কয়েকটি বস্তু ছাড়া আর কোন কিছুরই অধিকার নেই : বসবাসের জন্য একটি কুঁড়েঘর, লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরা কাপড় এবং ক্ষুধা মেটাবার জন্য শুকনো রুটি ও পানি।' (তিরমিযী)

এগুলো নিছক মনোমুগ্ধকর কথাই ছিল না কিন্তু এ ছিল তাঁর জীবনযাত্রার বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রতিফলন। তাঁর বসবাসের জন্য ছিল মাত্র একটি ঘর। তার দেয়াল ছিল কাঁচা এবং ছাদ ছিল খেজুর পাতা ও উটের চুলে ছাওয়া। হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় কখনো পাট করে সাজিয়ে রাখা হত না। অর্থাৎ তিনি যে কাপড় পরতেন, তা ছাড়া কোন অতিরিক্ত কাপড়ও তাঁর ছিল না, যা পাট করে রাখা যায়। একদা এক ভিক্ষুক তাঁর কাছে এসে বলে, 'আমি বড় ক্ষুধার্থ।' তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে বলে পাঠালেন কিছু খাবার যদি থাকে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য। প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে থেকে জবাব এল, ঘরে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। হযরত আবূ তালহা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু বললেন : একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি মসজিদে মাটির ওপর শুয়ে আছেন এবং ক্ষুধার তাড়নায় এপাশ-ওপাশ করছেন। একবার সাহাবীগণ তাঁর খিদমতে অনাহারের অভিযোগ করলেন এবং পেটের কাপড় সরিয়ে দেখালেন

www.nagorikpathagar.org

সেখানে একটি পাথর বাঁধা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁর পেটের কাপড় সরালেন, সেখানে একটির পরিবর্তে দু'টি পাথর বাঁধা ছিল। অর্থাৎ তিনি দু'দিন থেকে অনাহারে ছিলেন। অধিকাংশ সময় ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাঁর গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে যেত। একদিন ঘর থেকে বের হলেন; তখন তিনি অনাহারে ছিলেন। তিনি হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-র ঘরে যান। হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী বাগান থেকে খেজুর কেটে আনলেন এবং আহারের ব্যবস্থা করলেন। খাবার সামনে আসার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রুটির ওপর সামান্য গোশত রেখে বললেন, এটি ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-এর কাছে পাঠাও, কয়েকদিন থেকে তার ভাগ্যে খাবার জোটেনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু ও দৌহিত্র হাসান হোসাইনকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কিন্তু আরবের শাসনকর্তা তাঁর এ ভালবাসাকে মূল্যবান পোশাক ও সোনা-রূপার অলংকারের মাধ্যমে প্রকাশ করেননি। একবার তিনি হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু প্রদত্ত একটি সোনার হার হযরত ফাতিমার গলায় দেখে। বললেন : হে ফাতিমা, তুমি কি লোকের মুখ থেকে একথা শুনতে চাও যে মুহাম্মদের কন্যা গলায় আগুনের শিকল বেঁধে নিয়েছে? হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু তখনই গলা থেকে হার খুলে বিক্রি করে দেন এবং এর মূল্য দিয়ে একটি গোলাম খরিদ করে আযাদ করেন। অনুরূপভাবে একবার হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু সোনার কঙ্কন পরিধান করলে তিনি তা খুলে দেন এবং বলেন 'এটি মুহাম্মদের স্ত্রীর উপযোগী নয়।' তিনি বললেন, 'একজন মুসাফিরের জন্য যে পরিমাণ পাথেয় প্রয়োজন মানুষের জন্য জগতে ঠিক ততটুকুই যথেষ্ট।' এসব তাঁর উক্তি। তাঁর কাজও ছিল এর সাথে পূর্ণ সঙ্গতিশীল। একবার কিছু সাহাবী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে দেখেন, তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইর গভীর দাগ পড়ে রয়েছে। বললেন : হে আল্লাহর রাসূল। আমরা আপনার জন্য একটি নরম তোষক তৈরি করে আনতে চাই। জবাবে বলেন, 'দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? জগতের সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক

www.nagorikpathagar.org

ততটুকু যতটুকু একজন ঘোড়সওয়ারের সম্পর্ক গাছের ছায়ার সাথে, যে পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করে। এরপর আবার নিজের পথে এগিয়ে চলে।' নবম হিজরীতে যখন ইসলামী রাষ্ট্র ইয়ামান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল : পরনের একটি তহবন্দ, একটি বিছানা ছাড়া খাট, খোর্মার ছালে ভরা একটি বালিশ, এক কোণে সামান্য পরিমাণ জোয়ার, একদিকে একটি পশুর চামড়া এবং খুঁটিতে ঝুলানো একটি পানির মশক।

তিনি যে কৃচ্ছ্র সাধন ও অল্পতুষ্টির শিক্ষা দান করেছিলেন একে নিজের জীবনেও এভাবে বাস্তবায়িত করেছিলেন।

বন্ধুগণ! ত্যাগ এবং কুরবানি সম্পর্কে অনেককে বক্তৃতা দিতে শুনেছেন। কিন্তু তাদের কারো জীবনে এর বাস্তব চিত্রও দেখেছেন কি? এর চিত্র দেখতে পারেন, মদীনার অলিতে-গলিতে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে ত্যাগের শিক্ষা দান করেন এবং এ সাথে তাদের সামনে নিজের আদর্শও স্থাপন করেন। বলাবাহুল্য হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-কে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিন্তু হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-র অবস্থা এরূপ ছিল যে, যাঁতা পিষতে পিষতে তাঁর হাতের তালুতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল এবং মশকে করে পানি আনতে আনতে বুকে দাগ পড়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় একদিন তিনি পিতার কাছে উপস্থিত হয়ে একটি খাদেম দান করার জন্য আবেদন করেন। জবাবে বলেন : 'হে ফাতিমা! এখনো সুফ্ফার গরিবদের সুরাহা করতে পারিনি। এমতাবস্থায় তোমার আবেদন কেমন করে পূর্ণ করা যাবে? বর্ণনান্তরে বলা হয়েছে : 'হে ফাতিমা! বদরের ইয়াতিমরা তোমার পূর্বে আবেদন জানিয়েছে। একবার তাঁর কাছে চাঁদর ছিল না, এক মহিলা সাহাবী একটি চাঁদর এনে তাঁকে দেন। তখনই এক ব্যক্তি বলেন, কি চমৎকার চাঁদর! তিনি চাঁদরটি তাকে দিয়ে দেন। এক সাহাবীর ঘরে কোন উৎসব ছিল, কিন্তু তাঁর কাছে কোন আহার্য দ্রব্য ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'আয়েশার কাছে গিয়ে আটা চেয়ে নিয়ে এস।' তিনি গিয়ে আটা আনলেন। অথচ সেদিন রাসূলুল্লাহ্

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে সে আটা ব্যতীত আর কোন খাদ্য বস্তুই ছিল না। একদিন সুফ্ফার গরিবদের নিয়ে হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহার ঘরে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, 'যা খাদ্য আছে হাজির কর।' আটার ভূসির হালুয়া হাজির করা হল। তা যথেষ্ট হল না। আরো কিছু খাদ্য চান। তখন খোর্মার হারীরা (পানীয়) পেশ করা হল। এরপর দুধের পেয়ালা এল কিন্তু মেহমানদারীর জন্য এটিই ছিল ঘরের সর্বশেষ অবলম্বন মাত্র।

এসব ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্যাগ। নিজের জীবনে তিনি এভাবেই তার বাস্তব রূপ দেখিয়েছেন।

আপনারা আল্লাহর প্রতি আস্থা ও নির্ভরতার চিত্র দেখতে হলে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আল্লাহর নির্দেশ ছিল :

وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔

'মহাপ্রতাপশালী নবী-রাসূলগণ যে সবর ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, তুমিও তেমনি সবর ও দৃঢ়তা দেখাও।' (সূরা আহক্বাফ, আয়াত : ৩৫)

অবশ্য তিনি ঠিক তেমনি সবর ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। এমন একটি মূর্খ ও অশিক্ষিত জাতির মাঝে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যারা তাদের বিশ্বাস ও আকিদাসমূহের বিরুদ্ধে একটি কথাও শুনতে পারত না এবং এজন্য প্রাণ সংহারে উদ্যোগী হত। কিন্তু তিনি কখনো এসবের পরোয়া করেননি। হারেম শরীফের কেন্দ্রে গিয়ে তিনি তাওহীদের বাণী বুলন্দ করতেন এবং সেখানে সবার সামনে নামায পড়তেন। হারেম শরীফের ওঠানে বসত কুরাইশ সর্দারদের মজলিস। তাদের সামনেই নামাজে দাঁড়িয়ে তিনি রুকু ও সিজদা করতেন।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔

'হে মুহাম্মদ! তোমাকে যে হুকুম করা হয়, তা সরবে ঘোষণা কর।' আয়াতটি নাযিল হবার পর তিনি সাফা পাহাড়ে ওঠে কুরাইশগণকে আহ্বান জানালেন ও আল্লাহর হুকুম শুনিয়ে দেন।

www.nagorikpathagar.org

কুরাইশরা তাঁর সাথে চরম দুর্ব্যবহার করেছে। হারেম শরীফের ভিতরে তাঁর পবিত্র দেহে নাপাক বস্তু নিক্ষেপ করেছে। গলায় চাঁদর জড়িয়ে তাঁকে ফাঁসি দেয়ার চেষ্টা করেছে। তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এরপরও আল্লাহর পথে তাঁর পদদ্বয় একটুও টলমল করেনি। পথ থেকে এক চুলও বিচ্যুত হননি। আবূ তালিব যখন তার সমর্থন ওঠিয়ে নেয়ার 'ইঙ্গিত দেয়, তখন তিনি কেমন আবেগ ও উৎসাহভরে বললেন : 'চাচাজান! যদি কুরাইশরা আমার ডান হতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্র এনে রাখে, তবুও আমি এ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব না।' অবশেষে তাঁকে বনু হাশেমের গিরিসঙ্কটে প্রায় তিন বছর আবদ্ধ করে রাখা হয়। তাঁকে ও তাঁর বংশকে সামাজিক বয়কট করা হয়। ভেতরে শস্য সরবরাহ বন্ধ করা হয়। শিশুরা ক্ষুধায় চিৎকার করতে থাকে। যুবকরা গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। অবশেষে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়। এ সব কিছুই সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু তিনি কখনো অধৈর্য ও দিশেহারা হননি। হিজরতের সময় 'সাওর' গুহায় আশ্রয় নেন। কাফেররা তাঁর অনুসরণ করে গুহার মুখে পৌঁছে যায়। নির্বান্ধব ও অসহায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁর শত্রু সশস্ত্র কুরাইশদলের মাঝে মাত্র কয়েক গজের ব্যবধান ছিল। সাথী আবূ বকর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু শঙ্কিত হন। বলেন, 'হে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা মাত্র দুজন।' কিন্তু বিশ্বাস ও প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ একটি আওয়াজ হল : 'হে আবূ বকর! আমরা দুজন নই, তিনজন لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ভীত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।'

এ হিজরতের পথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গ্রেফতার করার জন্য সুরাকা ইবনে জাসাম ঘোড়ার পিঠে চড়ে বর্শা হাতে নিয়ে তাঁর কাছে ছুটে আসে। হযরত আবূ বকর রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন : 'হে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা গ্রেফতার হয়ে যাচ্ছি।' কিন্তু রাসূলে আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো

www.nagorikpathagar.org

যথারীতি কুরআন পাঠ করে চলেছেন। তাঁর অন্তর তখনো গভীর প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল।

মদীনায় পৌঁছার পর ইহুদী মুনাফিক ও কুরাইশ হামলাকারীদের ভয় সৃষ্টি হল। সাহাবীগণ রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবাসস্থল পাহারা দেন। সে যমানায়ই একদিন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তোমাকে লোকদের হাত থেকে রক্ষা করবেন।' তখন তিনি তাঁবু থেকে মাথা বের করে পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত সৈনিকদেরকে বললেন : 'তোমরা চলে যাও, আমাকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও! আমার আল্লাহ্ নিজেই আমার রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।'

নাজদ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তিনি একটি গাছের নীচের বিশ্রাম করছিলেন। আর সাহাবীগণ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন নাঙ্গা তরবারি নিয়ে হাজির হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেগে ওঠেন। পরিস্থিতির ভয়াবহতার কথা একবার চিন্তা করুন! বেদুইন জিজ্ঞেস করে : 'হে মুহাম্মদ! এবার তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে কে?' গভীর প্রশান্তি ও নিরুদ্বেগ জবাবের ধ্বনি ধ্বনিত হয় : 'আল্লাহ্'! এ শক্তিপূর্ণ জবাবে শত্রু প্রভাবিত হয়। তার তরবারি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

বদরের যুদ্ধ চলছে। প্রায় তিন'শ নিরস্ত্র মুসলমান এক হাজার লৌহবর্ম পরিহিত সশস্ত্র কুরাইশ সেনার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত। কিন্তু সে তিন'শ সৈনিকের প্রধান সেনাপতি কোথায়? তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃথক একস্থানে আল্লাহ্র দরবারে হাত তুলে দোয়ায় মশগুল। কখনো কপাল মাটিতে ছোঁয়াচ্ছেন, আবার কখনো আসমানের দিকে হাত তুলে বলছেন : 'হে আমার আল্লাহ্! যদি আজ এ ছোট্ট দলটি বিশ্ব থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে এ বিশ্বে তোমার ইবাদতকারীদের আর কোন নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকবে না।'

www.nagorikpathagar.org

এমন সময়ও উপস্থিত হয়েছিল যখন মুসলমানরা নিজেদের স্থান ছেড়ে দিয়ে পেছনে সরে এসেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র সাহায্যের ওপর পূর্ণ আস্থাশীল ও পরিপূর্ণ নির্ভরকারী নবী পাহাড়ের ন্যায় স্বস্থানে অটল ও অবিচল রয়েছেন। ওহুদের যুদ্ধে অধিকাংশ মুসলমান পেছনে সরে এল; কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বস্থানে অটল রয়েছেন, পাথরের আঘাত সহ্য করলেন, তীর, তরাবারি ও বর্শার দ্বারা তাঁর ওপর হামলা চালানো হচ্ছিল। লৌহ শিরস্ত্রাণের কড়া তাঁর পবিত্র মাথায় বিদ্ধ হয়েছিল, তাঁর দাঁত মুবারক শহীদ হয়েছিল, মুখমণ্ডল আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছিল, কিন্তু তখনো তিনি ইস্পাত কঠিন মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন এবং আল্লাহর সাহায্যের ওপর আস্থা রেখেছেন ও নির্ভর করেছেন, কেননা আল্লাহর হিফাজতের ওপর তিনি পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। হুনায়েনের ময়দানে একবার যখন দশ হাজার তীর বারিধারার ন্যায় নিক্ষেপ হয়েছিল তখন কিছুক্ষণের জন্য মুসলমানরা সরে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বস্থানে অবিচল থাকেন। চতুর্দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষেপ হচ্ছিল। তিনি বলেন–

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ * اَنَا اِبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

'আমি মিথ্যা নবী নই, আমি আবদুল মুত্তালিবের প্রপুত্র'-এর আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছিল। তিনি সওয়ারী থেকে নীচে নেমে বললেন : 'আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও নবী' এরপর আবার দোয়ার জন্য হাত ওঠালেন।

বন্ধুগণ! আপনারা কি এমনি অদ্ভুত বীরত্ব, সাহসিকতা ও দৃঢ়তার অধিকারী সিপাহসালারের কথা শুনেছেন যিনি নিতান্তই স্বল্পসংখ্যক সহযোগী ও নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও এবং সঙ্গীগণের পশ্চাদপসরণের পরও নিজের প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করেননি, আত্মরক্ষার জন্য তরবারিও ওঠাননি; বরং পার্থিব অস্ত্রে নিরস্ত্র হয়েও শুধু আসমানী শক্তি দ্বারা শক্তিমান হবার জন্য আবেদন করেছেন?

এ পথে এ ছিল তার কর্মজীবনের বাস্তব দৃষ্টান্ত। আপনারা শত্রুকে ভালবাসার উপদেশ শুনেছেন। কিন্তু তার বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখেননি। আসুন! মদীনার রাসূলের মধ্যে আমি আপনাদেরকে তা দেখাচ্ছি। মক্কার অবস্থার

www.nagorikpathagar.org

কথা বাদই দিচ্ছি। কেননা আমার মতে অধীনতা, অসহায়তা ও অক্ষমতা হচ্ছে ক্ষমা, করুণা ও দয়ার সমর্থক। হিজরতের সময় কুরাইশ সর্দাররা ঘোষণা করে যে, মুহাম্মদের শিরচ্ছেদ করে আসবে, তাকে একশটি উট পুরস্কার দেয়া হবে।

সুরাকা ইবনে জা'সাম এ পুরস্কারের লোভে তাঁর পেছনে ঘোড়া নিয়ে ছুটে। সে একেবারে কাছে পৌঁছে যায়। হযরত আবূ বকর শঙ্কিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন। তিনবার তার ঘোড়ার পা বালির মধ্যে বসে যায়। সুরাকা তীর ও পাল্লা বের করে ভাগ্য গণনা করে। প্রতিবার জবাব এল মুহাম্মদের অনুসরণ করবে না। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে সুরাকা ভীত হয়ে পড়েছিল। সে ফিরে যাবার সংকল্প করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ডেকে সে প্রাণরক্ষার জন্য আবেদন জানিয়ে বলে : যখন আপনাকে আল্লাহ কুরাইশদের ওপর বিজয় দান করবেন, তখন অনুগ্রহ করে আমার প্রাণরক্ষা করতে হবে। তিনি এ সম্পর্কিত ওয়াদাপত্র লিখিয়ে তার হাতে সোপর্দ করলেন। মক্কা বিজয়ের পর সে ইসলাম গ্রহণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সেদিন তার অপরাধ সম্পর্কে কোন কিছু জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেননি।

আবূ সুফিয়ান কে? যে বদর, ওহুদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধী সেনাদলের সর্দার ছিল। যে হাজার হাজার মুসলমানের জীবননাশের কারণ। যে নিজে কয়েকবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে' হত্যা করার সিদ্ধান্ত করেছিল। যে প্রতি পদে-পদে ইসলামের ঘোরতর শত্রু প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পূর্বে যখন হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-এর সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত হল, তখন যদিও তাঁর প্রতিটি অপরাধ তাঁর মৃত্যুদণ্ডের দাবি করছিল, তবুও করুণার মূর্তপ্রতীক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ সুফিয়ানকে বললেন : 'ভয়ের কোন কারণ নেই, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশোধ গ্রহণের অনেক উর্ধ্বে।'

www.nagorikpathagar.org

এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু তাঁকে ক্ষমাই করলেন না; বরং এটাও বললেন :

مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِىْ سُفْيَانَ كَانَ اٰمِنًا۔

অর্থাৎ 'যে আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সেও নিরাপত্তা লাভ করবে।'

হিন্দা আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী। ওহুদের যুদ্ধে সে তার বান্ধবীদের সাথে নিয়ে গিয়েছিল। রণোন্মাদনা সৃষ্টিকারী গান গেয়ে কুরাইশ সেনাদের মনোবল বৃদ্ধি করেছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চাচা ও ইসলামের বীরযোদ্ধা হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু-এর লাশের সাথে চরম বেয়াদবী করেছিল। তাঁর বুক চিরে ফেলেছিল, তাঁর নাক-কান কেটে হার বানিয়েছিল এবং তাঁর কলিজা দাঁত দিয়ে চিবোতে চাচ্ছিল। যুদ্ধ শেষে এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন সেও ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির হল এবং এখানেও বেয়াদবী করতে কসুর করেনি। তবু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একবার জিজ্ঞেসও করলেন না– তুমি এমন করছ কেন? এ সর্বজনীন ক্ষমার অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সে চিৎকার করে বলে : হে মুহাম্মদ! আজকের আগে আমার কাছে তোমার তাঁবুর চেয়ে অন্য কারো তাঁবু অধিক ঘৃণ্য ছিল না, কিন্তু আজ তোমার তাঁবুর চেয়ে আর কারোর তাঁবু আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়।

তায়েফ বিজয়ের পর হযরত হামযা (রা)-এর হত্যাকারী 'ওয়াহশী' পলায়ন করে। এরপর সে স্থানটিও মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়। তখন সে অন্য কোন আশ্রয় পেল না। লোকেরা বলে : 'হে ওয়াহশী! তুমি এখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পারনি। একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয় ব্যতীত তোমার জন্য দ্বিতীয় কোন নিরাপদ আশ্রয় নেই। ওয়াহশী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির হল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে চোখ নামিয়ে নেন। প্রিয় চাচার শাহাদতের দৃশ্য তাঁর চোখে ভেসে ওঠে। দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। হত্যাকারী সামনে হাজির, কিন্তু তিনি শুধু এতটুকু বললেন : 'হে ওয়াহশী! আমার সামনে এস না। তোমাকে দেখলে আমার শহীদ চাচার স্মৃতি মনে পড়ে যায়।'

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম, মুসলমান ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সবচেয়ে কষ্টদানকারী আবূ জাহলের পুত্র হচ্ছেন ইকরিমা রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু। ইকরিমা নিজেও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু যখন মুসলমানরা মক্কা জয় করেন তখন তাঁর নিজের ও খান্দানের সকল অপরাধের কথা স্মরণ করে ইয়েমেনে পালিয়ে যান। তাঁর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যথার্থরূপে চেনেন। তিনি নিজে ইয়েমেনে গিয়ে ইকরিমাকে অভয় দান করেন এবং তাকে সাথে করে মদীনায় আসেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আসার খবর শুনে তাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য এত দ্রুত ওঠে দাঁড়ালেন যে, তাঁর পবিত্র দেহে চাঁদরও ছিল না। এরপর আনন্দের আতিশয্যে বললেন :

مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ ـ

'হে হিজরতকারী সওয়ার! তোমার আগমন শুভ হোক।' চিন্তা করুন, কাকে এ মুবারকবাদ দান করা হচ্ছে! কার আগমনে এ আনন্দ! কাকে এভাবে ক্ষমা করা হচ্ছে। যার পিতা তাঁকে মক্কায় সর্বাধিক কষ্ট দিয়েছিল, তাঁর পবিত্র দেহে ময়লা নিক্ষেপ করেছিল, নামাযরত অবস্থায় তাঁর ওপর হামলা করতে চেয়েছিল, তাঁর গলায় চাদর বেঁধে তাঁকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল, দারুন্নদওয়ায়' তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিল, বদরের যুদ্ধ শুরু করেছিল এবং সব রকমের সন্ধি ও চুক্তি ব্যর্থ করে দিয়েছিল। আজ তার ঔরসজাত পুত্রের আগমনে এ আনন্দ মুবারকবাদ!

হেবার ইবনুল আসওয়াদ একদিকে রাসূল-দুহিতা হযরত যয়নব রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু-এর হত্যাকারী এবং অন্যদিকে ইসলামের আরো বহু ক্ষতি করেছে। মক্কা বিজয়ের সময় তার রক্ত হালাল ঘোষণা করা হয়। সে ইরানে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পরে কি চিন্তা করে সোজা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে

www.nagorikpathagar.org

হাজির হয়ে বলে : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ধৈর্যের কথা স্মরণ করে ফিরে এলাম। আমার অপরাধের যে সব বিবরণ আপনি শুনেছেন তা যথার্থ। এতটুকু শুনতেই তাঁর রহমতের দুয়ার খুলে যায় এবং বন্ধু ও শত্রুর পার্থক্য ওঠে যায়।

উমাইর ইবনে ওহাব বদর যুদ্ধের পর এক কুরাইশ সর্দারের ষড়যন্ত্রক্রমে নিজের তরবারিতে বিষ মাখিয়ে মদীনায় প্রবেশ করে সুযোগ মত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করার অপেক্ষায় থাকে। এ সময় হঠাৎ একদিন সে গ্রেফতার হয়ে যায়। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত করা হয়। তার অপরাধ প্রমাণিত হয়। কিন্তু তবুও তিনি তাকে মুক্তিদান করেছেন।

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করার জন্য উমাইর-কে পঠিয়েছিল এবং তার সাথে ওয়াদা করেছিল যে, এ অভিযানে যদি সে নিহত হয়, তাহলে তার উদ্দেশ্য ছিল সমুদ্র পথে ইয়েমেনে চলে যাবে। আর উমাইর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বলে :

'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! গোত্র-প্রধান সাফওয়ান ভয়ে পালাচ্ছে, সে নিজেকে সমুদ্রের বুকে নিক্ষেপ করতে চায়।' জবাবে বলেন : যাও তাকে বল– তাকে নিরাপত্তা দান করা হল।' উমাইর আরো বলে : এ নিরাপত্তার কোন প্রতীক দান করুন, যেন সে বিশ্বাস করতে পারে।' তিনি নিজের পাগড়ি প্রতীকস্বরূপ তাকে দান করলেন। উমাইর এ পাগড়ি নিয়ে সাফওয়ানের কাছে পৌঁছে। সাফওয়ান বলে : মুহাম্মদের কাছে যেতে আমি প্রাণনাশের আশঙ্কা করছি।' যে উমাইর বিষ মেশানো তলোয়ার নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে গিয়েছিল, সে সাফওয়ানকে বলে : 'হে সাফওয়ান! এখনো তুমি মুহাম্মদের ধৈর্য ও ক্ষমার কথা জান না।' সাফওয়ান রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বলে : 'আমাকে বলা হয়েছে যে তুমি আমাকে নিরাপত্তা



www.nagorikpathagar.org

প্রদান করেছ, এ কথা কি সত্য?' বললেন : হ্যাঁ, সত্য। সাফওয়ান বলে : কিন্তু আমি তো তোমার আনীত ধর্ম কবুল করতে পারব না। আমাকে দু'মাসের সময় দেয়া হোক।' বললেন, দু'মাসের কেন, চার মাসের সময় দেয়া হল। কিন্তু এ সময় শেষ হবার আগেই হঠাৎ তার মনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে তিনি মুসলমান হয়ে যান।

## ইহুদী নারী কর্তৃক খাদ্যে বিষপ্রয়োগ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরে যান। এটি ছিল ইহুদী শক্তির প্রধান কেন্দ্র। যুদ্ধ সংঘটিত হল। তিনি শহর জয় করেন। এক ইহুদী তাঁকে দাওয়াত করে। তিনি ইতস্তত না করেই দাওয়াত কবুল করেন। ইহুদী মহিলা খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দেয়। তিনি খাদ্যে মুখ দিয়েই বুঝতে পারেন। ইহুদী মহিলাকে ডাকা হল। সে অপরাধ স্বীকার করে। কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামীনের দরবার থেকে তাকে কোন শাস্তি দান করা হল না। অথচ তিনি এ বিষের প্রভাব আজীবন অনুভব করেছিলেন।

নজদ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তিনি একাকী একটি গছের নীচে বিশ্রাম করছিলেন। তাঁর তলোয়ার গাছের ডালে ঝুলছিল। কাছে কেউ ছিল না। এক বেদুঈন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সাহাবাগণ এদিক-ওদিক গাছের ছায়ায় শায়িত ছিল। সে সোজা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এল। গাছ থেকে তরবারি খুলে নিয়ে কোষমুক্ত করে বলে : 'হে মুহাম্মদ! এবার কে তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে?' হযরতের অবিচলিত কণ্ঠের আওয়াজ এল– 'আল্লাহ্ আমায় রক্ষা করবেন।' এ অপ্রত্যাশিত জবাব শুনে বেদুঈন হতচকিত ও ভীত হয়ে যায়। সে তরবারি কোষবদ্ধ করে। সাহাবীগণ পৌছে যান। বেদুঈন বসে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছুই বললেন না। একবার একজন কাফেরকে গ্রেফতার করে আনা হল। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পৌছে তাঁকে দেখে ভীত হল। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : 'তুমি আমাকে হত্যা করতে চাইলেও হত্যা করতে সক্ষম হবে না।'

www.nagorikpathagar.org

মক্কা যুদ্ধে ৮০ জনের একটি দল গ্রেফতার হয়। তারা তানঈম পাহাড় থেকে নেমে তাঁকে হত্যা করতে চাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে বললেন : 'ওদেরকে ছেড়ে দাও।'

বন্ধুগণ! তায়েফের নাম শুনেছেন? যে তায়েফ মক্কা জীবনের কঠোর নির্যাতনকালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আশ্রয় দান করেনি। এমন কি তাঁর কথাও শুনতে চায়নি। সেখানকার সর্দার আবদ ইয়ালীলের খান্দান তাঁকে বিদ্রূপ করেছিল। বাজারের লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্রূপ করার জন্য লেলিয়ে দিয়েছিল। শহরের গুণ্ডাদল চারদিক থেকে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর সর্দার প্রধানেরা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন দু'দিক থেকে তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ হচ্ছিল। এমন কি তাঁর পবিত্র পা দুটি আহত হয়ে গিয়েছিল এবং জুতা রক্তে ভরে গিয়েছিল। তিনি ক্লান্ত হয়ে যখন বসে পড়ছিলেন, তখন সে দুষ্টের দল তাঁর হাত ধরে তুলে দেয়। তিনি আবার চলতে শুরু করলে ওরা পাথর নিক্ষেপ করে। সেদিন তাঁর এত কষ্ট হয়েছিল যে, নয় বছর পর একদিন হযরত আয়েশা (রা) আনহা যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন : 'হে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সারাজীবনে আপনার ওপর সর্বাপেক্ষা কঠিন ও কষ্টকর দিন এসেছিল কোন সময়?' জবাবে তিনি এ তায়েফের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

৮ম হিজরীতে মুসলিম সেনাদল তায়েফ অবরোধ করেন। অবরোধ বেশ কিছুকাল স্থায়ী হয়। দুর্গ বিজিত হয় না। বহু মুসলমান শহীদ হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে যাবার সঙ্কল্প করলেন। উৎসাহী মুসলমানরা মানতে রাজী হচ্ছিল না, তারা তায়েফের জন্য বদ দোয়া করার আবেদন জানান। তিনি হাত ওঠালেন। কিন্তু কি বললেন? 'হে আমার আল্লাহ! তায়েফকে হিদায়াত দান কর। তাকে ইসলামের কাছে নত কর।' বন্ধুগণ! কোন শহরের জন্য তিনি এ দোয়া করছেন? যে শহর তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করে, তাঁকে আহত করেছিল এবং আশ্রয় দানে অস্বীকার করেছিল।

www.nagorikpathagar.org

ওহুদ যুদ্ধে শত্রুরা হামলা করে। মুসলমানরা পিছু হটে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হলেন। তাঁর ওপর তীর, তলোয়ার ও পাথর নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। তাঁর দাঁত শহীদ হয়ে যায়। শিরস্ত্রাণের লৌহ শলাকা-মাথায় বিদ্ধ হয়। মুখমণ্ডল রক্তাপ্লুত হয়। এ অবস্থায়ও তাঁর মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল : 'সে জাতি কেমন করে মুক্তি লাভ করবে যে তার নবীকে হত্যা করতে উদ্যোগী! হে আমার আল্লাহ! আমার জাতিকে হিদায়াত দান কর। কেননা তারা কিছুই জানে না।' 'তোমার শত্রুকে ভালবাস'– যয়তুন পাহাড়ে প্রদত্ত উপদেশের এ হচ্ছে কার্যকর রূপ। এ শুধু কবিত্ব নয় বরং কাজের বিপজ্জনক রূপ মাত্র।

যে আবদে ইয়ালীলের বংশ তায়েফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর জুলুম করেছিল, তার পুত্র যখন তায়েফের প্রতিনিধিদল নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পবিত্র মসজিদে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। প্রত্যেক দিন ইশার নামাযের পর তার সাথে দেখা করতে যেতেন এবং মক্কার দুঃখের কাহিনী তাকে শুনাতেন! কাকে? যে তাঁকে পাথর দ্বারা আহত করেছিল, যে তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছিল। এ হচ্ছে নিজের শত্রুকে ক্ষমা ও ভালোবাসার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

যখন মক্কা বিজিত হয়, তখন হারেম শরীফের বারান্দায় যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গালি দেয়া হয়েছিল, যেখানে তাঁর ওপর নাপাক বস্তু নিক্ষেপ করা হয়েছিল, যেখানে তাঁকে হত্যা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সেখানে দাঁড়িয়েছিল পরাজিত কুরাইশ সর্দাররা। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যে ইসলামকে ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এমন কি যে তাঁকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে, তাঁর নিন্দাবাদ করেছে, তাঁকে গালি দিয়েছে, যে তাঁর সাথে বেয়াদবী করার দুঃসাহস পোষণ করেছে, তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করেছে, তাঁর পথে কাঁটা বিছাত, যে তাঁর ওপর তলোয়ার ওঠিয়েছিল, তাঁর আত্মীয়দের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল, তাদের বুক বিদীর্ণ করেছিল এবং তাদের হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীভুঁড়ি কেটে টুকরা টুকরা করেছিল, যে দরিদ্র ও অসহায় মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়েছে, তাদের বুকের ওপর নিজেদের

www.nagorikpathagar.org

অত্যাচারের মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, তাদেরকে আগুনের মত উত্তপ্ত বালুর ওপর শায়িত করেছে, জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে তাদের অঙ্গে দাগ দিয়েছে এবং বর্শাঘাতে তাদের শরীর ছিন্নভিন্ন করেছ। এ সব অপরাধীর দল সেদিন পরাজিত ও পর্যুদস্ত অবস্থায় সামনে দাঁড়িয়েছিল। পেছনে দশ হাজার রক্তপিপাসু তরবারি শুধুমাত্র মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিল। অকস্মাৎ তিনি মুখ খুলে জিজ্ঞেস করলেন : 'হে কুরাইশগণ! বল, আজ তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত।' জবাব এল 'মুহাম্মদ! তুমি আমাদের শরীফ ভাই ও শরীফ ভাতিজা।' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আজ আমি তোমাদেরকে তাই বলছি যা হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর জালিম ভাইদেরকে বলেছিলেন।

অর্থাৎ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ 'আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।' اِذْهَبُوْا اَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ 'যাও, তোমরা সবাই মুক্ত।'

এ হচ্ছে দুশমনদেরকে ভালোবাসর ও মাফ করার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব আদর্শ ও বাস্তব শিক্ষা। আর তা শুধু মুখরোচক বক্তৃতা ও সুমিষ্ট ভাষণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়; বরং সত্যিকার ঘটনা ও কাজের দৃষ্টান্তে প্রকাশ।

এ কারণেই অন্যান্য ধর্মগুলো তাদের নবীর ও ধর্ম প্রবর্তকগণের সুমিষ্ট বাণীসমূহের দিকে জগদ্বাসীকে আহবান করে বার বার সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করে। কেননা এগুলো ব্যতীত অন্য বস্তু তাদের কাছে নেই। অন্যদিকে ইসলাম তার নবীর শুধু কথা নয়; বরং কাজের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জগত থেকে বিদায় নেয়ার সময় বলেছিলেন :

تَرَكْتُ فِيْكُمُ الثَّقِيْلَيْنِ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّتِيْ.

'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি : 'আল্লাহ্র কিতাব ও আমার সুন্নাত।' এ ভারী বস্তু দু'টি এখনো কায়েম আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে।'

www.nagorikpathagar.org

এ জন্যই ইসলাম আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে সাথে নিজের নবীর সুন্নাতের অনুসরণের দাওয়াত দেয়।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবন অনুসরণযোগ্য এক সুমহান আদর্শ।'

ইসলাম নিজে তার নবীকে আল্লাহর কিতাবের বাস্তব চিত্র, আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করে। সারাবিশ্বে একমাত্র ইসলামের নবীই এ মর্যাদার অধিকারী যে, তিনি নিজের শিক্ষা ও নীতির সাথে সাথে নিজের কাজ এবং দৃষ্টান্তও উত্থাপন করেছেন। নামাযের পদ্ধতি যে জানে না তাকে বলেন :

صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ۔

'আল্লাহ্‌র জন্য ঠিক সেভাবে নামায পড় যেভাবে আমাকে পড়তে দেখ।' স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের কল্যাণ কামনার শিক্ষা এভাবে প্রদান করেন :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِيْ۔

'তোমাদের মধ্যে সে সর্বোত্তম যে তার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য সর্বোত্তম। আর আমার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য আমি তোমাদের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ হজ্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নবীর চারদিকে এক লাখ পতঙ্গের ভীড় জমে ওঠেছে। মানুষকে আল্লাহ্‌র সর্বশেষ পয়গাম শুনানো হচ্ছে। আরবের বাতিল কুপ্রথা ও বংশানুক্রমিক যুদ্ধের সিলসিলা আজ ভেঙে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার সাথে সাথে দেখুন নিজের ব্যক্তিগত নজীর ও বাস্তব দৃষ্টান্তও প্রতি পদে পদে উপস্থাপিত হচ্ছে। বললেন :

'আজ সব প্রতিশোধের রক্ত বাতিল করা হল। অর্থাৎ তোমরা সবাই পরস্পরের হত্যাকারীদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং প্রথম আমি নিজের খান্দানের রক্ত-আমার ভাতিজা রাবীয়া ইবনে হারেসের রক্ত ক্ষমা করে দিয়েছি!'

www.nagorikpathagar.org

'জাহেলী যুগের সকল প্রকার সূদের লেনদেন ও কারবার আজ বাতিল করা হচ্ছে এবং সর্বপ্রথম আমি আমার চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সূদের কারবার ভেঙে দিয়েছি।'

ধন-সম্পদ ও প্রাণের পর তৃতীয় মূল্যবান বস্তু হচ্ছে ইজ্জত-আব্রু। মানুষের ইজ্জত-আব্রুর সাথে যেসব ভ্রান্ত ও সংস্কারযোগ্য রসম-রেওয়াজের সম্পর্ক সেগুলোকে সর্বপ্রথম কার্যত বিলুপ্ত করার সাহস যেন বাহ্যত নিজের অমর্যাদা ও বে-আব্রুর নামান্তর প্রতীয়মান হয়। তাই জগতে বড় বড় সংস্কারকও দেশের কোন রসম-রেওয়াজ কার্যত সংশোধনের সাহস খুব কমই করে থাকেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে সাম্যের শিক্ষা দান করেছেন। আরবে গোলামদেরকে সবচেয়ে হীন মনে করা হত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবিক সম-অধিকারের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ স্থাপন করেছেন। তিনি একজন গোলামকে নিজের পুষ্য পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আরবে গোত্রগত মর্যাদার তারতম্য এত প্রবল ছিল যে, যুদ্ধের সময় কোনও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন গোত্রের লোক নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন গোত্রের লোকের বিরুদ্ধে তরবারি ওঠানো অপমানজনক মনে করত। কেননা তারা মনে করে যে, ছোট লোকদের রক্ত তাদের তলোয়ার অপবিত্র করে দেবে। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন : 'হে লোকেরা! তোমরা সবাই আদমের সন্তান আর আদমকে মাটি থেকে তৈরি করা হয়েছে। কৃষাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের এবং অনারব ব্যক্তির ওপর আরবিদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যে তার আল্লাহ্কে সকলের চেয়ে বেশি ভয় করে।' তাঁর এ শিক্ষা অকস্মাত উচু-নীচু, উন্নত-অবনত, ছোট-বড় এবং মনিব-গোলামের মধ্যকার পার্থক্য দিয়ে সবাইকে এক পর্যায়ে এনে হাজির করায়। কিন্তু এ জন্য বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রয়োজন ছিল। এ দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই পেশ করেছেন। কুরাইশদের শরীফ খান্দানের অন্তর্গত তাঁর নিজের ফুফাতো বোনকে নিজের গোলামের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। পুষ্য পুত্রকে গর্ভজাত সন্তান মনে করার কুসংস্কার নীতি

www.nagorikpathagar.org

যখন ইসলাম ওঠিয়ে দেয়, তখনই 'যায়েদ ইবনে মুহাম্মদকে' যায়েদ ইবনে হারেস বলা হয়। পালক পুত্র যে স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাকে বিয়ে করা আরবে অবৈধ ছিল। কিন্তু এটি যেহেতু নিছক মৌখিক আত্মীয়তা ছিল, বস্তুতঃ পরস্পরের মধ্যে কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল না এবং এ প্রথাটির কারণে আরবদের মধ্যে নানান খান্দানী হিংসা-বিদ্বেষ ও ত্রুটির ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল, তাই এ পেশ করার বিষয়টি মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু আক্রর সাথে সম্পর্কিত ছিল। কাজেই এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে নিজেই এর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। যায়েদ ইবনে হারেস যখন নিজের স্ত্রী হযরত জয়নবকে বনিবনা না হওয়াতে তালাক দেন, তখন হযরত আল্লাহর আদেশে জয়নবকে বিয়ে করেন। তখন থেকেই আরবের এ অবাঞ্ছিত প্রথাটি নির্মূল হয়ে যায় এবং পুষ্য পুত্র সম্পর্কিত ভ্রান্ত প্রথা থেকে দেশ মুক্তি লাভ করে।

এরূপ ঘটনার অভাব নেই। অগণিত দৃষ্টান্ত এর রয়েছে কিন্তু আলোচনা সুদীর্ঘ হবার আশংকায় এ থেকে বিরত হলাম।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমার আলোচনার আলোকে আদম (আ) থেকে শুরু করে ঈসা (আ) পর্যন্ত এবং সিরিয়া থেকে শুরু করে হিন্দুস্থান (পাক-ভারত-বাংলাদেশ) পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক ব্যক্তির সংস্কারধর্মী জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এমন কার্যকর হিদায়াত ও পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত আর কোথাও কি দেখতে পাবেন?

বন্ধুগণ! আরো কয়েকটি কথা জেনে রাখুন। অনেক মিষ্টভাষী বক্তা কবিতার ভঙ্গিতে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা ও গভীর প্রেমের কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু 'গাছের পরিচয় ফলে' তাদের উক্তি অনুসারে তাদের জীবনে ভালবাসা ও প্রেমের কী প্রভাব পড়েছিল? আরবের প্রেমিকের জীবনী পাঠ করুন। গভীর রাত, সারা পৃথিবী ঘুমন্ত কিন্তু প্রেমিকের চোখ রয়েছে জেগে। হাত আকাশের দিকে, কণ্ঠে আল্লাহর প্রশংসা করা হচ্ছে, বুকের ভেতর হৃদয় অস্থির ও উদ্বেগ-চঞ্চল এবং চোখ থেকে ধারায় ঝরে পড়ছে অশ্রু। সত্যিকার প্রেমের চিত্র কি এটি না ওটি?

www.nagorikpathagar.org

খ্রিষ্টানদের মতে যীশুকে শূলের ওপর চড়ানো হয়। তখন তিনি নাকি অস্থিরভাবে বলেছেন :

اِيْلِيْ اِيْلِيْ لِمَا سَبَقْتَنِيْ

'হে আমার আল্লাহ্! হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমাকে কেন পরিত্যাগ করেছে?' কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন, তখন তাঁর পবিত্র মুখে উচ্চারিত হয় :

اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقُ الْاَعْلٰى۔

'হে আমার আল্লাহ! হে আমার সর্বোত্তম সাথী?' এ দু'টি কথার কোনটির মধ্যে ভালবাসার স্বাদ, প্রেমের নিদর্শন এবং আল্লাহ্নির্ভর প্রশান্তির গভীরতা লক্ষ্য করা যায়?

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلٰى سَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ۔

হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ (সা.)-সহ সব নবী-রাসূলের
প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন!

www.nagorikpathagar.org

# ৭. মুহাম্মদী পয়গাম

প্রিয় বন্ধুগণ! আমি ইতোপূর্বে বক্তৃতায় যুক্তি-প্রমাণ এবং ইতিহাস দ্বারা একথা প্রমাণ করেছি যে, সকল উন্নত শ্রেণির মানুষের মাঝে একমাত্র নবিগণের জীবনচরিতই অনুসরণযোগ্য এবং তাঁদের মাঝেও বিশ্বজনীন এবং চিরস্থায়ী আদর্শ হচ্ছে একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতে। একথা যখন এ পর্যায়ে প্রমাণ হয়েছে যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র বিশ্বজনীন এবং চিরস্থায়ী আদর্শ, তখনই প্রশ্ন আসে তাঁর বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী শিক্ষা কী? তিনি বিশ্বের জন্য কী পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন এবং কী পয়গাম শুনিয়ে জগত থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন? তাঁর নির্দেশনার কোন জরুরি অংশকে বাস্তবায়ন করার জন্য শেষ নবির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল? অন্যান্য নবিগণও জগতে পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন। তাহলে কীভাবে এ শেষ নবির পয়গাম তাকে যথার্থ রূপ ও পূর্ণতা প্রদান করেছিল?

আমরা মাঝে মাঝে স্বীকৃতি দান করি, নবিগণের মাধ্যমে পৃথিবীতে আল্লাহর বাণী এসেছে। কিন্তু যেমন ইতোপূর্বে বারবার বলা হয়েছে আর বিভিন্ন ঘটনায় প্রমাণ করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী সকল নবির বাণী কোন বিশেষ যামানা এবং জাতির পর্যায়ে প্রযোজ্য ছিল এবং সেগুলো ছিল সমসাময়িক, সেজন্য তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়নি। তাদের আসল কথা বিকৃত হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘকাল পর সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হলেও তাতে বহু বিকৃতিও সমন্বয় হয়েছে। ওসব আবার অনুবাদে তাদের চেহারাই পরিবর্তিত করে দিয়েছে। তাতে তাদের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতার কোন দলীল পাওয়া যায় না। অনেকেরই মনগড়া উক্তি তাদের এসব ক্ষেত্রে যুক্ত করে দিয়েছে। আর সেসব হয়েছে মাত্র কয়েকশ বছরের ব্যবধানে। যদি আল্লাহর কাজ বিচার-বিবেচনাশূন্য না হয়ে থাকে, তাহলে সেসব নিশ্চিহ্ন ও বিকৃত হয়ে যাওয়াই তাদের সাময়িক পৃথিবীতে শিক্ষার প্রমাণ।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা যে বাণী এসেছে, তা বিশ্বজনীন এবং চিরন্তন বাণী হিসেবেই এসেছে। তাই এগুলো আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত পরিপূর্ণরূপেই সংরক্ষিত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে ইন্‌শাআল্লাহ। কেননা এরপর আর কোন নবির এ দুনিয়ায় আগমন হবে না। আর আল্লাহ্ অতীতের কোন বাণী সম্পর্কে এ কথা বলেননি যে, তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে আর সেগুলো সংরক্ষণের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি। বিশ্বে যে সকল 'সহীফা' বিলুপ্ত হয়েছে, তাদের বিলুপ্তিই তাদের সাময়িক বাণী হবার প্রমাণ। আর যেসব সহীফা বর্তমান রয়েছে, তাদের প্রত্যেক আয়াত এবং বাক্য অনুসন্ধান করা হলে সেখানে তাদের পরিপূর্ণতা বা তাদের সংরক্ষণ সম্পর্কে এমন একটি কথাও পাওয়া যাবে না; বরং তাদের বিপরীতপক্ষে অসম্পূর্ণতারই ইঙ্গিতই লক্ষ করা যায়। হযরত মূসা বলেন : আমার আল্লাহ, তোমাদের আল্লাহ, তোমাদের এবং তোমাদের ভাইদের মাঝ থেকে তিনি আমার মত একজন নবী পাঠাবেন! তোমরা তাঁর কথা শুনবে। (দ্বিতীয় বিবরণ : ১৫, ১৮)

'আমি তাদের জন্য ভাইদের মাঝ থেকে তোমাদের ন্যায় একজন নবী পাঠাব এবং নিজের বাণী তাঁর মুখে দান করব। আমি তাঁকে যা কিছু বলব তা সমস্তই তিনি সে তাঁদেরকে শুনাবে।' (দ্বিতীয় বিবরণ : ১৮, ১৯)

ইসরাঈলদেরকে 'মূসা আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যুর পূর্বে এ বরকত প্রদান করে যান এবং তিনি বলেন, আল্লাহ সিনাই থেকে এসেছেন, সাঈর থেকে তাঁর ওপর উদিত হয়েছেন আর ফারানের পাহাড় থেকে তিনি উদিত হবেন এবং তাঁর ডান হাতে থাকবে একটি অগ্নিময় শরিয়ত।'

ওপরের আয়াতগুলোর দ্বারা তাওরাত সুস্পষ্টভাবে একথা ব্যক্ত করেছে যে, 'মূসার মত আর একজন নবির আগমন হবে। তাঁর সাথে থাকবে একটি অগ্নিময় শরিয়ত এবং তাঁর মুখে আল্লাহ্ বাণী দান করবেন।' তা থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ হয় যে, হযরত মূসার বাণী চিরন্তন ও সর্বশেষ ছিল না।

এরপর 'আশিয়া'য় আর একজন 'রাসূলের সুসংবাদ দান করেন : 'যার শরিয়ত মধ্যবর্তী দেশসমূহ এবং দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে।' (৪ অধ্যায়)

www.nagorikpathagar.org

'মালাখীয়ায়' বলা হয়েছে : 'দেখ, আমি আমার রাসূল পাঠাব।' বনি ইসরাঈলদের অন্যান্য সহীফাসমূহে এবং যাবুরেও ভবিষ্যতে আগমনকারী নবির সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, বনি ইসরাঈলদের কোন একটি সহীফাও চিরন্তন ও সর্বশেষ ছিল না।

প্রচলিত ইঞ্জিলে লক্ষ করুন। সেখানে বলা হয়েছে :

'এবং আমি আমার পিতার নিকট আবেদন জানাব যেন তিনি তোমাদেরকে দ্বিতীয় 'ফারকালীত' দান করেন, যিনি হামেশা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

(ইউহেনা : ১৪-২৬)

'কিন্তু সে 'ফারকালীত' হচ্ছেন পবিত্র আত্মা। তাঁকে পিতা আমার নামে প্রেরণ করবেন। তিনিই তোমাদেরকে সব বিষয় শেখাবেন এবং আমি তোমাদের যেসব কথা বলেছি, তা তিনি স্মরণ করিয়ে দেবেন।' (ইউহেনা : ১৪-২৬)

'আমার আরো অনেক কথা আছে, যেগুলো আমি তোমাদেরকে শুনাতে চাই। তবে এখন সেগুলো তোমরা বরদাশত করতে পারবে না। কিন্তু যখন তিনি 'মসীহ'র পয়গামকে পূর্ণতা দান করবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম ভবিষ্যতের এমন কোন আগমনকারীর সংবাদ প্রদান করেন না, যিনি কোন নতুন পয়গাম শুনাবেন বা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামে কোন ত্রুটি ও অপূর্ণতা রয়েছে, তা দূর করে তিনি তাকে পরিপূর্ণতা দান করবেন; বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম নিজেই নিজের পরিপূর্ণতার দাবি করে। যেমন বলা হয়েছে :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ۔

'আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণতা প্রদান করেছি এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করেছি।' (সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৩)

আর এ সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ শেষ নবী অর্থাৎ তাঁর পর নবুয়তের ধারাবাহিকতা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কুরআন বলছে وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ (তিনি নবিগণের শেষ) এবং হাদিসে বলা হয়েছে وَخُتِمَ بِيَ

www.nagorikpathagar.org

النَّبِيُّوْنَ। আর আমার দ্বারা নবিগণের আগমনের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।– (মুসলিম বাবুল, মাসাজিদ) اَلَا لَا نَبِيَّ بَعْدِىْ (সাবধান আমার পর আর কোন নবী নেই)। বিভিন্ন হাদিসে উল্লেখ রয়েছে : 'আমি নবুয়ত প্রাসাদের সর্বশেষ স্তম্ভ। কুরআন তার আয়াতসমূহে পরবর্তী আগমনকারী কোন নবির জন্য কোন স্থান শূন্য রাখেনি। এ থেকে বুঝা যায় যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে পৃথিবীতে যে পয়গাম এসেছে, সেটিই আল্লাহর শেষ ও চিরন্তন। আর এ জন্যই وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (আর আমিই তার সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছি) ওয়াদার এ আয়াতে আল্লাহ, নিজেই তার সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

প্রিয় বন্ধুগণ! এরপর প্রশ্ন হচ্ছে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম ব্যতীত অন্য কোন পয়গাম বিশ্বজনীন আদর্শ রূপ নিয়ে আগমন করেছে কিনা? বনি ইসরাঈলদের দৃষ্টিতে বিশ্বে শুধু বনি ইসরাঈলদেরই বাসস্থান। আল্লাহ শুধু বনি ইসরাঈলদেরই আল্লাহ। তাই বনী ইসরাঈলদের নবীগণও তাদের ওপর অবতীর্ণ গ্রন্থগুলোর আল্লাহর পয়গাম কখনো অ-বনি ইসরাঈলী পর্যন্ত পৌছাননি। বর্তমানে ইহুদি ধর্ম এবং মূসার শরিয়ত বনি ইসরাঈলদের মাঝেই সীমাবদ্ধ। তাদের সমস্ত 'সহীফা'য় শুধুই তাদের ক্ষেত্রেই সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদের খান্দানি আল্লাহর দিকেই তাদের আকৃষ্ট করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর পয়গাম শুধু সীমাবদ্ধ রেখেছেন 'বনি ইসরাঈলদের হারিয়ে যাওয়া মেষপালের মাঝেই এবং অ-ইসরাঈলদেরকে নিজের পয়গাম শুনিয়ে ছেলেদের রুটি কুকুরের মুখে তুলে দেয়া অপছন্দ করেন।' ভারতে অনার্যদের কান পর্যন্ত বেদও পৌছতে পারে না, কেননা আর্য ব্যতীত দুনিয়ার অন্য সবই হচ্ছে শূদ্র এবং সেখানে এ কথার ওপর জোর দেয়া হয়েছে যে, যদি 'বেদের বাণী শূদ্রের কানে পৌঁছে তাহলে তার কানে গরম শীশা ঢেলে দাও। এদিক দিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম বিশ্বে আল্লাহর সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ পয়গাম, যা সাদা-কালো, আরবি-আজমি, তুর্কী-তাতারী, ভারতীয়-চৈনিক, ফিরিংগি-

www.nagorikpathagar.org

অফিরিংগি সবার জন্য সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য। তাঁর আল্লাহ যেমন সারাবিশ্বের আল্লাহ; رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ 'সারাজগতের প্রতিপালক' তেমনি তাঁর রাসূলও বিশ্বের রাসূল رَحْمَةٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ 'সারা বিশ্বের জন্য করুণাস্বরূপ' অনুরূপ তাঁর পয়গামও সারাবিশ্বের জন্য।

যেমন বলা হয়েছে : اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ۔

'তা বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ স্বরূপ।' (সূরা আল-আন-আম, আয়াত : ৯০)

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا۔ اَلَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔

'উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আল্লাহ তিনি, যিনি তাঁর বান্দাদের ওপর ফয়সালাকারী কিতাব আল-কুরআন নাযিল করেছেন, যেন তা সারা বিশ্ববাসীকে সতর্ক করতে পারে। পৃথিবী ও আকাশের সকল কর্তৃত্ব সে আল্লাহরই।'

(সূরা আল ফুরকান, আয়াত : ১-২)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাবিশ্বের জন্য সতর্ককারী হিসেবে আগমন করেছেন। আল্লাহর কর্তৃত্ব যতদূর পরিব্যাপ্ত তাঁর নবুয়তও ততদূর পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج

'(মুহাম্মদ!) আপনি বলে দিন, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সবার জন্য সে মহান আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল, যাঁর কর্তৃত্ব আকাশ ও পৃথিবীর ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত।' (সূরা আরাফ, আয়াত : ১৫৮)

এখানেও লক্ষ করুন, সারাপৃথিবীতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামের বিস্তৃত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। এর চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটাই যে, যতদূর পর্যন্ত এ সমস্ত পয়গামের আওয়াজ পৌঁছেছে ততদূর পর্যন্ত এলাকা এর আওতাভুক্ত রয়েছে।

وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ۔

www.nagorikpathagar.org

'আর এ কুরআন আমার প্রতি ওহি রূপে নাযিল করা হয়েছে,যাতে করে এর সাহায্যে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে পর্যন্ত এটি পৌঁছে তাদেরকে সতর্ক করা যেতে পারে।' (সূরা আনআম, আয়াত : ১৯)

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا۔

'আর আমি আপনাকে সকল মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছি সুসংবাদ প্রদানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে।' (সূরা সাবা, আয়াত : ২৮)

এসব উদ্ধৃতিসমূহ থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই তার চিরন্তন, পরিপূর্ণ, অপরিবর্তনীয় ও বিশ্বজনীন হবার দাবিদার। মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'আমার পূর্বে প্রত্যেক নবিকে শুধু তাঁর নিজের জাতির জন্যই পাঠানো হয়েছিল। আর আমাকে পাঠানো হয়েছে সকল জাতির জন্য।' এটি আমাদের দাবির স্বপক্ষে আর একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ এবং ইতিহাসের বাস্তব সাক্ষীও আমাদের সমর্থক। মোটকথা, আমার বক্তব্য হচ্ছে এটাই যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত ও তাঁর জীবনের বাস্তব চিত্র যেমন পরিপূর্ণ চিরন্তন ও বিশ্বজনীন অনুরূপভাবে তাঁর পয়গামও পরিপূর্ণ ও বিশ্বজনীন– চিরন্তন, এটাই বাস্তবতা।

এখন প্রশ্ন, এ পরিপূর্ণ, চিরন্তন ও বিশ্বজনীন ব্যক্তির শেষ, চিরন্তন ও বিশ্বজনীন পয়গাম কী, যা সকল ধর্মকে চূড়ান্ত রূপ এবং আল্লাহর দীনকে চিরকালের জন্য পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে এবং মহান আল্লাহ তাঁর দানের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। ধর্ম মাত্রই দু'অংশে বিভক্ত। একটিকে ঈমান ও দ্বিতীয়টিকে আমল বা কর্ম বলা হয়। কর্মেরও আবার তিনটি দিক রয়েছে। এর মাঝে একটি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত, একে বলা হয় ইবাদত; দ্বিতীয়টির সম্পর্ক হলো মানুষের সাথে মানুষের করণীয় কাজের, একে বলা হয় মুআমালাত বা ব্যবহারিক জীবন। এর বৃহত্তম অংশ হচ্ছে আইন-কানূন। তৃতীয়টি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্বন্ধে ক্ষেত্রের উপর

www.nagorikpathagar.org

নির্ভরশীল। একে আখলাক বা নৈতিক চরিত্রও বলা হয়। অতএব, ঈমান, ইবাদত, ব্যবহারিক জীবন ও নৈতিক চরিত্র-এ চারটি বিষয় নিয়েই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। আর চারটি বিষয়ই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামে পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে।

তাওরাত এবং ইঞ্জিলে ঈমান ও আকিদার অধ্যায়গুলো একেবারেই অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ। সেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তওহীদের আলোচনা আছে। কিন্তু এর পেছনে কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। আল্লাহর যে গুণাবলি মানবত্মার পূর্ণত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে এবং যেসব বিষয় অবলম্বনে আল্লাহর মারিফাত ও প্রেমের উদ্ভব হয়, তা তাওরাতে বা ইঞ্জিলে অনুপস্থিত।

তাওহীদের পর হচ্ছে রিসালত। রিসালত ও নবুয়তের তাৎপর্য হচ্ছে ওহি, ইলহাম এবং আল্লাহ্ ও নবির কথোপকথনের ব্যাখ্যা, নবিগণ মানবিক মর্যাদা, প্রত্যেক জাতির মাঝে নবির আবির্ভাব সম্পর্কে বার্তা, নবিগণের দায়িত্ব, নবিগণকে কোন পর্যায়ে স্বীকার করা উচিত, নবিগণের নিষ্পাপ আর এসব বিষয়ের আলোচনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামের পূর্বের কোন পয়গামে ছিল না। পুরস্কার ও শাস্তি, জান্নাত ও জাহান্নাম, হাশর-নশর, কিয়ামত, জীবন ও আখিরাত সম্পর্কে আলোচনা তাওরাতে একেবারেই অস্পষ্ট। ইঞ্জিলে এক ইহুদির প্রশ্নের জবাবে সেসব বিষয় সম্পর্কে দু-একটি বাক্য পাওয়া যায় কিন্তু তা এ পর্যন্তই শেষ! আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামে পাওয়া যায় প্রত্যেকটি পর্যায় সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত।

তাওরাতেও ফেরেশতাগণের আলোচনা প্রসঙ্গ রয়েছে। কিন্তু তা একেবারেই অস্পষ্ট। কখনো কখনো এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণকে এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ ও ফেরেশতার পার্থক্য করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মূলত ঐ আসমানি কিতাবগুলোর বিকৃত কপিই আমরা দেখতে পাই। মূল কপিতে ঠিকই পরিস্কার ওহি দিয়ে তাদের পরিচয় মহান আল্লাহ তুলে ধরেছে, দুষ্ট মানুষ তাদের সুবিধামত করে কপিগুলো উলট-পালট করে চালিয়ে দিয়েছে, যাতে নফসের খায়েস মত দুনিয়াতে চলতে পারে এবং সে সময়কার পরিবেশ ও তাদের জ্ঞান

www.nagorikpathagar.org

পরিধি অনুযায়ী মহান আল্লাহ নাযিল করেছেন। কেননা তার কাজে কোন ত্রুটি নেই। দু-একজন ফেরেশতার নাম ইঞ্জিলে পাওয়া যায়। সেখানে 'রূহুল কুদুসের তাৎপর্য এতই সংশয়পূর্ণ যে, তাঁকে না ফেরেশতা বলা যেতে পারে, না আল্লাহ অথবা এভাবেও বলা যায় যে, তাঁকে ফেরেশতা বলা যেতে পারে, আবার আল্লাহও বলা যেতে পারে। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামে ফেরেশতাগণের তাৎপর্য ও মৌলিকতা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। সেখানে তাঁদের মর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের কর্তব্যও। আল্লাহর সাথে, নবি-রাসূলগণের সাথে ও বিশ্বজাহানের সাথে তাদের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম আকিদা ঈমানের ক্ষেত্রে সব বিষয়েই পূর্ণতাদানকারী। এখন আমল বা কর্মের পর্যায়ে আসা যাক। কর্মের প্রথম অংশ হচ্ছে ইবাদত। তাওরাতে কুরবানির দীর্ঘ আলোচনা এবং এর শর্ত ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, রোযার উল্লেখও রয়েছে, দোয়া করা হয়েছে, 'বায়তুইল' বা 'বায়তুল্লাহ'র নামও পাওয়া যায়, কিন্তু এসব বিষয় এতই অস্পষ্ট যে, এসবের প্রতি মানুষের কোন দৃষ্টিই আকৃষ্ট হয় না; বরং এগুলো গুরুত্বহীনই বিবেচিত হয়। তাছাড়া এখানে না ইবাদতের বিভাগ আছে, আর না তাদের পদ্ধতি ও আনুষ্ঠানিকতার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ইবাদতের কোন সময় নির্ধারণ করা হয়নি এবং নিয়মিত আল্লাহর স্মরণ ও দোয়ারও শিক্ষা প্রদান করা হয়নি। বান্দাকেও কোন দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়নি। যাবুরে আল্লাহর কাছে বহু সংখ্যক দোয়া ও মুনাজাতের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু অতি অল্প ইবাদতের পদ্ধতি, আনুষ্ঠানিকতা, সময় ও অন্যান্য শর্তসমূহের উল্লেখই মাত্র। বরং নেই বললেই চলে। এক স্থানে হযরত ঈসা (আ.)-র চল্লিশ দিন উপবাসের কথা উল্লেখ রয়েছে। একে রোযাও বলা যেতে পারে। ইঞ্জিলে ইহুদিদের এ আপত্তিরও উল্লেখ রয়েছে যে, তোমাদের শাগরিদরা রোযা কেন রাখে না? শূলদণ্ডের রাতে একটি দোয়ার উল্লেখ আছে এবং সেখানে একটি দোয়াও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে নেই অন্যান্য ইবাদতের নাম-নিশানাও। অন্যদিকে



www.nagorikpathagar.org

ইসলামের পয়গামের প্রত্যেকটি অংশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের নিয়ম-পদ্ধতি ও শর্তাবলির ইবাদতের পদ্ধতি, আল্লাহর যিকর ও তাঁকে স্মরণ করার জন্য দোয়াসমূহ, নামাযের সময়, রোযার সময়, হজ্বের সময় এবং এগুলোর প্রত্যেকটির বিধান, আল্লাহর কাছে বান্দার নম্রতা প্রকাশ ও কান্নাকাটির দোয়া, মুনাজাত, আল্লাহর কাছে গোনাহর স্বীকারোক্তি, তওবা ও ও লজ্জা প্রকাশ এবং বান্দা ও আল্লাহর পারস্পরিক ভালবাসা ও গোপন সম্পর্কের এমন সব শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে, যা রূহের খোরাক হিসেবে বিবেচিত হয়, আর এতে তার গ্রন্থিসমূহ খুলে দেয় এবং মানুষকে আল্লাহর এত কাছাকাছি পৌঁছিয়ে দেয় যে, ধর্মের সূক্ষ্ম প্রাণ পূর্ণাবয়ব দেহে রূপলাভ করে। আর এসবই হচ্ছে পয়গামে মুহাম্মদীর অনস্বীকার্য একমাত্র প্রামাণিকতা।

কর্মের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে ব্যবহারিক জীবন বা দেশ ও সমাজের আইন। এ অংশটি হযরত মূসা (আ)-র পয়গামে যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামে এগুলোকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহাল রাখা হয়েছে। কিন্তু এ আইনসমূহের কঠোরতা হ্রাস করা হয়েছে। একটি জাতীয় আইনের সঙ্কীর্ণ পরিসর অতিক্রম করে এগুলোকে বিশ্বজনীন আইনের রূপ প্রদান করা হয়েছে। এদিক দিয়ে যে-সকল পরিশিষ্ট অংশের প্রয়োজন ছিল, সেগলো সংযোজন করা হয়েছে। যাবুর ও ইঞ্জিলে এ শরিয়ত ও আইনের বিন্দুমাত্রও নেই। তালাক প্রভৃতি সম্পর্কে অবশ্যই ইঞ্জিলে দু'একটি বিধান রয়েছে, অন্য কোন বিষয়ে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু বিশ্বজনীন ও চিরন্তন ধর্মের প্রয়োজন পরিপূর্ণ করার জন্য দেশ ও সমাজের উপযোগী আইনের প্রয়োজন ছিল। কেননা হযরত ঈসা (আ.)-এর পয়গামে এসব কিছু ছিল না, তাই খ্রিষ্টান জাতির মূর্তিপূজারি, গ্রীক ও রোমীয়দের কাছে থেকে এসব কিছু গ্রহণ করতে হয়েছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম এগুলোর প্রতিটি অংশে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও গভীর অন্ত র্দৃষ্টি সহকারে পূর্ণতা প্রদান করেছে এবং এমন সব নীতি ও ব্যাপক নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করেছে, যার দ্বারা যুগে যুগে ওলামায়ে কেরাম ও মুজাহিদগণ নতুন নতুন প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন মাসায়েল সৃষ্টি করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

কমপক্ষে এক হাজার বছর পর্যন্ত ইসলাম পৃথিবীতে যে একচ্ছত্র শাসন ও শত শত প্রগতিশীল ও উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সেসব পরিচালিত হয়েছিল এ আইনের সাহায্যে এবং আজো পৃথিবীতে এর চেয়ে উত্তম আইন পেশ করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না।

কর্মের তৃতীয় অংশটি হচ্ছে নৈতিক চরিত্র বিষয়ক। তাওরাতে কিছু নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে বিধানাবলি পাওয়া যায়। এর মাঝে সাতটি হচ্ছে নীতিগত বিধান। এসব বিধানসমূহের একটি মাতা-পিতার আনুগত্য সম্পর্কে ইতিবাচক শিক্ষা প্রদান করে। তাছাড়া বাকি ছটি বিধানই নেতিবাচক। যেমন, তুমি হত্যা কর না, তুমি চুরি কর না, তুমি জেনা করবে না, তুমি নিজের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেবে না, তুমি নিজের প্রতিবেশীর স্ত্রীকে কামনা করবে না, তুমি নিজের প্রতিবেশীর অর্থ-সম্পদের লোভ করবে না। এগুলোর মধ্যে ষষ্ঠ বিধানটি চতুর্থটির মাঝে এবং সপ্তমটি তৃতীয়টির মাঝে পাওয়া যায়। কাজেই চারটি বিধানই মূলত অসমাপ্ত।

এ বিধানগুলোর পুনরাবৃত্তি ইঞ্জিলেও করা হয়েছে। সংক্ষেপে অন্যকে ভালবাসারও সহানুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাই এটিকে তাওরাতের বিধানের ওপর অতিরিক্ত বলা যেতে পারে। কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম এ বিন্দুটিকেও মহাসাগরে পরিণত করেছে। সর্বপ্রথম এখানে বারটি মৌলিক বিধান নির্ধারিত রয়েছে। এ বিধানগুলো মিরাজের সময় আল্লাহর কাছে থেকে প্রদান করা হয়েছিল। এগুলো সূরা ইসরায় উল্লেখ রয়েছে। এ বারোটি বিধানের এগারোটি হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্র এবং একটি তাওহীদ সম্পর্কে। আবার এ বারোটির পর্যায়ে পাঁচটি নেতিবাচক ও পাঁচটি ইতিবাচক এবং একটি ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ই।

মাতা-পিতার সম্মান এবং আনুগত্য কর, তোমার ওপর যাদের হক রয়েছে তাদের হক আদায় কর, ইয়াতিমের সাথে সদ্ব্যবহার কর, পরিমাপ, ওজন ও দাঁড়িপাল্লা সঠিক রাখ, নিজের ওয়াদা পালন কর, কেননা, এ সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে-এ পাঁচটি হচ্ছে ইতিবাচক। তোমার সন্তানকে হত্যা করো না, কাউকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, জ্বিনার কাছেও যেও

www.nagorikpathagar.org

না, অজ্ঞাত বিষয়ের পেছনে ধাবিত হয়ো না, যমীনের ওপর অহঙ্কার করে চলাফেরা করো না– এ পাঁচটি হচ্ছে নেতিবাচক। তাছাড়া অমিতব্যয়ী হয়ো না এবং ভারসম্যপূর্ণ ও মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন কর-এটি নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় ধরনের আদেশের মধ্যেই গণ্য। কীভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম পূর্ণতাদানকারী পয়গাম হিসেবে দুনিয়ায় আগমন করেছে, শুধু এ মৌলিক বিধানগুলোর তুলনামূলক আলোচনায় তা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ হয়েছে। 'এ পয়গাম শুধু সে বিধানসমূহকে ব্যক্ত ও পরিপূর্ণ করেনি বরং নৈতিকতার প্রতিটি দিকসমূহ উন্মোচন করেছে, মানুষের প্রতিটি শক্তির প্রয়োগক্ষেত্র নির্ণয় করেছে, তার প্রতিটি দুর্বলতা প্রকাশ করেছে, আত্মার প্রত্যেকটি রোগ নির্ধারণ করেছে এবং এর চিকিৎসা বলে দেয়া হয়েছে। ('দুনিয়ার অন্যান্য জাতির ইতিহাস আইন-কানুন ছিল আমাদের জন্য শিক্ষণীয় উদাহরণ। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস আমাদের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য, উন্নতি, অবনতির কাহিনিই আজ অনাসব জাতির জন্য উদাহরণ হয়ে রয়েছে।'

এভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামের দ্বারাই কর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

যদি ইসলামি শিক্ষার বিরাট ও বিপুল সম্পদকে আমরা মাত্র দুটি শব্দে প্রকাশ করি, তাহলে তাকে বলতে হয়-ঈমান ও সৎ কর্ম। ঈমান ও সৎকর্ম এ দুটি বস্তুই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল প্রকার পয়গামকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং পবিত্র কুরআনে এ দু'টি বস্তুর ওপর মানুষের মুক্তিলাভে নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ আমাদের ঈমান পবিত্র, সকল প্রকার দোষ-ত্রুটিমুক্ত ও শক্তিশালী হতে হবে আর কর্ম হতে হবে উৎকৃষ্ট ও সৎ প্রকৃতি সম্পন্ন।

কুরআনে বহু স্থানে বলা হয়েছে :

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ۔

"যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে। (সূরা ফাতির, আয়াত : ৭)

এবং প্রত্যেক স্থানে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাফল্য ও কল্যাণ একমাত্র ঈমান ও সৎকাজের ওপরই নির্ভরশীল। আমি এ মৌলিক

www.nagorikpathagar.org

বিষয় দু'টি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চেয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। তাই এখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামের শুধু সে অংশটি উল্লেখ করে যাচ্ছি, যা ঈমান ও কর্মের ব্যাপারে সারাজগতে বিভ্রান্তি অপনোদন করেছে, অসম্পূর্ণ দীন ও জীবনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে এবং এমন সব নীতিগত ও মৌলিক ভুল-ভ্রান্তি দূর করেছে, যেসব কারণে মানবতা সীমাহীন অবনতি ও ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করছিল। সে ভুলগুলোই ছিল সকল প্রকার ভ্রষ্টতার প্রকৃত কারণস্বরূপ।[১]

১. সর্বপ্রথম মৌলিক বিষয়সমূহে যে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামের দ্বারা জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে, তা হচ্ছে বিশ্বজাহান ও আল্লাহর সৃষ্টিকূলে মানুষের মর্যাদা। এটিই তাওহীদের প্রকৃত ভিত্তিমূল। ইসলামপূর্ব যুগে মানুষ আল্লাহর অধিকাংশ সৃষ্টির চেয়ে নিজেকে সামান্য মর্যাদা সম্পন্ন মনে করেছে। সে কঠিন পাথর, সুউচ্চ পাহাড়, প্রবহমান নদী, সবুজ গাছ, বর্ষণশীল বারিধারা, প্রজ্বলিত আগুন, ভীতিপূর্ণ বনানী, বিষাক্ত সাপ, শিকারী সিংহ, দুগ্ধ দানকারী গাভী, উজ্জ্বল সূর্য, প্রদীপ্ত তারকা, কাল রাত, ভয়াবহ প্রকৃতি পৃথিবীতে যে সকল বস্তুকে ভয় করতে বা যাদের দ্বারা লাভবান বা উপকৃত হবার বাসনা আছে, তাদের প্রত্যেকটিকে পূজা করেছে এবং তাদের সামনে করজোড়ে মাথা অবনত করেছে। এরপর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বিশ্ববাসীকে এ পয়গাম শোনালেন : 'হে মানবজাতি! এ সকল বস্তু তোমাদের প্রভু নয়; বরং তোমরা তাদের মনিব। তাদেরকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমাদেরকে তাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তারা তোমাদের সামনে নত হয়ে আছে, তাহলে তোমরা তাদের সামনে নত

[১]. মিশরীয় ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ কুতুব লিখেছেন, যার সমাধানকল্পে পৃথিবীর মানুষ আজ দিশেহারা মানুষের প্রকৃত মর্যাদা এবং মানবীয় লক্ষ্য আজও অর্জিত হয়নি অথবা বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতির সুগেও মানুষ বার বার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে। অতএব, এমনি পরিস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে আজও ইসলামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মানুষকে সঠিক পথে আসার জন্য ইসলাম সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করছে। (সংযোজন : সম্পাদক)

www.nagorikpathagar.org

হচ্ছো কেন? হে মানবজাতি! এ ধরায় তোমরা আল্লাহর প্রতিনিধি ও খলিফা! তাই বিশ্বজগৎ ও এর মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টিকে তোমাদের জন্য অনুগত করা হয়েছে! তোমরা তাদের অনুগত নও। তারা তোমাদের জন্য, তোমরা তাদের জন্য নও।'

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ؕ

(স্মরণ কর) যখন তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাগণকে বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চাই।'

(সূরা আল বাকারা, আয়াত : ৩০)

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَكُمْ خَلَآئِفَ فِی الْاَرْضِ ؕ

'এবং সে আল্লাহই জগতে তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা ফাতির, আয়াত : ৩৯)

এ প্রতিনিধিত্ব ও খিলাফত আদমকে ও আদম সন্তানদেরকে সকল সৃষ্টির মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

যেমন কুরআনে বলা হয়েছে :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِیْٓ اٰدَمَ ۔

'আর অবশ্যই আমি বনি আদমকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি।'

(সূরা বণি ইসরাঈল, আয়াত : ৭০)

তাই সবচেয়ে মর্যাদাশালী হবার পর এখন কি তারা নিজেদের চেয়ে কম মর্যাদাশালী ও হীনতর সৃষ্টির সামনে মাথানত করবে?'

ইসলাম মানুষকে এ কথা উপলব্ধি করিয়েছে যে, বিশ্বচরাচর তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ ۔

'তোমরা কী দেখনি, যা কিছু জগতে রয়েছে– আল্লাহ্ সবকিছুকেই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন?' (সূরা আল হজ্জ, আয়াত : ৬৫)

www.nagorikpathagar.org

هُوَالَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا۔

"তিনিই তো তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সবকিছু।"

(সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২৯)

তোমাদের জন্য পশু সৃষ্টি করেছেন। যেমন–

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا۔لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ۔

'আর পশুদের সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের জন্য, তাদের পশমে উষ্ণতা ও অন্যান্য উপকার পাওয়া যায়।' (সূরা আন্ নহল, আয়াত : ৫)

বৃষ্টি এবং এর সাহায্যে উৎপাদিত শাক-সবজি এবং গাছ-গাছালি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ۔يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔

'তিনিই (আল্লাহ্) আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি প্রবাহিত করেন। তা থেকে কিছু তোমরা পান কর, আর কিছুর সাহায্যে গাছ উৎপন্ন হয়, যার মধ্যে তোমরা পশু চরিয়ে থাক। তা থেকেই তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য শস্য, যয়তুন (তেল), খেজুর, আংগুর ও সব ধরনের ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছেন।' (সূরা আন্ নহল, আয়াত : ১০-১১)

রাত, দিন, চাঁদ, সূর্য, তারকা সব তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۔ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهٖ۔

'আর তিনি (আল্লাহ্) রাত, দিন, চন্দ্র ও সূর্যকে তোমাদের সেবায় নিযুক্ত করেছেন এবং তারকারাজি তাঁর নির্দেশেই কর্মরত।' (সূরা আন্ নহল : ১২)

www.nagorikpathagar.org

সমুদ্র এবং এর প্রবাহও তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন–

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۔

'আর তিনি (আল্লাহ্) সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করেছেন, যেন তোমরা তা থেকে তাজা গোশ্ত (মাছের) আহরণ করতে পার এবং পরিধান করার জন্য তা থেকে মণিমুক্তা আহরণ করতে পার। তোমরা জাহাজগুলোকে সাগরের বুক চিরে অগ্রসর হতে দেখতে পাও। এসব এজন্য যে, যাতে করে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের অনুসন্ধান করতে পার এবং তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' (সূরা আন্ নহল, আয়াত : ১৪)

কোরআন মজীদে এরকম আয়াত আরো বহু উল্লেখ আছে। এসব আয়াতসমূহের দ্বারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম একথা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষ হচ্ছে বিশ্বজগতের মধ্যমণি। আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে সে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। সে হচ্ছে বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ হচ্ছে তার সীলমোহর। চিন্তা করুন এ সত্য উদ্ঘাটিত হবার পর মানুষের জন্য বিশ্বচরাচরের কোন অংশ বা সৃষ্টির সামনে মাথা নত কি সঙ্গত হবে? আর তার সামনে মাটিতে কপাল রাখা কি শোভনীয় হবে?[১]

নির্বোধেরা একে অন্যকে আল্লাহ্ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তারা কখনো অবতার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল, কখনো ক্ষমতার সিংহাসনে আসীন

---

১. বর্তমান যুগে যে অবস্থা বিরাজ করছে এবং যেসব কঠিনতম সমস্যা মাথাচড়া দিয়ে ওঠছে তা দেখে এটা কল্পনাই করা যায় না যে কোন আধুনিক বুদ্ধিমান মানুষ ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। অথবা এর উপস্থাপিত জীবন বিধানকে অস্বীকার করতে পারে। পৃথিবীর আদিম বা অন্ধকার যুগে মানুষ যেসব সীমাহীন অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিল আজকের এক বিংশ শতকেও সেসব কাজে লিপ্ত রয়েছে। তথ্য সাইয়্যেদ কুতুব এর প্রবন্ধ ইসলাম ও আধুনিক ভাবধারা : দ্বীন ইসলাম, ইসলামি ডাইজেস্ট পত্রিকা : মোহাম্মদ শামসুজ্জামান সম্পাদিত আগষ্ট-১৯৯৭ ১ম সংখ্যা।

www.nagorikpathagar.org

সমুদ্র এবং এর প্রবাহও তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন–

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۔

'আর তিনি (আল্লাহ্) সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করেছেন, যেন তোমরা তা থেকে তাজা গোশ্ত (মাছের) আহরণ করতে পার এবং পরিধান করার জন্য তা থেকে মণিমুক্তা আহরণ করতে পার। তোমরা জাহাজগুলোকে সাগরের বুক চিরে অগ্রসর হতে দেখতে পাও। এসব এজন্য যে, যাতে করে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের অনুসন্ধান করতে পার এবং তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' (সূরা আন্ নহল, আয়াত : ১৪)

কোরআন মজীদে এরকম আয়াত আরো বহু উল্লেখ আছে। এসব আয়াতসমূহের দ্বারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম একথা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষ হচ্ছে বিশ্বজগতের মধ্যমণি। আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে সে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। সে হচ্ছে বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ হচ্ছে তার সীলমোহর। চিন্তা করুন এ সত্য উদ্ঘাটিত হবার পর মানুষের জন্য বিশ্বচরাচরের কোন অংশ বা সৃষ্টির সামনে মাথা নত কি সঙ্গত হবে? আর তার সামনে মাটিতে কপাল রাখা কি শোভনীয় হবে?[১]

নির্বোধেরা একে অন্যকে আল্লাহ্ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তারা কখনো অবতার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল, কখনো ক্ষমতার সিংহাসনে আসীন

---

১. বর্তমান যুগে যে অবস্থা বিরাজ করছে এবং যেসব কঠিনতম সমস্যা মাথাচড়া দিয়ে ওঠছে তা দেখে এটা কল্পনাই করা যায় না যে কোন আধুনিক বুদ্ধিমান মানুষ ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। অথবা এর উপস্থাপিত জীবন বিধানকে অস্বীকার করতে পারে। পৃথিবীর আদিম বা অন্ধকার যুগে মানুষ যেসব সীমাহীন অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিল আজকের এক বিংশ শতকেও সেসব কাজে লিপ্ত রয়েছে। তথ্য সাইয়্যেদ কুতুব এর প্রবন্ধ ইসলাম ও আধুনিক ভাবধারা : দ্বীন ইসলাম, ইসলামি ডাইজেস্ট পত্রিকা : মোহাম্মদ শামসুজ্জামান সম্পাদিত আগষ্ট-১৯৯৭ ১ম সংখ্যা।

www.nagorikpathagar.org

হয়ে ফিরাউন, নমরূদ ও শাহানশাহ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, কখনো পবিত্রতার বেশ ধারণ করে যোগী ও সন্ন্যাসী আখ্যা লাভ করেছিল। কখনো আবার পোপ, রাব্বি ও দরবেশ সেজে নিজেদেরকে উপাস্য হিসেবে স্বীকার করাতে চেয়েছিল। এসবই ছিল মানবতার লাঞ্ছনা ও অমর্যাদার বিভিন্ন রূপ ও পর্যায়। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামে এসব অনাচারের শিকড় কেটে দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে :

وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ۔

"আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের কেউ যেন কাউকে পালনকর্তারূপে গ্রহণ না করি।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৬৪)

এমন কি নবিগণের জন্যও একথা বলার কোন অবকাশ নেই–

كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ۔

'অন্য সব উপাস্যকে বাদ দিয়ে তোমরা আমার বান্দায় পরিণত হও।'

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৭৯)

ফেরেশ্তাগণ অদৃশ্য সত্তাসমূহের মধ্যে এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য সত্তাসমূহের মধ্যে নবিগণ সর্বাপেক্ষা উন্নত। কিন্তু তারাও মানুষের উপাস্য হওয়ার অনুপযোগী।

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا۔

'আর তিনি (আল্লাহ্) ফেরেশ্তা ও নবিগণকে 'রব' মেনে নেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন না।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৮০)

তাই সঙ্গতভাবেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামে মানবজাতির মর্যাদা এত বেশি উন্নত হয়েছে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো সামনে তার মাথা নত হতে পারে না আর কারো সামনে তার হাতও প্রসারিত হতে পারে না। এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো ভয় করা যাবে না। আসমান ও যমীনে একমাত্র তাঁকেই ভয় করা হয়। তিনি

www.nagorikpathagar.org

বাদশাহ, শক্তিশালী দুশমন, বিপুল বিস্তৃত বনানী, সুউচ্চ পাহাড়, দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তর বা বিরাট সমুদ্র-আল্লাহ্ ব্যতীত এসবের কোনটির সামনে একজন সত্যিকার মুসলমানের অন্তর ভীত-প্রকম্পিত হতে পারে? এ আধ্যাত্মিক শিক্ষার নৈতিকতার প্রতি লক্ষ করুন এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামের উচ্চ মর্যাদাও অনুধাবন করুন।

২. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় মৌলিক পয়গাম হচ্ছে এটাই যে, জন্মগতভাবে মানুষ পবিত্র, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ। ভাল-মন্দ কাজে মানুষ নিজেকে ফেরেশ্তা বা শয়তান অর্থাৎ বেগুনাহ বান্দাহ্কে গুনাহগারে পরিণত করে। মানুষের মূল প্রকৃতি পরিষ্কার এবং দাগবিহীন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থেকে মানুষ এ বৃহত্তম সুসংবাদ লাভ করেছে। বার্মা, পাক-ভারত এবং বাংলাদেশের সকল ধর্ম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। নির্বোধ গ্রীসের অনেক দার্শনিকও এ চিন্তার সাথে একমত।

কিন্তু এ ধারণাটি মানবজাতিকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে এবং এর পিঠে ভারী বোঝা স্থাপন করেছে। তার প্রত্যেকটি কর্মকে অন্য কর্মের ফল হিসেবে চিত্রিত করে তাকে অক্ষম প্রাণীতে পরিণত করেছে। আর তার প্রত্যেকটি জীবনকে করেছে অন্য জীবনের হাতে সোপর্দ। এ বিশ্বাস অনুসারে কোন মানুষের পুনর্জন্মই তার গুনাহগার হবার প্রমাণ স্বরূপ। খ্রিষ্টধর্মও মানবজাতির এ বোঝা হালকা করেনি; বরং আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষাদান করেছে যে, প্রত্যেকটি মানুষ পিতা আদমের গুনাহের কারণে উত্তরাধিকারাসূত্রে গুনাহ্গার। ব্যক্তিগতভাবে কোন গুনাহ্ না করলেও উত্তরাধিকারাসূত্রে পাওয়া এ গুনাহ্ থেকে সে নিস্কৃতি পেতে পারে না। তাই মানুষের পাপমুক্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারাসূত্রে পাপী নয় এমন এক অতি মানুষের প্রয়োজন, তিনি নিজের প্রাণ দান করে মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বিপর্যস্ত মানবতাকে এ সুসংবাদ প্রদান করেন যে, তোমরা নিজেদের পূর্বজন্ম ও কর্মফলের ক্রীড়নক নও, তোমরা অক্ষম নও এবং তোমাদের পিতা আদমের গুনাহ্র কারণে তোমরা জন্মগতভাবে গুনাহগার নও; বরং তোমরা স্বাভাবিক নিয়মেই পাক-পবিত্র, নিষ্কলংক এবং নির্দোষ। ইচ্ছা হলে তোমরা নিজেদের কর্মে নিজেদের পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বা অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে নিমজ্জিতও হতে পার।

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۔ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۔ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ ۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ ۔ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔

'ত্বীন ও যয়তুন গাছ এবং সিনাই পাহাড় ও এ শান্তি শহরের (মক্কা) শপথ, অবশ্যই আমি মানুষকে উত্তম সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। এরপর আমি তাকে নিম্ন থেকে নিম্নতর পর্যায়ে পৌছিয়ে দিয়েছি; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে নয়।' (সূরা আত্ তীন)

এ সুসংবাদ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম মানবজাতিকে প্রদান করেছে যে, মানুষকে সর্বোত্তম অবস্থা, সর্বোত্তম ভারসাম্য এবং সরলতার পর্যায়ে সৃষ্টি করা হয়েছে; কিন্তু নিজের করণীয় কাজে ফেলে সে সৎ ও অসৎ পরিণত হয়ে যায়।

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا ۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۔

'নফসের শপথ এবং তাকে যথাযথভাবে গঠন করার শপথ, এরপর আমি তাকে উত্তম এবং অধমের মাঝে পার্থক্য করার জ্ঞান দান করেছি। যে তাকে (নফসকে) পবিত্র রেখেছে, সে সফলকাম হয়েছে আর যে একে (নফসকে) মলিন করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।' (সূরা আশ শামস্, আয়াত : ৭-১০)

www.nagorikpathagar.org

এর চেয়ে মানবতার প্রকৃতিগত পবিত্রতার জন্য স্বচ্ছ পয়গাম আর কী হতে পারে?

সূরায়ে দাহারে পুনর্বার বলা হয়েছে :

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۔ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ۔

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি (নারী পুরুষের) মিশ্রিত শুক্র থেকে, যেন আমি তাকে (তার ভালো মন্দের ব্যাপারে) পরীক্ষা করতে পারি, অতঃপর (পরিক্ষার উপযোগী করে তোলার জন্যে) তাকে আমি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করে পয়দা করেছি। আমি তাকে (চলার) পথ দেখিয়ে দিয়েছি, সে চাইলে (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ হবে, না হয় (অকৃতজ্ঞ) কাফের হয়ে যাবে। (সূরা দাহর, আয়াত : ২-৩)

সূরা ইনফিতারে বলা হয়েছে :

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۔ الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ۔ فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۔

"হে মানুষ! কোন্ জিনিসটি তোমাকে তোমার মহামহিম মালিকের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে রাখলো? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তোমাকে সোজা সুঠাম করেছেন এবং তোমাকে সুসামঞ্জস করেছেন, তিনি যেভাবে চেয়েছেন সে আঙ্গিকেই তোমাকে গঠন করেছেন।"

(সূরা আল ইনফিতর, আয়াত : ৬-৮)

হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওহির ভাষায় দীন (জীবন-বিধান) ও প্রকৃতি দুটি সমার্থক শব্দ। দীন হচ্ছে আসল প্রকৃতি আর পাপ মানুষের একটি রোগ, তা বাইরে থেকে মানুষকে আক্রমণ করে।

www.nagorikpathagar.org

কুরআনে বলা হয়েছে :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ـ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

'তুমি বাতিল থেকে সরে এসে নিজেকে দীনের ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহ্ তাঁর নিজ প্রকৃতির ওপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই হচ্ছে (প্রতিষ্ঠিত) সহজ-সরল দীন। কিন্তু অনেক মানুষই তা অবগত নয়।' (সূরা আর রূম, আয়াত : ৩০)

এ আয়াতটির অর্থ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক পয়গামে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে। বুখারি শরীফে সূরায়ে রূমের তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَا مِنْ مَّوْلُوْدٍ يُوْلَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ...

অর্থাৎ 'এমন কোন শিশু নেই যে, স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপর জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু পরবর্তীকালে তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারিতে পরিণত করে। যেমন, দেখা যায় প্রত্যেক পশুর বাচ্চা নিখুঁত জন্মায়। আপনারা কি কখনো কোন পশুর কানকাটা বাচ্চা জন্মাতে দেখেছেন?'

চিন্তা করুন! মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পয়গাম মানবজাতিকে কত বড় সুসংবাদ প্রদান করেছে। কীভাবে মানুষের চিরন্তন দুঃখকে আনন্দে পরিবর্তিত করেছে এবং প্রত্যেকটি মানুষকে নিজের জীবনের কর্মক্ষেত্রে কীভাবে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

৩. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীর সমগ্র জনবসতি ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। মানুষ পরস্পরের কাছে অপরিচিত। হিন্দুস্তানের মুনি-ঋষিরা আর্যাবর্তের বাইরে আল্লাহ্র বাণীর জন্য কোন স্থান রাখেননি। তাঁদের মতে পরমেশ্বর শুধু আর্যাবর্তের মানুষের কল্যাণ চেয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা শুধু এদেশের এবং এখানকার কিছু খান্দানকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। যরথুষ্ট্র ইরানের পবিত্র মানবগোষ্ঠী ছাড়া আর কোথাও আল্লাহ্র বাণী শুনাতেন না। বনি ইসরাঈলগণ তাদের নিজেদের খান্দানের বাইরে কোন রাসূল ও নবির আবির্ভাবের অধিকার স্বীকার করে না। সর্বপ্রথম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামই পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সর্বত্র আল্লাহর আওয়াজ শোনায় এবং বলে যে, নেতৃত্ব কোন বিশেষ দেশ, জাতি এবং ভাষার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। তাঁর দৃষ্টিতে ফিলিস্তিন, ইরান, হিন্দুস্তান ও আরব সকল দেশই সমান। সর্বত্রই তাঁর পয়গামের আওয়াজ ধ্বনিত হয়েছে এবং তাঁর নেতৃত্বের আলোক সকল দিকেই আলোকিত হয়েছে।

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ۔

'এমন কোন জাতি নেই যার মাঝে একজন ভীতি প্রদর্শনকারীর আবির্ভাব হয়নি।' (সূরা আল ফাতির, আয়াত : ২৪)

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔

"আর প্রত্যেক জাতির জন্য এসেছেন একজন পথপ্রদর্শক।" (সূরা রা'দ, ৭)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ۔

'আর আমি (আল্লাহ্) তোমার (মুহাম্মদ) পূর্বে তাদের নিজেদের জাতিদের কাছে বহু রাসূল পাঠিয়েছি।' (সূরা আর রূম, আয়াত : ৪৭)

www.nagorikpathagar.org

কোন ইহুদি তার জাতির বাইরে কোন নবিকে স্বীকার করে না। কোন খৃষ্টানের জন্য বনি ইসরাঈল বা অন্যান্য দেশের নেতৃবৃন্দকে স্বীকার করা অপরিহার্য নয়। আর এমন কাজে তার খৃষ্টানিত্বের মধ্যে কোন তফাৎ নির্ধারণ হয় না। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা আর্যাবর্তের বাইরে আল্লাহর কোন বাণী আগমনে অবিশ্বাসী। ইরানের যরথুষ্ট্র মতাবলম্বীগণ নিজেদের দেশ ছাড়া পৃথিবীর সকল দেশকেই অন্ধকার রাজ্য বলে মনে করে। কিন্তু একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামই ঘোষণা করে যে, গোটা পৃথিবী আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহর দানে প্রত্যেক জাতি, গোত্র ও বংশ সমান অংশীদার। ইরান বা হিন্দুস্থানে, চীনে বা গ্রীসে, আরবে বা সিরিয়ায় সর্বত্রই আল্লাহর জ্যোতি সমানভাবে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দুনিয়ার যেখানেই জনবসতি রয়েছে, সেখানেই আল্লাহ তাঁর দূত পাঠিয়েছেন, তাঁর পথ-প্রদর্শনকারীর আবির্ভাব ঘটিয়ে তাঁদের মাধ্যমে নিজের বিধি-বিধান সম্পর্কে সবাইকে অবগত করেছেন।

ইসলামের এ শিক্ষার ফলে কোন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হতে পারে না, যতক্ষণ না সে পৃথিবীতে সকল নবি-রাসূলের ওপর, আসমানি কিতাবসমূহের ওপর এবং আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ববর্তী বাণীসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। কুরআনে যে সকল নবি-রাসূলের নাম উল্লেখ রয়েছে, তাঁদের নামসহ আর যাঁদের নাম অজ্ঞাত অর্থাৎ কুরআন জানায়নি তাঁরা, যে দেশেই আবির্ভূত হোন না কেন এবং যে নামেই পরিচিত হোন না কেন, তাঁদের সবাইকে সত্যরূপে স্বীকার করা অপরিহার্য।

কে মুসলমান?

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج

(হে মুহাম্মদ!) তোমার ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্ববর্তীগণের ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছিল, তার ওপর যারা ঈমান রাখে।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত : ৪)

www.nagorikpathagar.org

আবারো সূরা বাকারায় বলা হয়েছে :

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ۔

'কিন্তু নেকি তার জন্য নির্ধারিত যে আল্লাহর ওপর, আখিরাতের দিনের ওপর, ফেরেশতাগণের ওপর ও সকল নবির ওপর ঈমান এনেছে।' (সূরা আল বাকারা, ১৭৭)

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ق

এ সূরার শেষের দিকে বলা হয়েছে : নবি ও তাঁর অনুসারীগণের 'সবাই ঈমান এনেছেন আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর ও তাঁর রাসূলগণের ওপর। (তারা বলেন :) আমরা তাঁর (আল্লাহর) রাসূলগণের মাঝে কোন ব্যবধান করি না।'

(সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২৮৫)

অর্থাৎ এমন নয় যে, তাঁদের কারো ওপর ঈমান আনবে এবং কারো ওপর ঈমান আনবে না। সমগ্র মুসলিম জাতিকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ۔

'হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো আল্লাহর ওপর, তাঁর রাসূলের ওপর এবং যে কিতাব ইতোপূর্বে নাযিল হয়েছে তার ওপর।' (সূরা আন নিসা, আয়াত : ১৩৬)

বন্ধুগণ! আর কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া জগতকে এ আধ্যাত্মিক সাম্য, মানবিক ভ্রাতৃত্ব এবং সকল সত্য ধর্ম, ধর্মীয় নেতৃত্ব নবি-রাসূলগণের প্রতি যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন ও সমানভাবে তাঁদের সত্যতার স্বীকৃতির শিক্ষা প্রদান করেছে? এবার চিন্তা করুন, ইসলামের নবির 'রহমত' কত সর্বজনীন, তাঁর সহানুভূতি এবং সাম্যের পরিসর কত প্রসারিত! কোন মানুষ, কোন আবাস, বনি আদমের কোন বাসস্থান এ থেকে মুক্ত নয়।



www.nagorikpathagar.org

৪. সকল ধর্ম উপাস্য ও উপাসক, আল্লাহ ও বান্দার মধ্যস্থলে কোন না কোন ধরনের মধ্য-সত্তা সৃষ্টি করে রেখেছিল। প্রাচীন মন্দিরগুলোর পূজারি ও পুরোহিত ইহুদিরা বনি লাবী এবং তাঁর বংশধরদেরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বান্দার ইবাদত এবং কুরবানির মধ্যস্বত্বা বিবেচনা করে। খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসার কিছু হাওয়ারি (সাথী) ও তাদের স্থলাভিষিক্ত পোপদেরকে এ মর্যাদা প্রদান করেছিল যে, তারা যমীনের ওপর যা বাঁধবে, আকাশেও তাই উন্মুক্ত করা হবে। তাদেরকে সকল মানুষের গোনাহ মাফ করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। তাদের সাহায্য ছাড়া কোন ইবাদত হতে পারে না। হিন্দুদের মত আল্লাহ বিশেষভাবে ডান হাত দিয়ে ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করেছেন। সেই হচ্ছে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যস্বত্বা। তার সাহায্য ছাড়া হিন্দুর কোন আরাধনা পরিপূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু ইসলামে পূজারি পুরোহিত পোপ এবং পাদ্রীদের কোন শ্রেণি নেই। এখানে বাঁধা ও খোলার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। এখানে গোনাহ মাফ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র। উপাস্য, উপাসক, আল্লাহ ও বান্দার ইবাদত এবং গোপন সম্পর্কে মধ্যে অন্য কারো কোন অধিকার নেই। প্রত্যেক মুসলমান নামাযের ইমাম হতে পারে, কুরবানি করতে পারে, বিয়ে পড়াতে পারে এবং ধর্মের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারে। এখানে মানবজাতির জন্য اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (হে লোকেরা সরাসরি আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জবাব দেব)-এর আহবান সর্বজনীন। প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র সাথে সরাসরি কথা বলতে পারে, নিজের দোয়ার মধ্যে তাঁকে ডাকতে পারে, তাঁর কাছে মাথা অবনত করতে পারে এবং হৃদয়ের ভক্তি সরাসরি উত্থাপন করতে পারে। এখানে উপাস্য ও উপাসক এবং আল্লাহ ও বান্দার ক্ষেত্রে কোন মধ্যস্বত্বা নেই। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানবজাতিকে এ শ্রেষ্ঠতম আযাদি প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর ব্যাপারে মানুষ মানুষের দাসত্বমুক্ত হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের পুরোহিত, পোপ এবং ব্রাহ্মণ।

www.nagorikpathagar.org

৫. যুগে যুগে মানুষের শিক্ষা এবং হিদায়াতের জন্য যে সকল পবিত্রাত্মা আগমন করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে শুরু থেকেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে সীমাতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা বিদ্যমান ছিল এবং তাদের মর্যাদার ক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়িও ছিল। বাড়াবাড়ি এটাই ছিল যে, মূর্খরা তাঁদেরকে আল্লাহ, আল্লাহর সমতুল্য, আল্লাহর রূপ বা তাঁর প্রকাশ গণ্য করেছিল। ব্যাবিলন, আসিরিয়া ও মিসরের ধর্ম মন্দিরসমূহে পুরোহিতদেরকে আল্লাহর সমতুল্যরূপে দেখা যায়। হিন্দুদের মাঝে অবতারবাদ স্বীকৃতি লাভ করেছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীগণ যথাক্রমে নিজেদের ধর্মপ্রবর্তক বুদ্ধ ও মহাবীরকে আল্লাহ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। খ্রিষ্টানরা তাদের নবিকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করেছে। অন্যদিকে বনি ইসরাঈলদের মধ্যে যে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, সে ছিল নবি ও রাসূল, সে গোনাহগার হোক বা নৈতিক দিক দিয়ে যতই নিম্ন পর্যায়ের এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে সে যে কোন পর্যায়ে অবস্থান করুক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। তার সৎ ও নিষ্পাপ হওয়াও বাধ্য-বাধকতা ছিল না। তাই বনী ইসরাইলদের বর্তমান আসমানি কিতাব ও পুস্তিকাসমূহে বড় বড় নবি-রাসূল সম্পর্কে এমন সব কাহিনির উল্লেখ পাওয়া যায়, যা একেবারেই নিম্নমানের। এমন কি তা উল্লেখ করারও অযোগ্য।

এ বিরাট দায়িত্বটির মর্যাদা নির্ধারণ করেছে ইসলাম এবং বলেছে যে, নবিগণ আল্লাহ্ নন, আল্লাহ্ সমতুল্যও নন, অবতারও নন এবং আল্লাহ্র পুত্র ও আত্মীয়ও নন। তাঁরা হলেন মানুষ, নিছক মানুষ, রক্ত মাংসে গড়া দেহবিশিষ্ট মানুষ। নির্জলা মানুষরূপেই সকল নবি-রাসূল আগমন করেছিলেন এবং সর্বশেষ নবি নিজের সম্পর্কে বলেছেন : 'আমি একজন মানুষ মাত্র।' কাফেররা সবিস্ময়ে বলেছেন : أَبَشَرًا رَّسُوْلًا 'মানুষ কি রাসূল হতে পারে?' ইসলাম বলে, 'হ্যাঁ।

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ. هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا.

'হে নবি! বলে দিন, আমি তোমাদেরই মতই মানুষ!' 'আমি তো মানুষ, রাসূল ব্যতীত কিছুই নই।' (সূরা কাহাফ, ১১০, সূরা ইসরাঈল, ৯৩)

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগতে কোন বস্তুর ওপর নবিগণের সরাসরি কোন অধিকার নেই। তাঁর সরাসরি কোন অতি মানবিক কার্য সম্পাদনের শক্তি রাখেন না। তাঁরা সব কিছু আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও ইশারায় সম্পন্ন করে থাকেন।

অন্যদিকে বলা হয়েছে, যদিও তাঁরা মানুষ-তবুও নিজেদের কর্মশক্তি ও যোগ্যতার দিক দিয়ে তাঁরা সমস্ত মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ। তাঁরা আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলেন। তাঁদের ওপর আল্লাহ্‌র ওহি নাযিল হয়। তাঁরা নিষ্পাপ। কেননা তাঁরা হবেন পাপীদের জন্য আদর্শ। তাঁদের হাত দিয়েই আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ এবং ইশারায় নিজের অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করেন। তাঁরা মানুষকে সৎশিক্ষা দেন। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের আনুগত্য সবার ওপর ফরয। তাঁরা আল্লাহ্‌র বিশেষ, খাঁটি এবং অনুগত বান্দা। আল্লাহ্ তাঁদেরকে রিসালাত এবং নবি তাঁর দায়িত্ব প্রদান করেছেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম নবি ও রাসূলগণের সম্পর্কে এ ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থার প্রচলন করেছে। এ পন্থা সকল প্রকার বাড়াবাড়ি এবং সীমাতিরিক্ততার ত্রুটিমুক্ত। যে ধর্ম জগতে তাওহীদকে পূর্ণতা প্রদান করেছে, এটি একমাত্র তারই উপযোগী বলে বিবেচিত।

বন্ধুগণ! আমাদের আলোচনা বেশ সুদীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। এখনো অনেক কথা বলা হলো না। ইনশাআল্লাহ্ আগামী আলোচনায় আরো কিছু উল্লেখ করা হবে। রাত অনেক হয়েছে। তাই আজকের মজলিস এ চিরন্তন, পরিপূর্ণ এবং বিশ্বজনীন শিক্ষকের প্রতি দরূদ এবং সালাম প্রদান করে সমাপ্ত করা হলো।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

www.nagorikpathagar.org

# ৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিতে ঈমান ও আমল

প্রিয় বন্ধুগণ! আজ আমার এবং আপনাদের মাসাধিককাল সাক্ষাৎকারের পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে আর আমার অষ্টম মৌলিক বিষয়গুলোর বক্তৃতা আজ শুরু হচ্ছে। আমি আমার পরিসমাপ্তিমূলক দুটি বক্তৃতায় ইসলামের সরল সব কথা আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চাচ্ছি।

পূর্বের অন্যান্য ধর্মগুলো তাওহীদের ক্ষেত্রে যেগুলো মূলত তাওহীদেরই পয়গাম নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল সেসব তিনটি কারণে বিভ্রান্তি এবং গোমরাহির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম, দেহভিত্তিক উপমা এবং রূপ বর্ণনা।

দ্বিতীয়, আল্লাহর গুণাবলিকে তাঁর অস্তিত্ব থেকে পৃথক এবং স্বতন্ত্র মনে করা।

তৃতীয়, কর্মবৈচিত্র্য সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়া। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামে এ গ্রন্থিগুলো উন্মুক্ত করে দিয়েছে, এ বিভ্রান্তিগুলো আপনোদন করেছে এবং এ সত্যকে আবরণমুক্ত করেছে। সর্বপ্রথম উপমা এবং রূপকের আলোচনায় সেগুলো উল্লেখ করা যাচ্ছে।

'আল্লাহকে, আল্লাহ্র গুণাবলিকে, আল্লাহ্ এবং বান্দার পারস্পরিক সম্পর্ককে সুস্পষ্ট করার জন্য অন্যান্য ধর্মগুলোর ভক্তবৃন্দ কাল্পনিক বা বস্তুগত উপমা এবং রূপকের অবতারণা করে। ফলে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্র প্রকৃত অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে থাকে এবং সেখানে উপমা এবং রূপকে বর্ণিত আস্তিত্বসমূহ আল্লাহর স্থান লাভ করে। এ অস্তিত্বগুলো পরে দেহ ধারণ করে মূর্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং মানুষ তাদের পূজা করার সূচনা করে। বান্দার

www.nagorikpathagar.org

প্রতি আল্লাহ্‌র স্নেহ, ভালবাসার এবং করুণাকেও উপমা ও রূপকের রঙে রঙীন করে দেহের রূপদান করা হয়। যেহেতু আর্য জাতিগুলোর মধ্যে নারী ছিল প্রেমের দেবী, তাই আল্লাহ্ এবং বান্দার সম্পর্ককে 'মাতা' ও 'পুত্র' নমে অভিহিত করা হয়। আর এ জন্য সেখানে আল্লাহ 'মা' রূপে আগমন করেছেন। হিন্দুদের অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ে এ অনাস্বাদিত প্রেমকে নারী-পুরুষ এবং স্বামী-স্ত্রী শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়টি চিরসোহাগী যোগীরা শাড়ী এবং চুড়ি পরিধান করে প্রকাশ করেছেন। গ্রীক এবং রোমীয়দের মাঝেও আল্লাহকে নারী মূর্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে। সিরীয় জাতিদের কাছে প্রকাশ্যে নারীর নামোচ্চারণ ছিল সভ্যতা বিরোধী। তাই পিতা খান্দানের মূল ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এভাবে ব্যাবিলন, আসিরিয়া এবং সিরিয়ার প্রাচীন ধবংসাবশেষগুলোর মধ্যে আল্লাহকে পুরুষের রূপে দেখা যায়। বনি ইসরাঈলদের প্রারম্ভিক চিন্তাধারায় আল্লাহকে পিতা এবং সকল ফেরেশতা এবং মানুষকে তার সন্তানরূপে অভিহিত করা হয়। পরবর্তীকালে শুধু বনি-ইসরাঈলগণই পিতারূপী আল্লাহর সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বনি-ইসরাঈলদের অনেক সহীফায় আল্লাহ ও বনি-ইসরাঈলদের সম্পর্ককে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এমন কি বনি-ইসরাঈল ও জেরুজালেম স্ত্রী হিসেবে এবং আল্লাহ এদের স্বামী হিসেবে পরিগণিত হয়। খ্রিষ্টানদের মাঝেও পিতা এবং পুত্রের উপমা আসল সম্পর্কের স্থান লাভ করে। আরবদের মধ্যেও এমন ধারণা ছিল। আল্লাহকে পিতারূপে ধারণা করা হত এবং ফেরেশতাগণকে তাঁর কন্যারূপে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম সেসব উপমা, রূপক ও প্রবাদকে নিমেষেই নিশ্চিহ্ন করে সেগুলোর ব্যবহার শিরকরূপে চিহ্নিত করেছে। এখানে সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করা হয়েছে–

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.

"তাঁর সমতুল্য কোন বস্তুই নেই।" (সূরা শূরা, আয়াত : ১১)

এ একটি বাক্যই যাবতীয় শিরকের ভিত্তিমূল উৎপাটিত করেছে। এরপর ছোট একটি সূরার মাধ্যমে মানুষের বৃহত্তম বিভ্রান্তি দূর করে দিয়েছে :

www.nagorikpathagar.org

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۔ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ۔

'(হে মুহাম্মদ!) বলে দাও, আল্লাহ এক। আল্লাহ (নিজেই প্রত্যেক বস্তুর) অমুখাপেক্ষী। সকল বস্তুই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি জন্ম দেন না (যারা তাঁর সন্তান গণ্য হতে পারে) এবং তিনি কারো জাতও নন (যাতে কারো সন্তান হয়ে তারপর আল্লাহ হতে হয়)। আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই (যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে।)' (সূরা আল ইখলাস, আয়াত : ১-৪)

কুরআনের এ সবচেয়ে ছোট্ট সূরাটিতে তাওহীদের পরিচ্ছন্ন চিত্ররূপে প্রকাশ হয়েছে। যার ফলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীন সব রকমের ত্রুটিমুক্ত হয়েছে।

বন্ধুগণ! এর অর্থ এ নয় যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যকার প্রেম, ভালবাসা ও স্নেহের সম্পর্ক ছিন্ন করছেন, বরং তিনি এ সম্পর্কগুলোকে আরো বেশি শক্তিশালী ও গভীর করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কগুলো প্রকাশ ও কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন মানবিক আকৃতির মাধ্যমে যে দেহভিত্তিক ব্যাখ্যার প্রচলন ছিল, শুধু সেগুলোকে বিলুপ্ত করেছেন। কারণ প্রথম, এ মানবিক পদ্ধতি সত্যের প্রকাশ থেকে বহু দূরে অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে বান্দা এবং আল্লাহর সাথে যে সম্পর্ক, তার তুলনায় পিতা, পুত্র, মাতা, কন্যা বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিতান্তই অর্থহীন ও নিম্নস্তরের। দ্বিতীয়, সে ব্যাখ্যাসমূহের দ্বারা শিরকের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

তাই ইসলাম বলেছে :

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا.

"তোমরা আল্লাহকে ঠিক তেমনিভাবে স্মরণ কর, যেমন তোমাদের পিতাদেরকে স্মরণ করে থাক অথবা তার চেয়েও বেশি করে (স্মরণ কর) আল্লাহকে।"

www.nagorikpathagar.org

ভেবে দেখুন, এ আয়াতে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য এ কথা বলা হয়নি যে, আল্লাহ তোমাদের পিতা অর্থাৎ আল্লাহ এবং পিতাকে উপমান এবং উপমা হিসেবে উত্থাপন করা হয়নি; বরং আল্লাহর ভালবাসা এবং পিতার ভালবাসা এ উভয় ভালবাসাতে উপমা এবং উপমেয়রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে প্রমাণ হয় যে, ইসলাম এ দৈহিক সম্পর্ককে ত্যাগ করেছে কিন্তু এ দৈহিক সম্পর্কের ফলে সৃষ্ট ভালবাসাকে জীবিত রেখেছে; বরং সামনে এগিয়ে বলেছে : 'আল্লাহকে পিতার চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসা উচিত।' اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا থেকে প্রমাণ হয় যে, এ সম্পর্কে সৃষ্ট ভালবাসাকে সে আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে ভালবাসার তুলনায় তুচ্ছ ও নিম্ন পর্যায়ের মনে করে এবং এর মধ্যে উন্নতির প্রয়োজন অনুভব করে। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ঈমানদারগণ আল্লাহকে সর্বাধিক ভালবাসে।' ইসলাম 'আল্লাহকে 'আবুল 'আলামীন' (বিশ্বপিতা) বলে না, বরং বলে 'রাব্বুল 'আলামীন' (বিশ্বপালক)। কেননা তার দৃষ্টিতে তার পিতার চেয়ে রব (প্রতিপালক)-এর মর্যাদা অনেক ওপরে অবস্থান করে। পিতার সম্পর্ক পুত্রের সাথে সাময়িক কিন্তু 'রবে'র সম্পর্ক তাঁর সৃষ্টির সাথে তার অস্তিত্ব লাভে পরবর্তী মুহূর্ত থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিদ্যমান। এর মধ্যে একটি মুহূর্তেরও ছেদ নেই। ইসলামের আল্লাহ হচ্ছেন 'ওয়াদুু' অর্থাৎ প্রেমসম্পন্ন, 'রউফ' অর্থাৎ এমন স্নেহ ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ যেমন স্নেহ ও ভালবাসা পিতা-পুত্রের প্রতি পোষণ করেন এবং 'হান্নান' অর্থাৎ এমন স্নেহ ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ, যেমন স্নেহ এবং ভালবাসা মা-সন্তানের প্রতি পোষণ করেন। কিন্তু এরপরও তিনি পিতাও নন, মাতাও নন, বরং এ উপমাগুলোর বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

২. বন্ধুগণ! প্রাচীন ধর্মসমূহের তাওহীদ-বিশ্বাসে বিভ্রান্তির দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে ভুল ধারণা। অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলিকে তাঁর সত্তা থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিসেবে স্বীকার করা। হিন্দুধর্মে দেবতার যে বিরাট দল দৃষ্টিগোচর হয়, এর মূল কারণও এখানেই নিহিত। তারা আল্লাহর প্রতিটি গুণকে একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে স্বীকার করে

www.nagorikpathagar.org

নিয়েছে, এর ফলে দেবতার সংখ্যা ৩৩ কোটিতে গিয়ে পৌঁছেছে। সংখ্যা ছাড়াও গুণাবলির উপমা ও রূপককেও তারা দেহধারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আল্লাহর শক্তিকে তারা সত্যিকার হাতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে এবং তাঁর দেহধারী উপমা এবং রূপককেও দেহধারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাঁর দেহধারী উপমা প্রদান করতে গিয়ে দু' হাতের পরিবর্তে কয়েক জোড়া হাত তৈরি করেছে। আল্লাহর গভীর এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে বুঝাতে গিয়ে একটি মস্তকের স্থলে দ্বিমস্তকধারী মূর্তিতে পরিণত করে দিয়েছে। (নাউজুবিল্লাহ)

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে চিন্তা করা হলে জানতে পারবেন যে, একই আল্লাহর গুণাবলি ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দেহ রূপদান করার কারণে তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে। আল্লাহর তিনটি প্রধান পরিচয় হচ্ছে : তিনি স্রষ্টা, প্রতিপালনকারী এবং ধ্বংসকারী।

হিন্দু সম্প্রদায়সমূহ এ তিনটি পরিচয়কে তিনটি পৃথক অস্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি করে নিয়েছে :

১. ব্রহ্মা, তথা (খালিক=স্রষ্টা, ২. বিষ্ণু তথা (কাইয়্যুম=চিরঞ্জীব, ৩. শিব তথা (মুমীত=মৃত্যুদাতা)।

ব্রহ্মার অর্চনাকারীরা ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুর অর্চনাকারীরা বৈষ্ণব। আর শিবের অর্চনাকারীরা শৈব। এভাবে এক আল্লাহর আলাদা আলাদা তিনটি সত্তাকে পৃথক পৃথক তিনটি সত্তা ধরে নিয়ে এক রব থেকে তিন দেবতা বানানো হয়েছে এবং তিন দেবতার তিন রকম উপাসক তৈরি হয়েছে। অপরদিকে শিব লিঙ্গের উপাস্য করা সৃষ্টিগুণকে আল্লাহ স্থির করে থাকে। কিন্তু নর-নারীর লিঙ্গ যেহেতু প্রজনন অঙ্গ এবং এ প্রজনাঙ্গের মাধ্যমেই সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের যথাযথ অভিব্যক্তি ঘটে,সেহেতু তারা লিঙ্গ মূর্তি বানিয়ে নেয়া এবং লিঙ্গ মূর্তিরই পূজা অর্চনায় লিপ্ত হয়।[১]

---

[১]. এ সম্পর্কে আরো জানতে হলে ইসলাম ও হিন্দুধর্ম গ্রন্থ দেখুন।
প্রকাশক : ইতিহাস সংকলন, প্রণয়ন ও গবেষণা সংস্থা, ঢাকা। (সম্পাদক)

www.nagorikpathagar.org

খ্রিষ্টানরা আল্লাহর তিনটি বৃহত্তম গুণ অর্থাৎ চিরস্থায়ী অস্তিত্ব, অসীম জ্ঞান ও অপ্রতিরোধ্য সংকল্পকে তিনটি পৃথক অস্তিত্ব হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। চিরস্থায়ী অস্তিত্ব হচ্ছে পিতা, অসীম জ্ঞান হচ্ছে পবিত্র আত্মা এবং সঙ্কল্প হচ্ছে পুত্র। এ ধরনের ধারণা রোমীয়, গ্রীক ও মিসরীয় চিন্তায়ও লক্ষ করা যায়।

কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম এ ভ্রান্তি অপনোদন করেছে এবং গুণাবলির বৈচিত্রে প্রতারিত হয়ে আল্লাহকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করা মানুষের মূর্খতা ও অজ্ঞতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কুরআন বলেছে : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'সমস্ত গুণাবলি একমাত্র বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর ক্ষেত্রে নির্ধারিত' وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى 'সমস্ত উত্তম গুণাবলি একমাত্র তাঁরই ক্ষেত্রে নির্ধারিত।' اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ 'আল্লাহ হচ্ছেন যমীন ও আসমানের নূর।' আরবে এ সত্তাকে 'রহম' গুণে বীভূষিত করে খিষ্টানরা তাঁকে বলে রহমান। আরবের সাধারণ মুশরিকরা তাঁকে বলে 'আল্লাহ'।

কুরআনে বলা হয়েছে :

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى۔

'আল্লাহ্' বলে ডাক বা 'রহমান' বলে ডাক, যাই বলে ডাক না কেন, সমস্ত উত্তম নাম বা উত্তম গুণাবলি একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত।'

(সূরা আল ইসরা, আয়াত : ১১০)

فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ۔ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

'কাজেই আল্লাহই হচ্ছেন বন্ধু এবং কার্যোদ্ধারকারী, তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর শক্তিশালী!' (সূরা আশ শূরা, আয়াত : ৯)

اَلَا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

'জেনে রেখ, অবশ্যই আল্লাহ্ ক্ষমাকারী ও করুণাশীল।' (সূরা আশ্ শূরা, ৫)

www.nagorikpathagar.org

وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ إِلٰهٌ وَّفِى الْأَرْضِ إِلٰهٌ وَّهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ۔

'তিনি আসমানে আল্লাহ এবং তিনি যমীনেও আল্লাহ এবং তিনি সুবিবেচক জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।' (সূরা আয যুখরুফ, আয়াত : ৮৪)

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ۔

'তিনিই শোনেন ও জ্ঞানী। তিনি আসমান যমীন যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে, সবকিছুর প্রতিপালক-যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস কর। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন।' অর্থাৎ তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, এবং তিনিই শিব তিনটি একই বিশেষ্যের বিশেষণ এবং এদের মাঝে কোন বৈষম্য নেই।

(সূরা আদ দুখান, আয়াত : ৬, ৮)

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

'সকল প্রশংসা এবং গুণাবলি একমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রেই। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং সমগ্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। যমীন এবং আসমানে সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই জন্য নির্ধারিত এবং তিনি পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী।' (সূরা আল জাসিয়া, আয়াত : ৩৬-৩৭)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

www.nagorikpathagar.org

'আল্লাহ ছাড়া আর কোন 'ইলাহ' নেই। তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয়গুলোর সকল খবর রাখেন। তিনি অনুগ্রহশীল ও করুণাময়। আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি বাদশাহ, পবিত্র, শান্তি, নিরাপত্তা ও শান্তি দানকারী, আশ্রয়দাতা, বিপুল শক্তিপ্রয়োগকারী, শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশকারী। মুশরিকরা আল্লাহর সাথে যে সকল বিষয়ে শরীক করে, তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত এবং পবিত্র। আল্লাহ্ই স্রষ্টা। তিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান , তিনি আকৃতি দানকারী, যাবতীয় উত্তম নামসমূহ (বা উত্তম গুণাবলি) তাঁরই জন্য নির্ধারিত। আসমান ও যমীনে যা কিছু (সৃষ্টি) রয়েছে, সবই তাঁর মহিমা প্রকাশ করে। তিনি পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী।

(সূরা আল হাশর, আয়াত : ২৩-২৪)

এ সকল গুণে গুণান্বিত আল্লাহকে আমরা একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। নয়তো অন্যেরা সত্তা এবং গুণাবলিকে পৃথক করে এক আল্লাহকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছিল। سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ বাক্যেও সে শিরকের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহর সত্তাকে তাঁর গুণাবলি থেকে পৃথক করে লোকেরা এ শিরকে নিমজ্জিত হয়েছিল। এ সর্বশেষ পয়গাম একথা ব্যক্ত করেছিল যে, যিনি আল্লাহ তিনিই স্রষ্টা, তিনিই অস্তিত্বদানকারী, তিনিই আকৃতিদানকারী, তিনিই বাদশাহ, তিনিই পবিত্র সত্তা, তিনিই শান্তিদাতা, তিনিই পরাক্রান্ত এবং বিপুল শক্তিশালী এবং তিনিই অনুগ্রহশীল এবং করুণাকারী। সবই একই সত্তার অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি মাত্র এক বা একক।

৩. শিরকের তৃতীয় উৎস হচ্ছে আল্লাহর কর্মবৈচিত্র। নির্বোদেরা মনে করে নিয়েছে যে, বিভিন্নসত্তা বিভিন্ন ধরনের কর্ম সম্পাদন করে থাকে।

কর্ম দু'ভাগে বিভক্ত। একটি সৎ অন্যটি অসৎ বা এভাবেও বলা যায়, একটি উত্তম এবং অন্যটি মন্দ। একটি সত্তার মাঝে উত্তম ও মন্দের ন্যায় দু'টি বিপরীত গুণের সমাবেশ হতে পারে না। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যরথুস্ট্রিয়গণ উত্তম কাজ ও ভাল বিষয়ের জন্য পৃথক আল্লাহ এবং মন্দ

www.nagorikpathagar.org

কাজ এবং মন্দ বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র আল্লাহ্‌র ধারণা করে নিয়েছে। প্রথমটির নাম ইয়াযদাঁ এবং দ্বিতীয়টির নাম আহিরমন! তারা দুনিয়াকে এ দু'টি আল্লাহর পারস্পরিক লড়াইয়ের যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাদের এ ভুল করার কারণ হচ্ছে এটাই যে, তারা উত্তম ও মন্দের তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। বন্ধুগণ, পৃথিবীতে ভাল এবং মন্দ নামক কোন বস্তু নেই। কোন বস্তু তার মূলের দিক দিয়ে উত্তমও নয়, মন্দও নয়। মানুষের এ বস্তু ব্যবহারের মাধ্যমেই তা ভাল এবং মন্দে পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আগুনের উল্লেখ করছি। এর সাহায্যে যদি খাদ্য তৈরি করেন, গাড়ি চালান বা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কাউকেও উত্তাপ দান করেন, তাহলে এগুলো উত্তম। আবার যদি এর সাহায্যে কোন গরিবের ঘর জ্বালিয়ে দেন, তাহলে মন্দ। আগুন তার প্রকৃতির দিক দিয়ে উত্তমও নয়, মন্দও নয়। আপনারা নিজেদের ব্যবহারের মাধ্যমে একে ভাল বা মন্দে পরিণত করেন। তলোয়ার ভালও নয়, মন্দও নয়, আপনারা একে যেভাবে ব্যবহার করবেন, সেভাবেই সে কাজ করবে। অন্ধকার ভালও নয়, মন্দও নয়। তাকে মানুষের ঘরে সিঁদ কাটার জন্য ব্যবহার করলে তা মন্দে পরিণত হয়, আবার নিজেকে দৃষ্টির অন্তরালে রেখে নেকি অর্জন বা মানুষকে শান্তি ও আরামদানের উপায় হিসেবে গ্রহণ করলে তা ভালতে পরিণত হওয়া স্বাভাবিক। এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্, তিনি এ পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন, পদার্থ সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন গুণ ও শক্তিতে ভূষিত করেছেন। এরপর মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাকে হৃদয় এবং মাথা দান করেছেন। এখন দেখুন, এক ব্যক্তি এ বিশ্বজাহানের বিন্যাস এবং পদার্থের গঠনপ্রণালি এবং গুণাবলি দেখে এক মহাশক্তিধর স্রষ্টার সৃষ্টি-ক্ষমতা ও গঠন-বৈচিত্র্যের ওপর বিস্ময় প্রকাশ করে فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ 'শ্রেষ্ঠতম স্রষ্টা আল্লাহ মহামহীয়ান' বলে হযরত ইবরাহীমের ন্যায় এরূপ চিৎকার করে :

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔

www.nagorikpathagar.org

'আমার মুখ সকল দিক থেকে ফিরিয়ে এনে সে সত্তার দিকে স্থাপন করেছি যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' (সূরা আল-আনআম, আয়াত : ৭৯)

অন্যদিকে সে পদার্থ এবং তার শক্তিসমূহ এবং গুণাবলির বাহ্যিক আকৃতিতে বিভ্রান্ত হয়ে এক ব্যক্তির মন ও মস্তিষ্কের যাবতীয় শক্তি আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে এবং পদার্থকেই আসল বিশ্ব ও এর সকল শক্তির মূল মনে করে বলে :

مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ۔

'এ পার্থিব জীবনটি ছাড়া আর কোন জীবন নেই, আমরা মৃত্যুবরণ করি ও জীবিত হই এবং কালের বিবর্তন ব্যতীত আর কিছুই আমাদেরকে মৃত্যু দান করে না।' (সূরা আল জাসিয়া, আয়াত: ২৪)

বিশ্বচরাচর এবং এর সৃষ্টিবৈচিত্র্য সকলের সামনে একইরূপে বিরাজমান, কিন্তু এ বিশ্বে রয়েছে হাজার ধরনের মন-মানসিকতা। একই দৃশ্য দেখে একটি মন আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং অন্যটি গোমরাহী এবং নাস্তিকতায় পরিণত হয়। চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, একটি বস্তু মানুষকে সৎপথও দেখাচ্ছে, আবার বিভ্রান্তও করছে বা এভাবেও বলা যায়, এ বিশ্বচরাচর তার প্রকৃতিগতভাবে সৎপথ প্রদর্শন করা বা পথভ্রষ্ট করার কোন কিছুরই যোগ্যতা রাখে না বরং আপনারা নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য অনুসারে সৎপথ লাভ করছেন, আবার পথভ্রষ্ট হচ্ছেন। আল্লাহর একটি কর্ম পদার্থ যেমন দু' প্রকার ফল দান করে, তেমনি তাঁর পয়গামও দু' প্রকার ফল দান করে। একই কুরআন ও ইঞ্জিল পাঠ করে এক ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পারে এবং সান্ত্বনা লাভ করে এবং অন্য ব্যক্তির মনে সন্দেহের উদয় হয়, সংশয়ের সৃষ্টি হয় এবং সে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। পয়গাম একই, কিন্তু হৃদয় দু'টি এবং এ দু'টি হৃদয় ও দু'টি চিন্তাধারা একই স্রষ্টার সৃষ্টি। স্রষ্টাও এখানে দু'জন নয়। তাহলে এ আলোচনার ফল কী দাঁড়াচ্ছে? ফল এটাই দাঁড়ায় যে, কর্মের প্রকারভেদ ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টার

www.nagorikpathagar.org

অস্তিত্বের প্রমাণ নয়। এ-বিপুল বৈচিত্র্য একই আল্লাহর শক্তিমত্তার প্রকাশ। ভাল এবং মন্দ উভয়ই তাঁরই হাতে এবং হিদায়াত এবং গোমরাহী উভয়ই তাঁর কাছে থেকে আসে।

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا ۭ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۠ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ۔

'নিজের এ বাণীর দ্বারা তিনি (আল্লাহ) অনেককে সত্যপথের সন্ধান দেন। তিনি তাদেরকে সত্যপথের সন্ধান দেন না যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ যাকে অক্ষুণ্ন রাখার আদেশ দেন তাকে ছিন্ন করে এবং জগতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২৬-২৭)

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ۔

'এবং আল্লাহ কাফেরদেরকে সত্য পথের সন্ধান দেন না।'

(সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২৬৪)

এ আয়াতগুলো থেকে জানা যাবে যে, সৎপথ এবং পথভ্রষ্টতা উভয়ের মূলে রয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের দ্বারাই উভয়ের উদ্ভব হয়। মানুষ ফাসেকির কাজ করে, আত্মীয়-পরিজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, ফেতনা সৃষ্টি করে, কুফরি করে, এরপর পথভ্রষ্টতা অনুসরণ করে। পথভ্রষ্টতা কখনো প্রথমে এবং ফাসেকি, নির্লজ্জতা ইত্যাদির পরেই সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে বলে দিয়েছেন যে, এ পথটি গন্তব্যের দিকে গিয়েছে এবং ঐ পথটি মানুষকে গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করে। তিনি বলেছেন :

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا۔

'আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, এখন সে কৃতজ্ঞ হয় বা হয় অস্বীকারকারী।' (সূরা আদদাহর, আয়াত : ৩)

www.nagorikpathagar.org

তিনিই গোটা পৃথিবীর ভাল-মন্দ প্রত্যেকটি বস্তুর একমাত্র স্রষ্টা। তিনি বলেন :

اَللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ شَيْءٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ۔

'আল্লাহ তোমাদের প্রভু, তিনিই সকল বস্তুর স্রষ্টা, তিনি ব্যতীত আর কোন আল্লাহ্ নেই।' (সূরা আল মুমিন : আয়াত-৬২)

اَللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ۔

'আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কিছু করো সব সৃষ্টি করেছেন।'

(সূরা আস সফফাত, আয়াত : ৯৬)

কিন্তু : اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى 'তিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন এরপর তাকে যথার্থ পথের সন্ধান দিয়েছেন।' (সূরা আত-ত্বহা : ৫০)

এখন মানুষই তাকে হিদায়াত এবং পথভ্রষ্টতায় এবং ভাল ও মন্দে পরিণত করেছে। ভুল পথে পরিচালিত হলে তা গোমরাহীতে পরিণত হয় এবং সঠিক পথে অগ্রসর হলে হিদায়াতের পথের উপযোগী হয়। যথার্থ ক্ষেত্রে ব্যয় করলে তা ভাল এবং ভুল ব্যবহারের ফলে মন্দের দিকে ধাবিত হয়। তাছাড়া কোন বস্তু তার মৌলিকত্বের দিক দিয়ে ভালও নয়, মন্দও নয়, গোমরাহীও নয়। তাই ভাল এবং মন্দকে দু'টি বস্তু মনে করে দু'টি পৃথক আল্লাহ স্বীকার করার কোন যৌক্তিকতা নেই; বরং আল্লাহ উভয়েরই স্রষ্টা।

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ۔

'আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা আছে কী? তিনিই তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযক দান করেন। তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই, তাহলে তোমরা কোথায় পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ?' (সূরা আল ফাতির : ৩)

আল্লাহ তাঁর পয়গাম তোমাদের কাছে সোপর্দ করেছেন, এখন তোমরা তাকে মানতে পার, আবার মানতে নাও পার।

www.nagorikpathagar.org

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ۔

'এরপর আমি তাদেরকে আমার কিতাবের উত্তরাধিকারীতে পরিণত করেছি, যাদের আমি নিজের বান্দাদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত করেছি। এখন কেউ তাদের মধ্যে থেকে নিজেদের ওপর অত্যাচার করে, আবার কেউ আল্লাহর নির্দেশে সৎকাজে এগিয়ে যায়।' (সূরা আল ফাতির, আয়াত-৩২)

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ۔

'আর তোমাদের ওপর যে সমস্ত বালা-মসিবত আসে, তা তোমাদের হাতেরই যা কিছু অর্জন করে এরই প্রতিফল স্বরূপ এবং তিনি অনেক কিছুই ক্ষমা করে দেন।' (সূরা আশ শূরা : আয়াত-৩০)

فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔

'প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ পাপ ও পুণ্য নিক্ষেপ করেছেন। কাজেই যে তাকে (নিজের নফসকে) পবিত্র করেছে, সে নাজাত লাভে সক্ষম হয়েছে। আর যে তাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে, সে ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে।'

(সূরা আশ শামস, আয়াত : ৮-১০)

৪. আল্লাহর ইবাদত করার রীতি প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে ছিল এবং আজও বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ধর্মগুলোতে একটি বিভ্রান্তি বিস্তার লাভ করেছিল। তা হচ্ছে এটাই যে, ইবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহকে কষ্ট দেয়া বা অন্য কথায় বলা যায়, তাদের মধ্যে এ ধারণা জন্ম নিয়েছিল যে, রক্ত-মাংসের এ দেহটিকে যত বেশি কষ্ট দেয়া হবে তত বেশি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হবে এবং হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা এবং পবিত্রতা বৃদ্ধি পাবে। এরই ফলে হিন্দুদের মাঝে সাধারণভাবে যোগবাদ ও খ্রিষ্টানদের মাঝে 'রাহবানিয়াত' বা সন্ন্যাসবাদের উদ্ভব হয় এবং কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার প্রচলন ঘটে। একেই আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় মনে করা হয়। কেউ সারা জীবন গোসল করে না, কেউ বা সারা জীবন চট বা কম্বল পরিধান করে,



www.nagorikpathagar.org

কেউ সকল সময় এমন কি শীতের দিনেও দিগম্বর বা উলঙ্গ থাকে, কেউ সারা জীবন দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ সারা জীবন গুহার মাঝে বসে থাকে, কেউ সারা জীবন রোদে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ সারা জীবন কোন পাথরের ওপর বসে থাকে, কেউ শপথ করে যে, সারা জীবন শুধু গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করবে, কেউ সারা জীবন কুমার থাকে এবং সন্তান উৎপাদন না করাকে ইবাদত মনে করে, কেউ একটি হাত শূন্যে উত্তোলিত রেখে তাকে শুকিয়ে ফেলে, কেউ শ্বাসরোধ করাকে ইবাদত মনে করে, কেউ গাছের ডালে উল্টা হয়ে ঝুলে থাকে। এ ছিল ভ্রান্ত ধর্মাবলম্বীদের আল্লাহ্‌পরস্তির উন্নততর পর্যায় এবং আধ্যাত্মিকতার সর্বাধিক উন্নত রূপ। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম মানবতাকে এ সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করে বলেছে যে, এগুলো আধ্যাত্মিকতা নয়; বরং দেহের বিচিত্র কসরত। আল্লাহ আমাদের দেহের কসরত পছন্দ করেন না আর হৃদয়ের রং ভালবাসেন। তাঁর শরীয়তে সামর্থের অধিক কষ্টের স্থান নেই।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا۔

'আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের অধিক কষ্ট প্রদান করেন না।'

ইসলাম এ সন্ন্যাসবাদকে বিদআত চিহ্নিত করে বলছে :

وَرَهْبَانِيَّةَ ۟ اِبْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔

'আর যে রাহবানিয়াতকে (খ্রিষ্টানরা) তাদের দীনের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, তাকে আমি তাদের ওপর ফরয করিনি।' (সূরা আল হাদীদ)

এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন :

لَا صَرُوْرَةَ فِي الْاِسْلَامِ۔

'ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই।' (আবু দাউদ)

যারা আল্লাহর সৃষ্ট আরাম-আয়েশকে নিজেদের ওপর হারাম করে নিয়েছিল তাদেরকে কুরআন প্রশ্ন করেছে :

www.nagorikpathagar.org

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط

'বল আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সাজসজ্জা ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন সেগুলোকে কে হারাম করেছে?' (সূরা আল আ'রাফ, আয়াত : ৩২)

এমন কি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য মধু হারাম করে নিয়েছিলেন, তখন তাঁকে সতর্ক করা হয়েছিল :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ۔

'হে নবি! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন একে আপনি হারাম করেছেন কেন?' (সূরা আত তাহরীম, আয়াত : ১)

সর্বপ্রথম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম বিশ্ববাসীকে একথা জানিয়েছে যে, ইবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাত্র একটি, আর তা হচ্ছে এটাই যে, বান্দা আল্লাহর সামনে নিজের ইবাদতের স্বীকৃতি প্রদান করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ۔

'যারা আমার ইবাদত থেকে বিদ্রোহ করে, তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (সূরা আল মুমিন, আয়াত : ৬০)

অর্থাৎ ইবাদত হচ্ছে এটাই যে, বান্দা আল্লাহ্দ্রোহী হবে না। ইবাদতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পাদন করে বান্দা এ কথা প্রকাশ করে যে, সে আল্লাহদ্রোহী নয় বরং তাঁর অনুগত।

ইসলামে ইবাদতের উদ্দেশ্য– লক্ষ্য ও ফল কী? শুধু তাকওয়া বা আল্লাহ্ভীতি সৃষ্টি।

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۔

www.nagorikpathagar.org

'হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের সে প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২১)

নামাযের মাধ্যমে কিভাবে উপকৃত হওয়া যায়, তা নিচের আয়াত থেকে উপলব্ধি করা যাবে।

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔

'নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।'

(সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত : ৪৫)

রোযার উদ্দেশ্য এরূপ :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۔

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১৮৩)

হজ্বের লক্ষ এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে :

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ أَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ۔

'যাতে করে লোকেরা তাদের উপকারী স্থানে পৌঁছতে পারে এবং যাতে করে কিছু নির্ধারিত দিনে আল্লাহ তাদেরকে জীবিকা হিসেবে যে পশু দান করেছেন এর দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে।' (সূরা আল হজ্ব, আয়াত : ২৮)

যাকাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করা এবং গরিবদেরকে সাহায্য করা।

www.nagorikpathagar.org

الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزٰى ۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلٰى۔

'যে নিজের হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করার জন্য অর্থ দান করে এবং এ জন্য কোন বিনিময়ের আশা করে না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।' (সূরা আল লাইল, আয়াত : ১৮-২০)

বিবাহ করা এবং বংশ বৃদ্ধি করা হচ্ছে ইসলামের নবির সুন্নাত। তিনি বলেছেন :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ۔

বিবাহ হচ্ছে আমার রাস্তা, যে আমার রাস্তা পরিহার করে সে আমার দলভুক্ত নয়।' (আল হাদিস)

কুরআন মাজীদ স্ত্রী এবং সন্তানকে চোখের শীতলতা বলে উল্লেখ করেছে এবং মুসলমানদেরকে এর কামনাকারী হিসেবে গণ্য করেছে যে–

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ۔

'আর যারা বলে : হে আমাদের রব্! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের দ্বারা চোখের শীতলতা দান কর।' (সূরা ফুরকান, আয়াত : ৭৪)

অন্যান্য বিষয় ব্যতীত কুরবানিও একটি ইবাদত। লোকেরা নিজেদেরকে (অর্থাৎ মানুষকে) দেবতাদের জন্য কুরবানি করেছে। সন্তানদেরকে নিজেদের সম্পত্তি মনে করেছে এবং তাদেরকে দেবতাদের কাছে নজরানা হিসেবে পেশ করেছে। দেবতাদেরকে রক্তের ফোঁটা দান করা হত। যে পশু কুরবানি করা হত তার গোশ্ত জ্বালানো হত। কেননা তার ধোঁয়ায় দেবতা আনন্দিত হত। ইহুদিরা এজন্য গোশ্ত জ্বালাত। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে কুরবানির প্রকৃত উদ্দেশ্য জানালেন। তাঁর পয়গাম মানুষকে কুরবানি করার প্রথা একেবারেই বন্ধ করে দেয়। অবশ্যই পশু কুরবানিকে বৈধ ঘোষণা করে; কিন্তু রক্তের ফোঁটা দেয়া আর গোশ্ত জ্বালানোর অনুমতি প্রদান করেননি। কুরবানির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

www.nagorikpathagar.org

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۔ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰاكُمْ ۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۔

'আর কুরবানির জানোয়ারকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র একটি নিদর্শনে পরিণত করেছি। সে জানোয়ারগুলোর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কাজেই তাদের ওপর আল্লাহ্‌র নাম পাঠ কর সারিবদ্ধ করে। আর তা নিথর হয়ে যাবার পর তার মধ্য থেকে কিছু তোমরা খাও এবং বাকিটা পরিতুষ্ট হয়ে বসে থাকা এবং নিজেদের অভাব পেশকারী গরিবদেরকে আহার করাও। এভাবেই এ পশুগুলোকে আমি তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। সে কুরবানিসমূহের গোশ্‌ত ও রক্ত কখনো আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না; কিন্তু তোমাদের অন্তরের তাকওয়া তাঁর কাছে পৌঁছে। এভাবে তাদেরকে তোমাদের কর্তৃত্বাধীন করেছেন, যাতে করে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন, তার জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে পার এবং (হে নবি) সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর।'

(সূরা আল হজ্ব, আয়াত : ৩৬, ৩৭)

কুরবানির এ ভুল ধারণার ফলে এ বিষয়ের উদ্ভব হয়েছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের প্রাণের মালিক এবং তার ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী। অনুরূপ সে তার সন্তানদের প্রাণেরও মালিক। স্বামী তার স্ত্রীর প্রাণের মালিক। এ একটি ভ্রান্ত নীতির ফলে আত্মহত্যা, কন্যা হত্যা, সন্ত ানকে নজরানা হিসেবে পেশ করা বা তাদেরকে হত্যা করা, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর সতীদাহ প্রভৃতি শত শত মানবতা বিরোধী রসম-প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম

www.nagorikpathagar.org

এসবের মূলোৎপাটন করেছে। এখানে এ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, সমস্ত প্রাণ একমাত্র আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন এবং একমাত্র আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে। এ জন্য গায়রুল্লাহ্‌র নামে যে পশু কুরবানি করা হয় তার গোশ্‌ত হালাল নয়। আত্মহত্যাকারীদের ওপর আল্লাহ্‌ তাঁর জান্নাতও হারাম করে দিয়েছেন! ইসলাম ব্যতীত সারাবিশ্বে এবং বর্তমানেও ইউরোপ এবং আমেরিকার ন্যায় সুসভ্য দেশেও আত্মহত্যাকে সমস্যা ও বিপদ থেকে মুক্তির সর্বোত্তম পন্থা বিবেচনা করা হয়। আইন এর প্রতিরোধে অগ্রসর হয়, কিন্তু সফল হয় না। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রাণকে নিজের মালিকানাধীন মনে করে এবং তাকে পার্থিব বিপদ থেকে মুক্তির উপায় বলে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে, এ মৃত্যুর পর আর কোন জীবন নেই, আর যদি থেকেও থাকে তাহলে আল্লাহ্‌ আমাদের কাছ থেকে আমাদের এ কর্মের কোন জবাব চাচ্ছেন না। কিন্তু ইসলাম বলেছে, কারো প্রাণের মালিক মানুষ নয়; বরং সকল প্রাণের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্‌। তাই আত্মহত্যার দ্বারা বিপদ মুক্তির ধারণা নেহাত ভুল চিন্তাপ্রসূত। কেননা এভাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়া পর পরকালে আরো অধিক বিপদসঙ্কুল জীবন শুরু হবে।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ط

'কাউকেও হত্যা করবে না। আল্লাহ্‌ একমাত্র হকের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কারণে প্রাণনাশ করা হারাম করেছেন।' (সূরা আনআম, আয়াত : ১৮১)

وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ ۔ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا۔

আর তোমাদের নিজেদেরকেও হত্যা কর না। অবশ্যই আল্লাহ্‌ তোমাদের ওপর করুণাময় (আর এ জন্য করুণাবশে তোমাদেরকে এ নির্দেশ প্রদান করেছেন)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অবমাননা করে এবং নিজের ওপর জুলুম করে এ কাজে ব্রতী হবে, তাকে আমি জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত : ২৯-৩০)

www.nagorikpathagar.org

আরবে ছিল কন্যা হত্যার প্রচলন। হিন্দুস্তানের রাজপূতদের মধ্যেও এর প্রচলন ছিল। জগতের আরো বিভিন্ন দেশেও এর প্রচলন ছিল। আরবে এটি এমন নিষ্ঠুর রীতিতে পরিণত হয়েছিল যে, সেখানে কন্যাকে জীবিত সমাহিত করা হত। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামের একটি মাত্র বাক্যই এ বাতিল রীতিটি চিরকালের জন্য উৎখাত করা হয়েছে।

وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ۔ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔

'আর যেদিন জীবিত প্রোথিত কন্যা সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে কোন অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল?' (সূরা আত তাকভীর, আয়াত : ৮-৯)

আরবে নিজের সন্তানকে হত্যা করা অপরাধ বলে গণ্য হত না। আজকের এ সুসভ্য জগতেও অসংখ্য সন্তানকে এজন্য হত্যা করা হচ্ছে যে, পিতামাতার তাদের লালন-পালন করার সামর্থ্য নেই। বলা হয়, দেশের উৎপাদন কম, তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে হবে। আরবে এবং অন্যান্য জাতিদের আইনে গর্ভপাত করা বা শিশু হত্যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান ছিল না। গ্রীসের নবজাতকদের পরীক্ষা করা হত এবং এর মধ্যে দুর্বলদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার ছিল বলে মনে করা হত না। তাদেরকে পাহাড় থেকে নীচে ফেলে হত্যা করা হত। আজও জন্ম-নিয়ন্ত্রণের নামে এ সব কিছুই হচ্ছে। ইসলাম এ চিরন্তন নীতি বর্ণনা করেছে যে, রিযিক কেউ কাউকে দান করে না।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا۔

'যমীনের ওপর প্রত্যেক বিচরণকারীকে রিযকদানের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ।' (সূরা হুদ, আয়াত : ৬)

এজন্য ইসলাম বলে :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔

www.nagorikpathagar.org

'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানকে হত্যা করো না! আমি তাদের ও তোমাদের রিযিক দান করি। অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করা জঘন্য অন্যায়।' (সূরা বনি ইসরাঈল : ৩১)

জগতে যে বিরাট অংশে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম গৃহীত হয়নি, সেখানে যে ভ্রান্তি বিরাজমান তা হচ্ছে এটাই যে, লোকেরা আল্লাহ্র বান্দাদের মাঝে বংশ, গোত্র, ধন-সম্পদ, বর্ণ, রূপ ও আকৃতি-প্রকৃতির প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। ভারতের লোকেরা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নিজেদেরকে ছাড়া সারাবিশ্বের মানুষকেই ম্লেচ্ছ ও অস্পৃশ্য গণ্য করেছে এবং নিজেদেরকে চারটি বর্ণের মধ্যে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে সম্মান ও অধিকারের তারতম্য সৃষ্টি করেছে।

শূদ্রদের ধর্ম-কর্ম করারও অধিকার ছিল না। এ চারটি সম্প্রদায় প্রাচীন ইরানেও এভাবেই বিদ্যমান ছিল। রোমানরা নিজেদেরকে প্রভুত্বের অধিকারী এবং অন্যদেরকে গোলামি করার যোগ্য মনে করেছিল। আজ সভ্যতা, মানবপ্রেম এবং সাম্যের দাবিদার ইউরোপের অবস্থাটাই একবার বিবেচনা করুন। শ্বেতাঙ্গরা সেখানে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির একচ্ছত্র অধিকারী বলে গণ্য হয়। কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের সমপর্যায়ের বলে পরিগণিত হয় না। এশীয় জাতিরা সফরেও তাদের সাথে একত্রে চলতে পারে না। কোন কোন দেশে তাদের মহল্লায় বসবাসও করতে পারে না এবং তাদের সকল অধিকারও ভোগ করতে পারে না।

আমেরিকার মানবতাবাদীদের দৃষ্টিতে সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ বাসিন্দাদের বেঁচে থাকারও কোন অধিকার নেই। আর দক্ষিণ এবং পূর্ব আফ্রিকায় শুধু কৃষ্ণকায় নয়; বরং ভারতীয় তথা এশীয়রাও মানবিক সমানাধিকার লাভ করতে পারে না। পার্থিব অধিকারের সীমা পেরিয়ে এ তারতম্য আল্লাহ্র এ দুটি কালো এবং সাদা বান্দা এক সাথে এক আল্লাহ্র সামনে নত হতে পারে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম এ সমস্ত তারতম্য এবং পার্থক্য বিলুপ্ত করে দিয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে বংশ, গোত্র,

www.nagorikpathagar.org

ধন-সম্পদ, আকৃতি, প্রকৃতি কোন কিছুই মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে না। যে কুরাইশরা তাদের বংশ এবং গোত্রের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর গৌরব করেছে, মক্কা বিজয়ের দিন কাবার হারেমে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেছেন :

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ نُخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةَ وَعَظَمَتَهَا بِالْاٰبَاءِ النَّاسُ مِنْ اٰدَمَ مِنْ تُرَابٍ۔

'হে কুরাইশগণ! এখন আল্লাহ জাহেলিয়াতে অহঙ্কার গোত্রীয় গর্ব নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদম বংশোদ্ভূত এবং আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে।' (ইবনে হিশাম)

বিদায় হাজ্বের জনসমুদ্রে আবার ঘোষণা করেছেন :

لَيْسَ لِلْعَرَبِيِّ فَضْلٌ عَلَى الْعَجَمِيِّ وَلَا لِلْعَجَمِيِّ فَضْلٌ عَلَى الْعَرَبِيِّ كُلُّكُمْ اَبْنَاءُ اٰدَمَ مِنْ تُرَابٍ۔

'আরবের অনারবের ওপর এবং অনারবের আরবের ওপর কোন প্রাধান্য নেই। তোমরা সবাই আদমের সন্তান এবং আদমের সৃষ্টি হয়েছিল মাটি থেকে।' (মুসনাদে আহ্মদ)

এরপর তিনি বললেন, প্রকৃত পার্থক্য হচ্ছে কাজের :

اِنَّ اللّٰهَ اَذْهَبَ عَنْكُمْ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْاٰبَاءِ اِنَّمَا هُوَ اَوْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ۔ اَلنَّاسُ كُلُّكُمْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ خُلِقَ مَنْ تُرَابٍ۔

'আল্লাহ জাহেলি যুগের অহঙ্কার এবং বংশগত গৌরব বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। মানুষ এখন মুমিনরা হচ্ছে মুত্তাকী। আর পাপীরা হচ্ছে দুর্ভাগা। সমস্ত মানুষ আদমের সন্তান এবং আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(তিরমীযি, আবু দাউদ)

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওহি সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করে বলেছে :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ۔

'হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের সবাইকে আমি (আল্লাহ) একটি মাত্র পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে গোত্র ও বংশে এজন্য বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানি হচ্ছে সে, যে তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।'

(সূরা আল হুজরাত, আয়াত : ১৩)

অন্য স্থানে বলা হয়েছে :

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا۔

'তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি এমন কোন বস্তু নয়, যা? তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে। তারা তাদের কাজের প্রতিদান দ্বিগুণ লাভ করবে।'

(সূরা আস সাবা, আয়াত : ৩৭)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম সমস্ত মুসলমানকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদেরকে এ পয়গাম শুনিয়েছে যে, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ 'সমস্ত মুসলমান পরস্পর ভাই।' এ অনুযায়ী বিদায় হাজ্বে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লাখ জনতার মহাসমাবেশে ঘোষণা করেছেন : اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ 'প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই।' এ সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব সাদা-কালো, আরাবি-আজমি, তূর্কী-তাতারি, ইংগী এবং ফিরিংগীর পার্থক্য দূর করে দিয়েছে এবং আল্লাহ তাদের ওপর তাঁর এ অনুগ্রহের উল্লেখ করলেন যে,

www.nagorikpathagar.org

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا 'আল্লাহর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর পরস্পরের ভাইয়ে পরিণত হয়েছ।' আল্লাহর ঘরে সবার সমান অধিকার, বংশ-গোত্রের কোন তফাৎ নেই, পেশা এবং পদমর্যাদার পার্থক্য নেই, দারিদ্র্য এবং প্রাচুর্যের পার্থক্য নেই। আল্লাহর কাছে সবাই সমান। এখানে কেউ ব্রাহ্মণ আর কেউ শূদ্র নয়। সকলেরই হাতে কুরআন দেওয়া হবে। সকলের পিছনেই নামায পড়া হবে। প্রত্যেকের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে। জ্ঞানে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত। اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ 'প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ।'

প্রিয় যুবকবৃন্দ! মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম পৃথিবীতে যে সমস্ত অবদান রেখেছে, তা আমি একটি একটি করে আপনাদের সামনে উল্লেখ করার একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রয়োজনের অনুপাতে সময় অতি সামান্য এবং এ অতল সমুদ্রের প্রান্ত মেলাও দুষ্কর। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম নারীসমাজকে যে অধিকার প্রদান করেছে এবং গোলামদেরকে যে মর্যাদায় ভূষিত করেছে, ইচ্ছা ছিল এর বিবরণও আপনাদের সামনে উল্লেখ করি এবং এ বিষয়টিও দেখেছি যে, ইউরোপের গালভরা দাবি সত্ত্বেও ইউরোপীয় জাতিরা ইসলামের সুউচ্চ মিনারের বহু নিচে অবস্থান করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সময় আর নেই।

## ইহ্কাল-পরকাল ও দুনিয়ার পৃথকীকরণ

যে বস্তুটি বিশ্বে সবচেয়ে বেশি গোমরাহীর পথ পরিষ্কার করেছে, তা হচ্ছে ইহকাল-পরকালের পৃথকীকরণ। দীনের কাজকে পৃথক করে নেয়া হয়েছে এবং দুনিয়ার কাজকেও আলাদা করেছে। আল্লাহর নির্দেশে ধন-দৌলত লাভের পথ পৃথক করা হয়েছে এবং দীন অর্জনের পথ পৃথক। প্রিয় যুবক ভাইয়েরা! বিশ্বে যে সমস্ত বিভ্রান্তি বিস্তার লাভ করেছিল এর মধ্যে এটিই ছিল বৃহত্তম। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গামের উজ্জ্বল কিরণ এ বিভ্রান্তি-জাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। এ

www.nagorikpathagar.org

পয়গামই একথা বলেছে যে, আন্তরিকতা এবং সদুদ্দেশ্য সহকারে পৃথিবীর কার্যাবলি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সম্পাদন করাও দীন। অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী দুনিয়াদারির নামই দীনদারি। লোকেরা মনে করে, যিকির-ফিকির করা, গৃহত্যাগ করে বৈরাগির জীবন-যাপন করা এবং পাহাড়ের গুহায় বসে আল্লাহকে স্মরণ করার নাম দীনদারি নয়। আর বন্ধু-বান্ধব, সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা, দেশ-জাতি এবং নিজেকে সাহায্য ও প্রতিপালন করা এবং জীবিকার সন্ধান ও সন্তান পালন করা দুনিয়াদারি। ইসলাম এসব ভ্রান্ত ধারণারও বিলোপ সাধন করেছে এবং বলেছে যে, আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক এ অধিকারগুলো অর্জন করা এবং কর্তব্য পালন করা দীনদারিরই অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে দু'টি বিষয়ের ওপর নাজাত নির্ভর করে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ঈমান এবং অন্যটি সৎকাজ। পাঁচটি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার নাম হচ্ছে ঈমান : আল্লাহর ওপর, সৎপথের সন্ধানদাতা নবিগণের ওপর, নবিগণের কাছে আল্লাহর পয়গাম আনয়নকারী ফেরেশতাগণের ওপর, আল্লাহর এ পয়গাম যে সমস্ত কিতাবে আছে সে কিতাবসমূহের ওপর, এ পয়গাম অনুযায়ী কাজ করা ও না করার পুরস্কার ও শাস্তির ওপর। এ পাঁচটি বিষয়ে বিশ্বাস রাখার নামই হচ্ছে ঈমান। এ ঈমানের ওপরই সৎকাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। কেননা এ ঈমানও বিশ্বাস ব্যতীত সঙ্কল্প এবং আন্তরিকতাসহ কোন কাজ সম্পাদন করা অসম্ভব। দ্বিতীয় বস্তুটি হচ্ছে সৎকাজ। অর্থাৎ আমাদের কাজ সৎ এবং উত্তম হওয়া উচিত।

ইতোপূর্বে আমার সপ্তম বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি যে, কাজের তিনটি অংশ : একটি হচ্ছে ইবাদত, অর্থাৎ যার দ্বারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং বান্দার বন্দেগি প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যবহারিক জীবন, অর্থাৎ মানুষের পারস্পরিক লেন-দেন, কাজ-কারবার, দেশ পরিচালনা সম্পর্কিত আইন-কানুন ও সংবিধান, যার সাহায্যে মানব সমাজ ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তিলাভ করে এবং যুলুমের বিলোপ সাধন হয় ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৃতীয়টি হচ্ছে নৈতিক চরিত্র, অর্থাৎ এমন সব অধিকার যা

www.nagorikpathagar.org

পরস্পরের ওপর আইনগত দিক দিয়ে ফরয না হলেও আত্মার পূর্ণতা এবং সমাজের উন্নতির জন্য অপরিহার্য। এ চারটি বস্তু অর্থাৎ ঈমান, ইবাদত, ব্যবহারিক জীবন এবং নৈতিক চরিত্রের সংশোধন এর যথার্থতাই আমাদের নাজাতের একমাত্র উসিলা স্বরূপ।

প্রিয় যুবকগণ! আমি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, নিসঙ্গতা, নির্জনতা, স্থবিরতা এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একক জীবন ইসলামে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম হচ্ছে সংগ্রাম, সাধনা, প্রচেষ্টা এবং কর্মতৎপরতার নাম। ইসলাম মৃত্যু নয়, জীবন। তাই কুরআনে বলা হয়েছে :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ.

"প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ।"

(সূরা আল মুদ্দাস্‌সির, আয়াত : ৩৮)

ইসলাম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক বিরামহীন প্রচেষ্টা-সাধনারই নাম। কিন্তু সে প্রচেষ্টা নির্জনে ঘরে বসে নয় বরং কাজের ক্ষেত্রে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন আপনাদের সামনে রয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনও আপনাদের সামনে বর্তমান, সাধারণ সাহাবীগণের জীবনও আপনাদের নাজাতের পথ নিহিত রয়েছে। তাঁদের জীবনও আপনাদের কল্যাণের মাধ্যম এবং আপনাদের আদর্শ। তাঁদের জীবনেও রয়েছে আপনাদের কল্যাণের মাধ্যম এবং আপনাদের উন্নতি ও সৌভাগ্যের সোপান। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম গৌতম বুদ্ধের পয়গামের ন্যায় কামনা-বাসনা পরিহারের শিক্ষা দেয় না; বরং কামনা-বাসনার পরিশুদ্ধি এবং তাকে যথার্থ রূপ দানের শিক্ষা প্রদান করে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম হযরত ঈসার পয়গামের ন্যায় ধন-সম্পদ ও শক্তির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন ও নিষেধাজ্ঞা প্রদানের নাম নয় বরং এগুলো অর্জন ও ব্যয়ের পদ্ধতিসমূহ সংশোধন ও তাদের যথার্থ ব্যবহার ও ব্যয়ের ক্ষেত্রকে নির্ধারণ এ পয়গামের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

www.nagorikpathagar.org

বন্ধুগণ! ঈমান ও সে অনুযায়ী সৎকাজের নাম হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম হচ্ছে কর্ম, কর্ম পরিহার নয়। ইসলাম হচ্ছে কর্তব্য সম্পাদন, কর্তব্য পরিহার নয়। এ কর্ম ও কর্তব্যসমূহের ব্যাখ্যা আপনাদের নবি ও তাঁর সহচরগণের জীবনচরিতে পাওয়া যাবে। এর চিত্র এরূপ :

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا۔

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল আর যারা তাঁর সহচর, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অতিশয় কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি করুণাশীল। তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা রুকু-সিজদায় রত, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি সন্ধান করছে।'

(সূরা আল ফাতহ্, আয়াত : ২৯)

তারা সত্য অস্বীকারকারীদের সাথে জিহাদ করছে, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালবাসা বজায় রেখেছে, আল্লাহর সামনে রুকুতে ঝুঁকে আছে এবং সিজদায় নত আছে। আবার জগতে আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সন্তুষ্টিরও সন্ধান করছে। কুরআনের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (ফযল) বলা হয় রিযক এবং জীবিকাকে। এ রিযক এবং জীবিকার বেলায়ও দীনের দাবি রয়ে যাচ্ছে।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ۔

'এরা এমন লোক যাদেরকে ব্যবসায় এবং বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে না।' (সূরা আন জারি আছে, আবার আল্লাহকে স্মরণ করাও হচ্ছে। (সূরা আন নূর, আয়াত : ৩৭)

ব্যবসায়, বেচাকেনা, কাজ-কারবার সব সব জরি আছে, আবার আল্লাহকে স্মরণ করাও হচ্ছে। তারা একটিকে ছেড়ে দিয়ে অন্যটির সন্ধান করে না, বরং উভয়ের সন্ধান একই সাথে করে।

www.nagorikpathagar.org

মুসলমান এবং রোমীয়দের যুদ্ধ চলছে। মুসলিম বাহিনীর সেনারা হচ্ছেন সাহাবায়ে কিরাম! রোমান সেনাপতি মুসলিম সিপাহীদের অবস্থা জানার জন্য মুসলমানদের শিবিরে গুপ্তচর পাঠায়। তারা এসে মুসলমানদের দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে ফিরে যায়। রোমান সেনানায়কের কাছে তারা এ তথ্য প্রদান করে যে, মুসলমানরা অদ্ভুত সিপাহী- هُمْ بِاللَّيْلِ رُهْبَانٌ وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانٌ 'তারা রাতে সংসার ত্যাগী এবং দিনে ঘোড়-সওয়ার।' ইসলামের প্রকৃত জীবন হচ্ছে এটাই।

বন্ধুগণ! আজ আমার বক্তৃতা সমাপ্তির শেষ দিন। মনে করেছি, আটটি বক্তৃতায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন চরিত এবং পয়গাম সম্পর্কে সবকিছুই উপস্থাপন করতে সক্ষম হব, কিন্তু আটটি বক্তৃতার পরও এখনো অনেক কিছুর আলোচনা রয়েই যাচ্ছে এবং যা কিছু করেছি তাও যৎসামান্যই বলা চলে। কিন্তু সে আশা আর পূরণ করা সম্ভব হলো না।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

## স মা প্ত

www.nagorikpathagar.org

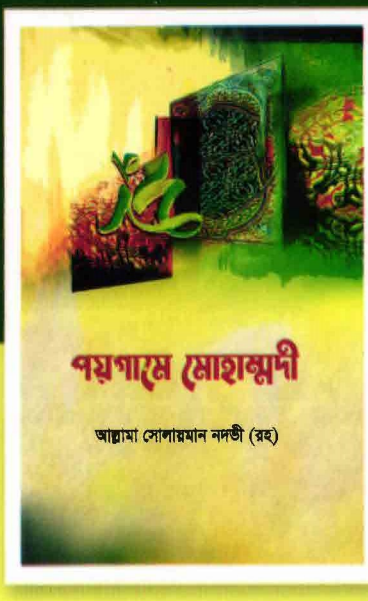


ISBN : 978-984-90346-0-5

প্রকাশনায়
মক্কা পাবলিকেশন
www.makkapublication.com

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
www.ahsanpublication.com